বংশ-পরিচয়

চতুর্দ্দশ খণ্ড

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার-সঙ্কলিত

আশ্বিন, ১৩৪১

মূল্য ৫৲ টাকা

প্রকাশক
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার
২০৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীবরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দ্বারা
"নিউ আর্য্যমিশন প্রেস" হইতে মুদ্রিত,
৯নং শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গপত্র

ডাক্তার স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

এম-এ, এম-ডি, পি-এচ-ডি, এফ-এ, এস-বি

মহোদয়ের করকমলে

শ্রদ্ধা ও সম্মানসহকারে

উৎসর্গীকৃত হইল।

-:০০০:—

স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	মহিষাদল রাজবংশ	১—১৫
২।	মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুর	১৬—৪০
৩।	কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় এম এল সি	৪১—৫২
৪।	স্বর্গীয় বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় রায় অখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর	৫৩—৬৮
৫।	পাঁচথুপীর ঘোষ বংশ	৬৯—৭২
৬।	স্বর্গীয় ক্ষিতীশচন্দ্র রায় (ময়মনসিংহ)	৭৩—৭৫
৭।	স্বর্গীয় নীলরত্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (রাঁচি)	৭৬—৮০
৮।	রায় মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী বাহাদুর (শ্রীরামপুর)	৮১—৮৬
৯।	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর)	৮৭—৮৮
১০।	রায় বাহাদুর কালিকাদাস দত্ত, সি-আই-ই	৮৯—৯৩
১১।	শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র জানা, এম-এস সি, বি-এল	৯৪—৯৬
১২।	রায় শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুর	৯৭—১০৩
১৩।	মিত্রবংশের বংশ-লতা	১০৪—১০৬
১৪।	স্বর্গীয় বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী	১০৭—১১৫
১৫।	ডাঃ তারকনাথ মজুমদার	১১৬—১২৩
১৬।	পণ্ডিত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত	১২৪—১৩৭
১৭।	শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী, কণ্ট্রাক্টর, মালদহ	১৩৮—১৪৩
১৮।	ঢাকা—রোয়াইলের বৈশ্য সাহা-বংশ	১৪৪
১৯।	বেলেঘাটার নস্কর-বংশ	১৪৫—১৭৬
২০।	স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার দত্ত	১৭৭—১৮৪
২১।	প্রতাপচন্দ্র রায়, সি-আই-ই	১৮৫—২৩০
২২।	কৃষ্ণনগর ও বাগাচড়ার সরকার-পরিবার	২৩১—২৪৩
২৩।	যষ্ঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৪—২৪৮
২৪।	শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চৌধুরী (ষ্টেভেডোর ও জমিদার)	২৪৯—২৫৬

বিষয় — পৃষ্ঠা

২৫। মেদিনীপুর জেলার পিঙ্গলাগ্রামের বসু-বংশ — ২৫৭—২৮৭
২৬। রায় শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, ও-বি-ই, (মেদিনীপুর) — ২৮৮—২৯২
২৭। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দে উকীল (মেদিনীপুর) — ২৯৩—২৯৭
২৮। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, এডভোকেট (মেদিনীপুর) — ২৯৮—৩০৬
২৯। স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁকুড়া) — ৩০৭—৩১৫
৩০। শ্রীযুক্ত প্রবোধগোপাল মুখোপাধ্যায়, পাবলিক প্রসিকিউটর (হাবড়া) — ৩১৬—৩২০
৩১। শ্রীযুক্ত হরিগোপাল চট্টোপাধ্যায়, উকীল, মালদহ, — ৩২১—৩২৩
৩২। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ ৺ গঙ্গাচরণ বেদান্তবিদ্যাসাগর — ৩২৪—৩২৫
৩৩। রায় পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর — ৩২৬—৩২৭
৩৪। শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর নায়ক, জমিদার, নন্দী (বর্দ্ধমান) — ৩২৮—৩৩২
৩৫। ডাঃ বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, এল এম এস — ৩৩৩—৩৩৮
৩৬। শ্রীযুক্ত লালগোপাল পাল, জমিদার, রাণাঘাট — ৩৩৯—৩৪০
৩৭। জয়রামপুরের মৌলিকবংশ — ৩৪১—৩৪৫
৩৮। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা মজুমদার, উকীল, কৃষ্ণনগর — ৩৪৬—৩৪৭
৩৯। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত বিদ্যাবিনোদ, এম আর এ এস — ৩৪৮—৩৫৩
৪০। রায় বাহাদুর স্বর্গীয় ডাঃ আশুতোষ মিত্র — ৩৫৩—৩৬১
৪১। স্বর্গীয় কালীপদ ঘোষ (রাঁচি) — ৩৬২—৩৬৬
৪২। রায় সাহেব মৃত্যুঞ্জয় লাল — ৩৬৭—৩৬৯
৪৩। বর্দ্ধমানের পাল-বংশ — ৩৭০—৩৮৯
৪৪। বিল্বগ্রামের হাজরাবংশ — ৩৯০—৩৯৯
৪৫। রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর — ৩৯৯—৪০০
৪৬। ডাঃ অহিভূষণ মুখোপাধ্যায় — ৪০১—৪০২
৪৭। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী — ৪০৩—৪০৬
৪৮। স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ — ৪০৭—৪০৮

বংশ-পরিচয়

মহিষাদল-রাজবংশ

কতকগুলি ভূসম্পত্তি লইয়া মহিষাদল-রাজসরকারের জমীদারী গঠিত হইয়াছে। সেইগুলির মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য হইতেছে—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মহিষাদল, গুমগড়, তমলুক প্রভৃতি পরগণা, এলাহাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি মহল, হাওড়া সহরের নিকটবর্ত্তী শিবপুরে অবস্থিত কতিপয় সম্পত্তি, কলিকাতা সহরে কয়েকখানি বাড়ী এবং দোরো তুবনান ও নারুয়া মুঠা পরগণার ১০।৬৪ তৌজির মালেকানা।

মহিষাদল-রাজবংশ কনৌজ ব্রাহ্মণের সারোরিয়া শাখা-ভুক্ত; সুতরাং ইঁহারা যে অতীব উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বংশের আদিপুরুষ রাজা জনার্দ্দন উপাধ্যায়। যে বৎসর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডের অধিপতির নিকটে বাণিজ্য-সনন্দ প্রাপ্ত হন সেই স্মরণীয় বৎসরে অর্থাৎ ১৬০০ খৃষ্টাব্দে রাজা জনার্দ্দন যুক্তপ্রদেশ হইতে মহিষাদলে আগমন ও এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

মহিষাদল-রাজবংশের 'বংশ-লতা' নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রাজা জনার্দ্দন উপাধ্যায়
|
রাজা দুর্জ্জন উপাধ্যায়
|
রাজা রামশরণ উপাধ্যায়
|
রাজা রাজারাম উপাধ্যায়
|
রাজা সুখলাল উপাধ্যায়
|
রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায়

রাজা আনন্দলাল নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার পত্নী রাণী জানকী রাজা মতিলালকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু রাণী জানকীর এই কার্য্যের বিরুদ্ধে মামলা হয় ও মামলায় রাজা মতিলাল পরাজিত হন। অতঃপর মহিষাদল-রাজসম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারিত হন রাজা গুরুপ্রসাদ গর্গ।

রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায়
|
রাজা গুরুপ্রসাদ গর্গ
|
রাজা রঘুমান গর্গ
|
রাজা ভবানীপ্রসাদ গর্গ
|
রাজা কালীপ্রসাদ গর্গ
|
রাজা জগন্নাথ গর্গ
|
রাজা রামনাথ গর্গ
|
রাজা লছমনপ্রসাদ গর্গ
|

রাজা ঈশ্বরপ্রসাদ গর্গ রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ কুমার রামপ্রসাদ গর্গ

রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ কুমার গোপালপ্রসাদ গর্গ

রাজকুমারী সান্ত্বনাময়ী কুমার দেবপ্রসাদ কুমার শক্তিপ্রসাদ

ভবানীপ্রসাদ ভূপালপ্রসাদ
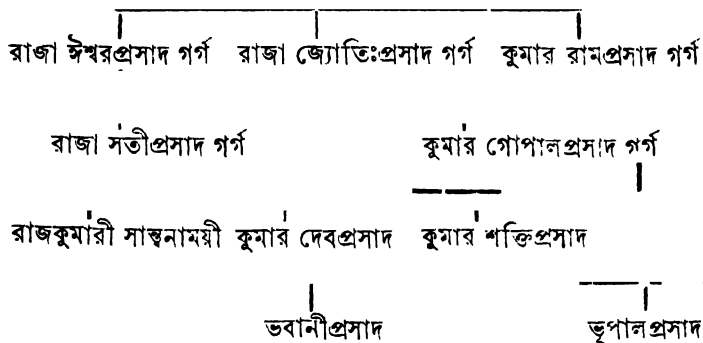
উপাধ্যায়গণের ন্যায় গর্গগণও যুক্তপ্রদেশ হইতেই মহিষাদলে আগমন করেন। তাঁহাদের আদিবাসভূমি বাণ্ডা জেলার অন্তর্গত ঘুরেস্থা গ্রাম। এখনও গর্গবংশীয় রাজগণ তাঁহাদের আদিবাসভূমিতে প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা ও আচার-ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন।

ইতিপূর্ব্বে যে মহিষাদল, গুমগড় ও তমলুক প্রভৃতি পরগণার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে সেইগুলির পরিমাণ ফল ৪,০৮,৮৩৮ বিঘা অর্থাৎ প্রায় ২১২ বর্গ মাইল। এইগুলি একবন্দে অবস্থিত এবং এই বিশাল ভূমিখণ্ডের দৈর্ঘ্য ৩৩ মাইল ও বিস্তার ২২ মাইল। মহিষাদল রাজ্যের জমীদারীতে প্রজাবর্গকে যে খাজনা দিতে হয় তাহার হার বঙ্গদেশের অন্যান্য জমীদারীর প্রজাগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত খাজনার তুলনায় অত্যন্ত অল্প। যে সময়ে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল সেই সময়েও মহিষাদল-রাজ প্রজাগণের খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করেন নাই। যে সময়ে ধান্যের মণ আট আনা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল সেই সময়ে প্রজাদের নিকটে যে খাজনা লওয়া হইত ধান্যের মূল্য তাহার তিনগুণ হইলেও তদনুপাতে বর্দ্ধিত হারে প্রজাদের নিকট হইতে খাজানা লওয়া

হয় নাই। এইজন্য মহিষাদল-রাজের প্রজাগণ অন্যান্য নিকটবর্ত্তী জমীদারীর প্রজাদিগের অপেক্ষা অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও স্বচ্ছল অবস্থায় জীবন যাপন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ মহিষাদল-রাজের জমীদারীগুলি একেবারে খাস অর্থাৎ এইগুলি পত্তনী দেওয়া হয় নাই। সুতরাং পত্তনীদার প্রভৃতি মহিষাদল-রাজের প্রজাগণের উপরে' হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এই কারণে মহিলাদল-রাজের জমীদারীর প্রজাগণের আর্থিক অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল।

উপাধ্যায়গণের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত মহিষাদল-রাজপরিবারের যিনি কর্ত্তা তিনিই রাজা-উপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকেন। দিল্লীর বাদসাহের প্রদত্ত সনদ অনুসারে রাজপরিবারে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বাদসাহের সনদের মর্ম্ম এই—বংশ-পরম্পরায় এই রাজ-পরিবারের কর্ত্তা রাজা উপাধি ধারণ করিবেন। দুঃখের বিষয়, এক্ষণে বাদসাহের সেই সনদখানি নষ্ট হইয়াছে। যে সময়ে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের আদেশ অনুসারে কলিকাতার শীলবংশীয়গণের লোকজন মহিষাদলের রাজবাটীতে চড়াও হইয়া লুঠপাট করে সেই সময়ে উক্ত সনদ হারাইয়া যায়;বিশেষ চেষ্টা করিয়াও উহা আর পাওয়া যায় নাই।

উপাধ্যায়গণ শাস্ত্রাচারসম্পন্ন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাহারা তাঁহাদের জমীদারীর আয় হইতে বহু সংস্কৃত টোল-চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; বহু শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন এবং বহুসংখ্যক দেবালয় ও অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। এইসকল ঠাকুরবাড়ী ও অতিথিশালার অন্নসত্রে দীন-দুঃখীদিগকে অন্ন দান করা হইত। উপাধ্যায়-রাজগণ-প্রতিষ্ঠিত এইসকল শিক্ষালয়, দেবালয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি গর্গ-বংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক অদ্যাবধি পরিচালিত হইতেছে; এইগুলি ব্যতীত গর্গ-রাজগণও বহু টোল-চতুষ্পাঠী,

স্বর্গীয় রাজা ঈশ্বরপ্রসাদ গর্গ

ঠাকুরবাড়ী ও অতিথিশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এইসকল সদনুষ্ঠানে মহিষাদল-রাজবৃন্দ সততই মুক্তহস্ত। প্রাচীন ঠাকুর-বাড়ী ও অতিথিশালাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় মহিষাদল-রাজসরকারের বার্ষিক কিঞ্চিদধিক ১৭ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

মহিষাদল-রাজবংশে প্রথম ইংরেজী শিক্ষা করেন রাজা লছমনপ্রসাদ গর্গ। তিনি ইংরেজী শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে এরূপ স্থিরনিশ্চয় ছিলেন যে, মহিষাদলে তিনি একটি অবৈতনিক উচ্চ ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার জমীদারীর মধ্যে যেখানে উচ্চ ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হইত সেই স্কুলের স্থায়িত্বের জন্য তিনি বহু অর্থদান করিতেন। মেদিনীপুর জেলায় তাঁহাকে ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম প্রবর্ত্তক বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। এইজন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একখানি মানপত্র (Certificate of Honour) প্রদান করিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

রাজা লছমনপ্রসাদ তাঁহার পুত্রগণকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে তাঁহারা মহিষাদল-রাজ স্কুলে যোগ্য শিক্ষকগণের অধীনে এবং তৎপরে রাজা লছমনপ্রসাদের মৃত্যুতে রাজ-সম্পত্তির পরিচালন-ভার কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের উপর ন্যস্ত হইলে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীন ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউসনে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এল-এল-ডি, সি-আই-ইর অধীনে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল স্বয়ং কুমার (পরে রাজা) জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ ও কুমার ঈশ্বরপ্রসাদ গর্গের সুশিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন লইতেন। অল্প বয়সে কুমার ঈশ্বরপ্রসাদের মৃত্যু হয়। রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদও ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারকল্পে মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন। কেবল তাঁহার নিজ জমীদারীতে বা তাঁহার নিজ জেলা

মেদিনীপুরেই তাঁহার দান সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র বঙ্গদেশে শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে তিনি অর্থসাহায্য করিতেন। কলিকাতায় ইডেন হিন্দু হোষ্টেল নামক সরকারী ছাত্রাবাস-নির্ম্মাণে তিনি যে ৩২ হাজার টাকা দান করিয়াছেন তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহিষাদল রাজ স্কুলের জন্য পাকা বাড়ী নির্ম্মাণকল্পে, ছাত্রগণের জন্য বৃত্তিস্থাপনকল্পে এবং ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারকল্পে অর্থদান তাঁহার উদার হৃদয় ও বিদ্যোৎসাহিতার পরিচায়ক।

মহিষাদল-রাজগণ কেবল যে ধর্ম্ম ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেই মুক্তহস্তে দান করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা রোগার্ত্ত নর-নারীর চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা-কার্য্যেও উদারভাবে অর্থসাহায্য করিয়াছেন। মহিষাদলে যে রাজ-হাসপাতাল ও বাহিরের রোগীদের চিকিৎসার জন্য যে দাতব্য ঔষধালয় মহিষাদল-রাজগণের প্রদত্ত অর্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে মহিসাদল ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বহুগ্রামের অধিবাসিগণের সবিশেষ উপকার হইতেছে। এই হাসপাতাল ও দাতব্য ঔষধালটীর পরিচালনার্থ মহিষাদল-রাজসরকার হইতে বার্ষিক ৫ হাজার টাকা সাহায্য করা হয়।

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যর চার্লস ইলিয়টের মহিষাদলে শুভাগমনের স্মৃতিরক্ষাকল্পে রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গেঁয়োখালি গ্রামে হাসপাতাল স্থাপনের জন্য এককালীন ৪০০০৲ টাকা দান করেন। মহিষাদল-রাজসরকার হইতে এই হাসপাতালে এক্ষণে বার্ষিক ৩০০৲ টাকা সাহায্য দান করা হইয়া থাকে।

অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যেও মহিষাদল-রাজবংশের দান সসম্মানে উল্লেখযোগ্য। জনসাধারণের উপকারের জন্য মহিষাদল রাজ-সরকার হইতে একটি সেতুনির্ম্মাণের জন্য ৬০ হাজার টাকা দান করা হয়। বাঁকা খালের (এক্ষণে ইহা হিজলী টাইড্যাল ক্যানাল ১নং রেঞ্জ নামে

অভিহিত খালের অংশবিশেষ) উপর এই সেতু নির্ম্মিত হয়। ইহা ব্যতীত এই সময়ে বাসুদেবপুর হইতে বাঁকাখালের বাঁধ পর্য্যন্ত যে দুই ক্রোশ দীর্ঘ পথ তৈয়ারী হয় তাহারও ব্যয় মহিষাদল-রাজসরকার হইতে দেওয়া হইয়াছিল।

রাজা ৺সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর

রাজা ৺সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা ঈশ্বরপ্রসাদ গর্গের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মহিষাদল-রাজবংশের আদিপুরুষ রাজা জনার্দ্দন উপাধ্যায়ের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সতীপ্রসাদের পিতা রাজা ঈশ্বরপ্রসাদ পরলোক গমন করেন সুতরাং রাজা ঈশ্বরপ্রসাদের ভ্রাতা রাজা জ্যোতিঃ-প্রসাদের উপরে কুমার সতীপ্রসাদ গর্গ (পরে রাজা-বাহাদুর) ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার গোপালপ্রসাদ গর্গের সকল ভার নিপতিত হয়। গোপালপ্রসাদ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত বাল্যকাল হইতেই কুমার সতীপ্রসাদ ও কুমার গোপালপ্রসাদের শিক্ষার ভার ইংরেজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় সুপণ্ডিত খ্যাতনামা শিক্ষকগণের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। তাঁহারা দুই ভ্রাতাই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। বাল্যকালে কুমার সতী-প্রসাদের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। এইজন্য তাঁহাকে স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত দার্জ্জিলিং ও মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

কুমার সতীপ্রসাদ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় (Entrance Examination) উত্তীর্ণ হয়েন। কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য রাজা জ্যোতিঃ-প্রসাদ তাঁহাকে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে দেন নাই।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে কুমার সতীপ্রসাদ বারাণসী-নিবাসী বাবু গদাধর মিশ্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। পর বৎসরের প্রারম্ভে রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ ক্যানসার রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু

স্বর্গীয় রাজা সত্যাপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর

মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার সতীপ্রসাদকে হাতে কলমে জমীদারী-পরিচালনার কার্য্য সুন্দররূপে শিক্ষা দিয়া যান। কুমার সতীপ্রসাদ সুশিক্ষিত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ছিলেন, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি জমীদারীর কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করেন। রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ তাঁহার পীড়ার সময়ে জোর করিয়া মহিষাদল-রাজের জমীদারী-পরিচালনের ভার সতীপ্রসাদকে অর্পণ করেন। ইহার ফলে তিনি জমীদারীর কার্য্যে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহার সুফল তাঁহার পিতৃব্যের মৃত্যুর পর সকলের গোচরীভূত হয়।

পিতৃব্যের প্রতি কুমার সতীপ্রসাদের প্রভূত অনুরাগ ও ভক্তি ছিল। তাঁহার পিতৃব্য দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় অধিকাংশ সময়েই তাঁহার রোগার্ত্ত পিতৃব্যের রোগ-শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় সহায়তা করিতেন ও তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন। ধনশালী অভিজাত-সম্প্রদায়ে এরূপ আদর্শ অতীব বিরল। রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদের শ্রাদ্ধ মহিষাদল-রাজের পদমর্য্যাদা ও সামাজিক সম্মান অনুসারে বিপুল সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়াছিল।

রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদের যখন মৃত্যু হয় তখনও কুমার সতীপ্রসাদ প্রচলিত আইন-অনুসারে সাবালক হন নাই, সাবালক হইতে তাঁহার তখনও দুই বৎসর বাকী ছিল। সুতরাং প্রশ্ন উঠিল—মহিষাদল-রাজের পরিচালন-ভার কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে দেওয়া হইবে কি না? বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী এই সম্পর্কে কুমার সতীপ্রসাদকে যে পত্র লিখেন তাহার মর্ম্ম এই :—কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হস্তে মহিষাদল-রাজ-এষ্টেটের পরিচালনা-ভার ন্যস্ত করিবার কোনও কারণ আমি দেখিতেছি না। আমি মেদিনীপুরের কলেক্টর মহাশয়কেও লিখিয়াছি যে, কেহ এরূপ প্রস্তাব করিলে আপনি তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। যদি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে আপনার এষ্টেট যায়,

তাহা হইলে আপনাকে নাবালক বিবেচনা করা হইবে ; কিন্তু যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন আপনাকে হিন্দু আইন অনুসারে সাবালক মনে করা হইবে, কারণ আপনার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

সম্পত্তি এবং জমীদারী-পরিচালনায় কুমার সতীপ্রসাদের যোগ্যতা এরূপ ছিল যে, যে দুই বৎসর তাঁহার সাবালক হইবার বাকী ছিল সেই দুই বৎসরে তিনি তাঁহার এই গুণের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতে থাকেন এবং তাহার ফলে গবর্ণমেণ্ট মহিষাদল-রাজ-এষ্টেট কোর্ট অফ ওয়াডসের হস্তে দেন নাই। তাঁহার পারদর্শিতার উপর বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়বিশ্বাস ও আস্থাও জন্মিয়াছিল।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর কুমার সতীপ্রসাদ বয়ঃপ্রাপ্ত বা সাবালক হন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে তিনি মহিষাদল রাজ এষ্টেটের পূর্ণ ও অবাধ কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। যেদিন তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন সেইদিন যথাযোগ্য সমারোহ-সহকারে কুমার সতীপ্রসাদের অভিষেক-উৎসব সম্পন্ন হয় এবং সেইদিনই তিনি "নিজ জোত" নামক বহুমূল্যবান্ ও বিপুল জমীদারীর পরিচালন-ভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার গোপালপ্রসাদ গর্গের হস্তে অর্পণ করেন।

কুমার সতীপ্রসাদ তদীয় অনুজ কুমার গোপালপ্রসাদের বিবাহে এরূপ সমারোহ করিয়াছিলেন যে, মহিষাদলে সেরূপ সমারোহ আর কখনও হয় নাই ; এতদুপলক্ষে তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

রাজ্যভার-গ্রহণাবধি তিনি জমীদারীর যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন এবং তাহার ফলে মহিষাদল-রাজ এষ্টেটের প্রচুর আয়বৃদ্ধি হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পর পর দুর্ব্বৎসর বা মন্দা ছিল। কিন্তু ইহা সত্বেও জমীদারীর সংস্কার ও উন্নতিমূলক কার্য্য এবং

জনহিতকর কার্য্য অবাধগতিকে চলিয়াছিল। কুমার সতীপ্রসাদের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মহিষাদল-রাজ তমলুক পরগণার ৮ আনা অংশের মালিক ছিলেন; কিন্তু সতীপ্রসাদ এই সময়ে উক্ত পরগণার বাকী ৮ আনা অংশ ক্রয় করিয়া মহিষাদল-রাজ-এষ্টেটকে তমলুক পরগণার পূর্ণ ১৬ আনা অংশের অধিকারী করিয়া দেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে গবর্ণমেণ্ট কুমার সতীপ্রসাদ গর্গকে "রাজা' উপাধি দান করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল উপাধির সনদ-বিতরণ-উপলক্ষে যে দরবার হয় সেই দরবারে ২০০০৲ টাকা মূল্যের একটি সরপোছ তাঁহাকে খেলাতস্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল। মাননীয় ছোটলাট বাহাদুর খেলাত সনদ দিবার সময়ে বলেন :—"The title of Raja is conferred on you in recognition of your great influence in the district, your unstinted liberality and your excellent moral character." অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলায় আপনার বিপুল প্রভাব প্রতিপত্তি, আপনার উদার দানশীলতা এবং আপনার উৎকৃষ্ট নৈতিক-চরিত্রের জন্য "রাজা" উপাধি-ভূষণে আপনাকে ভূষিত করা হইল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রাজা সতীপ্রসাদ "রাজা বাহাদুর" উপাধিলাভ করেন। এই উপাধির সনদ প্রদানের সময়ে বঙ্গের তদানীন্তন গভর্ণর মহোদয় তাঁহার আর এক প্রস্থ গুণগান করেন।

এই সময় হইতে রাজা সতীপ্রসাদ তদীয় অনুজ কুমার গোপাল-প্রসাদকে মহিষাদল-রাজ-এষ্টেটের সকল বিভাগের পরিচালন-কার্য্য পরিদর্শন করিতে অনুমতি দেন। কুমার গোপালপ্রসাদ নূতন কাছারী-বাড়ীতে তাঁহার আফিস বা দপ্তরখানা স্থাপিত করেন এবং এইখানে রীতিমত বসিয়া কর্ত্তব্য-সাধনে প্রবৃত্ত হন। মহিষাদল-রাজ সংসারে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নূতন। কারণ, ইতিপূর্ব্বে রাজ-পরিবারের কোনও কর্ত্তা অর্থাৎ রাজা বা তাঁহার কোনও ভ্রাতা বা প্রত্যক্ষ-রক্ত-সম্পর্ক প্রতিনিধি

কখনও একই কাছারীতে অন্যান্য বেতনভুক্ কর্ম্মচারিগণের সহিত বসিয়া কর্ম্ম করেন নাই। যাহা হউক, এই নূতন ব্যবস্থা যে কুমার গোপালপ্রসাদ বা ছোট রাজা বাহাদুরের উন্নতিমূলক পরিকল্পনার দ্যোতক ও সাম্যভাবের পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজা সতীপ্রসাদ, তদীয় অনুজ কুমার গোপালপ্রসাদ ও তদীয় শ্যালক শ্রীযুক্ত রামগোপাল মিশ্র ওরফে কালীবাবু মহিষাদল-রাজস্কুলের ছাত্রগণের জন্য ব্যায়াম-শিক্ষা ও নানাপ্রকার খেলা-ধূলার প্রবর্ত্তন করেন। এতদ্‌সম্পর্কে ছাত্রগণের অনুরাগ-বর্দ্ধনের জন্য তাঁহারা প্রতিযোগিকা-মূলক ক্রীড়াদির (match) ব্যবস্থাও করেন। রাজা সতীপ্রসাদ ও কুমার গোপালপ্রসাদ ললিত-কলার অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা কবিতা রচনা ও চিত্রাঙ্কন করিতেন। তাঁহারা চিত্রাঙ্কন-কলায় এতাদৃশ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, ৺গোপালজীর রথে তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার অঙ্কিত চিত্রাবলী রক্ষিত করা হইয়াছে। তাঁহারা উভয়ে নিপুণ ফোটোগ্রাফার (Photographer) বা ফোটো-চিত্রশিল্পী এবং দক্ষ শিকারী। পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় রাজা সতীপ্রসাদ ও কুমার গোপালপ্রসাদ উভয়েই সকল প্রকার জনহিতকর কার্য্যে মুক্তহস্তে অর্থ-সাহায্য করিতেন।

রাজা সতীপ্রসাদ স্বধর্ম্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন এবং কোনও প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন বা পান করিতেন না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সত্যসন্ধ ও সদ্বিবেকসম্পন্ন ছিলেন। যে বিপুল সম্পত্তির সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল তিনি নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি ও ন্যায়পরতার সহিত সেই ন্যাস রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পারিবারিক জীবন সুখময় ছিল।

মহিষাদল-রাজবাড়ীর সুবিস্তীর্ণ হাতার মধ্যে একটি সুন্দর সৌধ
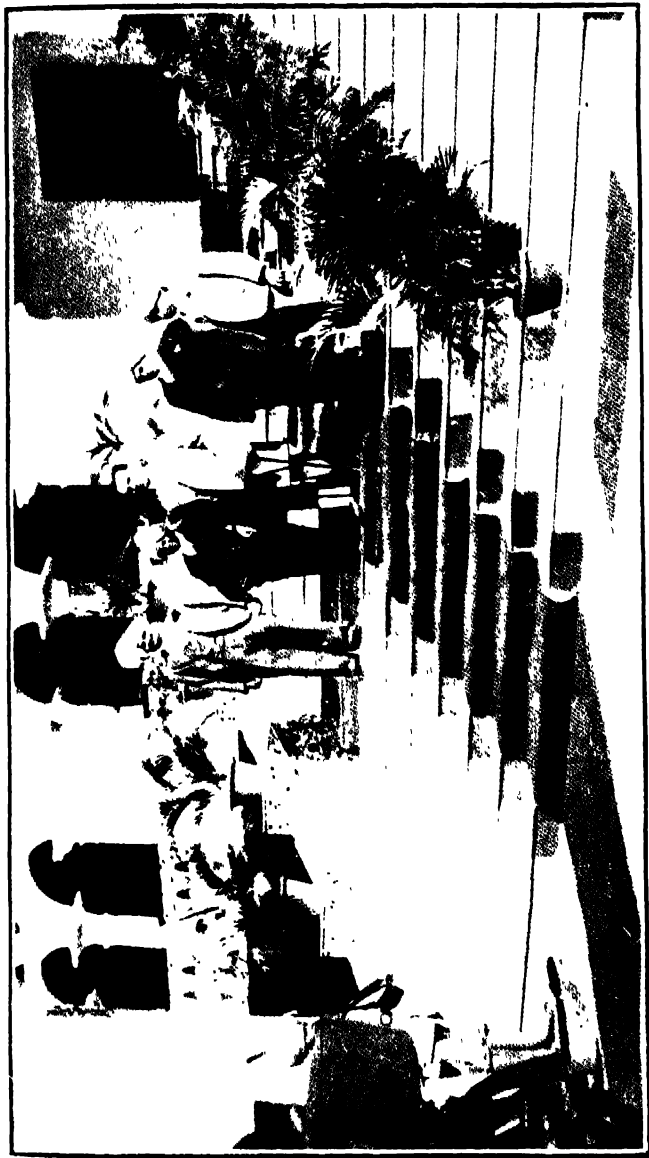
বাঙ্গালার গবর্ণর মহামান্য স্যর জন এণ্ডারসন, কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ, শ্রীমান্ শক্তিপ্রসাদ গর্গ, শ্রীমান ভবানীপ্রসাদ গর্গ ও শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ দোবে, বি এ.

আছে; গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত অতিথিগণ প্রয়োজন হইলে এখানে অবস্থান করেন। ইহার নাম সম্ভ্রান্ত অতিথি-নিবাস বা (Guest-House)।

রাজা সতীপ্রসাদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দান—মেদিনীপুর কলেজ-সংলগ্ন 'লুসন করোনেশন হোষ্টেল' ছাত্রাবাস-নির্ম্মাণার্থ ২০ হাজার টাকা।

১৩৩২ সালে ৪ঠা চৈত্র রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর পরলোক গমন করেন।

রাজা সতীপ্রসাদের এক কন্যা ও দুই পুত্র। কন্যার নাম—রাজকুমারী শ্রীমতী সান্ত্বনাময়ী দেবী; ইহার স্বামীর নাম—শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ দোবে, বি-এ। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কুমার দেবপ্রসাদ ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কুমার শক্তিপ্রসাদ। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর কুমার দেবপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন; এক্ষণে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে "ইণ্টারমিডিয়েট ইন আর্টস" শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। কুমার-শক্তিপ্রসাদ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক্ষণে সুযোগ্য শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন।

কুমার গোপালপ্রসাদ গর্গের দুই পুত্র—শ্রীমান্ ভবানীপ্রসাদ গর্গ ও ও শ্রীমান্ ভূপালপ্রসাদ গর্গ। ভবানীপ্রসাদ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ও ভূপাল-প্রসাদ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অসুস্থতার জন্য ভবানীপ্রসাদ এক্ষণে সুযোগ্য চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থান করিতেছেন। ভূপালপ্রসাদ হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন।

গত ১৯৩৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী মেদিনীপুর সহরে কুমার দেবপ্রসাদ বাঙ্গালার গবর্ণর স্যর জন এণ্ডারসনের সম্বর্দ্ধনার জন্য এক উদ্যান-ভোজের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পরদিন ১৭ই জানুয়ারী গবর্ণর বাহাদুর

মহিষাদল রাজবাড়ীতে আসিয়া কুমার দেবপ্রসাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন ও তাঁহার সহিত জলযোগ করেন। গবর্ণর বাহাদুর এতদুপলক্ষে কুমারের সহিত রাজবাড়ীর দ্রষ্টব্য স্থান ও সামগ্রীগুলি পরিদর্শন করেন।

মহিষাদল-রাজপরিবারের রাজভক্তি এবং ব্রিটিশ সম্রাট ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরাগ চিরপ্রসিদ্ধ। মেদিনীপুর জেলার কালেক্টরগণ, বিভাগীয় কমিশনারগণ এবং ছোটলাট ও গবর্ণরগণ এই রাজবংশের রাজভক্তি ও জনহিতপরায়ণতার প্রভূত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এই কারণে গবর্ণমেণ্ট মহিষাদলের রাজাকে দুইটী কামান, অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র এবং ১০ জন সশস্ত্র প্রহরী রাখিবার অধিকার দিয়াছেন।

মহিষাদল-রাজের বর্ত্তমান কর্ত্তা কুমার দেবপ্রসাদ অদ্যাপি সাবালক হন নাই। এইজন্য রাজ্যের পরিচালনভার কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের উপর বিন্যস্ত রহিয়াছে। কুমার দেবপ্রসাদ এই অল্প বয়সেই প্রভূত ধীশক্তি, চরিত্রবত্তা ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি স্বয়ং সুশিক্ষা লাভ করিতেছেন বলিয়া কালে যে এই সকল গুণ পূর্ণ বিকশিত হইবে এবং তিনি যে তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের পূত পদাঙ্ক-অনুসরণে যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতীব সুখের ও আশার বিষয় এই যে, কুমার দেবপ্রসাদ তাঁহার পিতার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ও বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা এই রাজবংশের মজ্জাগত।

মহিষাদল-রাজবংশ সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে মুক্তহস্ত তাহা বলাই বাহুল্য। বহু লোকহিতকর কার্য্যে তাঁহারা অর্থসাহায্য করিয়া আসিতেছেন। মহিষাদল রাজ-পরিবারের কতিপয় উল্লেখযোগ্য দানের বিষয় নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

ঠাকুরবাড়ী সমূহে নিত্য দেব-সেবা এবং
হিন্দুপর্ব্ব-পার্ব্বণ উপলক্ষে

কুমার দেবপ্রসাদ গা

পূজোৎসবাদির জন্য বার্ষিক দান … … ১৭,০০০৲

স্কুল ও টোল-চতুষ্পাঠীতে বার্ষিক দান … ৮,০০০৲

ইডেন হিন্দু হোষ্টেল বা ছাত্রাবাসের
দ্বিতল ও ত্রিতল নির্ম্মাণের জন্য এককালীন দান ৪০,০০০৲

মেদিনীপুর টেকনিক্যল ইনষ্টিটিউটে দান … ৬,০০০৲

মহিষাদল উচ্চ ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য দান ১৫,০০০৲

মেদিনীপুর কলেজ-সংলগ্ন লুসন ছাত্রাবাস
নির্ম্মাণের জন্য দান … … ২০,০০০৲

মেদিনীপুরে ব্রাড্‌লি-বার্ট হল নির্ম্মাণার্থ দান … ১৭,০০০৲

বেনারস সেণ্ট্রাল কলেজে দান … … ১,০০০৲

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে দান … … ১,০০০৲

তমলুক জলের কলে দান … … ১০,০০০৲

মহিষাদল দাতব্য চিকিৎসালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ দান ১০,০০০৲

উহা পরিচালনার জন্য বার্ষিক দান … ৫,০০০৲

নন্দীগ্রাম দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণার্থ দান ৪,০০০৲

উহা পরিচালনার জন্য বার্ষিক দান … … ৪৫০৲

কাঁথি দাতব্য চিকিৎসালয়ে বার্ষিক দান … … ১২০৲

মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর

মহারাজা সুখময় রায়ের পিতার নাম রঘুনাথ রায় ও মাতার নাম পার্ব্বতী দাসী। ইঁহার বিষয় জানিতে হইলে ইঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়েরই কিছু পরিচয় আবশ্যক। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কিছু-দিনের জন্য মহানাদে সিংহবংশের অবসানের পর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং মাতামহ ধনকুবের লক্ষ্মীকান্ত ধর ইংরাজের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া অলক্ষ্যে পাঠান রাজত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। মুসলমান ও অপর বিদেশীয়গণের অত্যাচারে ইংরাজ বণিকগণ যে সময়ে হুগলি পরিত্যাগ করেন সে সময়ে এদেশেরও কতকগুলি বণিক ইংরাজ-গণের সহিত হুগলি ত্যাগ করেন। এই বণিকগণ এবং ইংরাজ বণিকগণ সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা—ভাগীরথীর উপকূল-স্থিত এই তিনটী সংলগ্ন গ্রাম নিরাপদ ভাবিয়া ব্যবসায়ের কেন্দ্র নির্ব্বাচিত করেন। দেশীয় বণিকগণের মধ্যে লক্ষ্মীকান্ত ধর মহাশয় সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী ও অর্থশালী ছিলেন। ব্যবসায়-উপলক্ষে ইনি ইংরাজ বণিকগণকে টাকা আদান-প্রদান করিতেন। সে সময়ে এখনকার ন্যায় ব্যাঙ্ক ছিল না, অর্থের প্রয়োজন হইলে এইরূপ মহা-জনের নিকট হইতেই অর্থ ঋণ করিতে হইত। এই সূত্রেই ক্রমে ইঁহার সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নায়ক লর্ড ক্লাইবের বেশ পরিচয় হইল এবং পরে ইহা বন্ধুত্বে পরিণত হইল। এই সময়ে লর্ড ক্লাইবকে রাজনীতিক্ষেত্রে ও রাজ্য-প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইত তাহা ইতিহাসজ্ঞ কাহারও অবিদিত নাই। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থের অনাটন হইলে,

লর্ড ক্লাইবের অনুরোধে লক্ষ্মীকান্ত ধর মহাশয় তাঁহাকে সাতলক্ষ টাকা দিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তাৎকালিক অসুবিধা দূর করিয়া অকৃত্রিম বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত ধর মহাশয় লর্ড ক্লাইবকে সময় অসময়ে কেবলমাত্র অর্থসাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, সৎ-পরামর্শাদি ও কর্ম্মঠ বিশ্বস্ত লোকজন আবশ্যক হইলে তাহাও সংগ্রহ করিয়া দিতেন। এক সময়ে লর্ড ক্লাইবের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মপটু মুন্সীর প্রয়োজন হইলে তাঁহার বন্ধু লক্ষ্মীকান্ত ধর মহাশয় সে সময়ে অপর কোথাও উপযুক্ত লোক না পাইয়া নিজের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নবকৃষ্ণকে লর্ড ক্লাইবের হস্তে অর্পণ করেন। নবকৃষ্ণ প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে মনোযোগের সহিত কর্ম্ম করিয়া নিজের যথেষ্ট উন্নতি করেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক রাজা উপাধিও প্রাপ্ত হন। ইঁহার বংশধরগণ শোভাবাজার-রাজবংশ নামে পরিচিত। গুণগ্রাহী লর্ড ক্লাইব অসময়ের বন্ধু লক্ষ্মীকান্ত ধরের উপকার বিস্মৃত হন নাই। ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে "মহারাজা" উপাধি দিতে প্রস্তুত হন কিন্তু তিনি উহ' গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। লর্ড ক্লাইবও মধ্যে মধ্যে ঐ প্রস্তাব করিতে ক্ষান্ত হন নাই। এইরূপে বার বার অনুরুদ্ধ হইলে তিনি তাঁহার একমাত্র দৌহিত্র সুখময় রায়কে ঐ উপাধিদ্বারা ভূষিত করিতে বলেন। লর্ড ক্লাইব আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও যথাসময়ে সুখময় রায়কে মহারাজা উপাধি প্রদান করেন।

লক্ষ্মীকান্ত ধর মহাশয়ের পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁহার পার্ব্বতী নাম্নী একটী মাত্র কন্যা ছিল। তিনি কন্যাটীকে সাতিশয় ভালবাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পার্ব্বতী দাসী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হন। তঁহার মৃত্যুতে সকল শ্রেণীর লোক বিশেষভাবে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একজন

বিশ্বস্ত বন্ধু হারাইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা পার্ব্বতী নানা সদ্‌গুণের অধিকারিণী ছিলেন। হিন্দুপরিবারের আদর্শ কন্যা, ভার্য্যা ও জননী হইবার মত তাঁহার সুশিক্ষা হইয়াছিল। তাঁহার অসীম বদান্যতার ও তিনি উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। তিনি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত কন্যা ছিলেন। তিনি দীন-দুঃখীর প্রতি করুণা-পরায়ণা, তাহাদের অন্নদাত্রী, অভয়দাত্রী ছিলেন। জীবিতকালে তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। সৈন্যগণের গমনাগমনের জন্য তৎকালে রাস্তার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি উইল করিয়া কাশীপুর গান ফাউণ্ড্রীঘাট এবং সেই ঘাট হইতে দমদম পর্য্যন্ত রাস্তা-নির্ম্মাণকল্পে ৪০,০০০৲ টাকা দিয়া যান। ঐ উইলের আর একটী সর্ত্তে তিনি দেশীয় হাসপাতালের সাহায্যকল্পে ৩০,০০০৲ টাকা দান করেন।

মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর একজন কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি বহুবিধ গুণের আধার ছিলেন। আর্ত্ত ও পীড়িতের কাহিনী শুনিলেই তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। তিনি জীবনে বুঝিয়াছিলেন ও এইমতে জীবনব্যাপী ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন যে, পীড়িত ও ব্যথিতের ব্যথা উপশমের চেষ্টার মধ্যেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আবির্ভাব অনুভূত হয়। তদীয় বহু অনুষ্ঠানের মধ্যে কটক রোড নামক সুদীর্ঘ রাজপথ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট কীর্ত্তি। ইহা তাঁহার নাম দেশবাসীর অন্তরে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি এই সুদীর্ঘ রাজপথ রেলপথ নির্ম্মিত হইবার বহু পূর্ব্বে পুরীধামের শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবকে দর্শনের সুবিধার্থ হিন্দুজনসাধারণের জন্য বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া হইতে পুরীধামের শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত এই সুবিস্তৃত রাজবর্ত্মের দৈর্ঘ্য ২৮০ মাইল। তীর্থযাত্রীদিগকে দীর্ঘ দিন এই পথ বাহিয়া যাইতে হইত। তাহাদের থাকিবার সুবিধার

জন্য কিছু দূরে দূরে ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহৎ বৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে দুইখানি প্রশস্ত ঘর, একটী বড় দালান এবং অপর একটী বিস্তৃত ঘর ছিল। এই বিস্তৃত ঘরটীকে আবার অনেকগুলি কুঠারীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল যাহাতে বহুপরিবার এখানে একসঙ্গে আশ্রয় লইতে পারে। প্রত্যেক ধর্ম্মশালাভবনে সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ ও পুষ্করিণী ছিল এবং বৃক্ষলতাও চতুর্দ্দিকে রোপিত হইয়াছিল। রথযাত্রা ইত্যাদি মহাপর্ব্ব উপলক্ষে যখন দলে দলে তীর্থযাত্রীরা ভারতের চতুর্দ্দিক হইতে এই রাস্তা বাহিয়া জগন্নিধান পুরুষোত্তম-দর্শনে যাত্রা করিত, তখন এই সমস্ত ধর্ম্মশালার প্রত্যেকটীকে প্রায় ৫০০।৬০০ তীর্থযাত্রী থাকিতে পারিত। এই ধর্ম্মশালাগুলিই তখন তীর্থযাত্রীদের একমাত্র আশ্রয় ছিল। এইরূপ কতকগুলি ধর্ম্মশালার নাম করা যাইতেছে—কাঠজুড়ী নদীর তীরস্থ বরঙ্গে একটী, পুরীজেলাস্থ কঞ্চিনদীর তীরে আঠারনালায় একটী, কটকজেলায় মহানদীতীরস্থ তঙ্গীতে একটী, বৈতরণী-তীরস্থ আখুয়াপদতে একটী, বামনীনদীর কূলে একটী, শালুন্দী-নদীতীরে ভদ্রকে একটী, বংশবান-নদীতীরে সোরাতে একটী, বড় বল্লঙ্গ-নদীতীরে বালেশ্বরে একটী, জলকা-নদীতীরে খুস্তাবস্তায় একটী, বালেশ্বর জেলায় সুবর্ণরেখা-নদীর তীরে রাজঘাতে একটী, দাঁতনে একটী, কোশাজি-নদীতীরে একটী, দেবনাথে একটী, রূপনারায়ণনদের তীরে কোলাতে একটী, দামোদরনদতীরে চণ্ডীতলায় একটী। এই সকল ইষ্টকনির্ম্মিত প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা ঝড়বৃষ্টি, শীতাতপ হইতে ধর্ম্মপিপাসু তীর্থযাত্রীদিগকে আশ্রয় দান করিত। কতকগুলি ধর্ম্মশালা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার প্রত্যেকটীর পরিমাণ ১০ বিঘা হইতে ১৫ বিঘা পর্য্যন্ত। ১৮৪০ সালের প্রাদেশিক বন্দোবস্তে এগুলি নিষ্কর ধার্য্য হইয়াছিল। এই সমস্ত ধর্ম্মশালা ব্যতীত এই পুরীর রাস্তায় দুই চারি মাইল অন্তরে অন্তরে বহু কূপ খনন করান হইয়াছিল। এই রাজবর্ত্ম বহু নদনদীর উপর দিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য

কত সুদৃঢ় সেতু প্রচুর অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। দিল্লীর তৎকালীন মোগল-সম্রাট সাহ আলম ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে অসাধারণ জনহিতৈ-ষণা ও দানশীলতার জন্য সুখময় রায়কে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি ও "চারহাজারী" মনসবদারী (চারিহাজার সৈনিকের অধিনায়ক-পদ) প্রদান করেন এবং ঝালর-দেওয়া পাল্কী ব্যবহার করিবার অধিকার দেন। তখনকার কালে ঝালর-দেওয়া পাল্কী ব্যবহার করা অত্যন্ত সম্মানজনক ছিল। এই একই সনন্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে রাজাহাদুর উপাধি ও "দোহাজারী" পদ প্রদত্ত হয়। এই দানবীর মহাপ্রাণ মনসবদার মহারাজা সুখময় রায়ের বিরাট দান ও জনসেবার খ্যাতি এতদূর ব্যাপ্ত হইয়াছিল যে, ১৮১১ খৃষ্টাব্দে পারশ্যের সাহ মহোদয়ও তাঁহাকে দিল্লীশ্বর যে উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন সেই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি এই উপাধির সনদ "বোর্ড অব্ কনট্রোল" (Board of Control) এর মারফতে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর-প্রদত্ত 'মহারাজা' উপাধি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও মানিয়া লন; কারণ তাঁহারাও তাঁহাদের প্রতি মহারাজের অবিচলিত অনুরাগের বিষয় জানিতেন। যখন মহারাজা সুখময় এই সকল উপাধিতে ভূষিত হন তখন মারকুইস অব হেষ্টিং ভারতের বড়লাট ছিলেন। মহারাজা সুখময় যখন শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিবার জন্য পুরীতীর্থে গমন করেন সেই সময়ে বড়লাট তাঁহাকে ও তাঁহার বংশধরদিগকে কতকগুলি বিশিষ্ট সুযোগ ও অধিকার প্রদান করেন। মহারাজা সুখময়ের সম্মান, পদমর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি এতই অধিক ছিল যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার তীর্থযাত্রার সময়ে তাঁহাকে সকল প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করিতে সতত উন্মুখ ছিলেন।

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরই ছিলেন উহার একমাত্র বাঙ্গালী ডিরেক্টর। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর রামচন্দ্র রায়,

বৈদ্যনাথ রায়, শিবচন্দ্র রায়, কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং নরসিংহচন্দ্র রায় নামে পাঁচটী পুত্রসন্তান রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

মহারাজা রামচন্দ্র রায় বাহাদুর

ইনি ১৮১১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে মহারাজা বাহাদুর এবং ২০০০ পদাতিক এবং ২০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক হইবার অধিকার পাইয়াছিলেন। অধিকন্তু তাঁহাকে ঝালর-দেওয়া পাল্কী ব্যবহার করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। যে সনদে তাঁহার পিতাকে মহারাজা বাহাদুর উপাধি দেওয়া হয় সেই সনদেই তাঁহাকেও রাজা বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল। তখন তাঁহার পিতা মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর জীবিত ছিলেন। মহারাজা রামচন্দ্রও তাঁহার পিতার ন্যায় দানশীল ও জনহিতৈষী ছিলেন এবং জনসাধারণের হিতকর বহু কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন গয়া ও অন্যান্য তীর্থে গমন করেন সেই সময়ে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁহাকে পাশপোর্ট বা ছাড়পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ৪জন সশস্ত্র অনুচর রাখিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মে তারিখে মহারাজা রামচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

রাজা রাজনারায়ণ রায়

মহারাজা রামচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র রাজা রাজনারায়ণ রায়। ইঁহাকে সম্ভ্রম ও শিষ্টাচার প্রদর্শনের জন্য রাজা বলা হইত। ১৮৩১ খৃঃ ২৩শে এপ্রিল তারিখে অল্পবয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। অকাল মৃত্যুর জন্যই গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে উপাধিমণ্ডিত করিবার অবসর পান নাই।

রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়

রাজা রাজনারায়ণ রায়ের পুত্র ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়েরও অকালমৃত্যু ঘটিয়াছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। লোকে ইঁহাকে রাজা বলিয়া অভিহিত করিত।

রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়

রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের একমাত্র পুত্র রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়। ইঁহার পিতামহ ও পিতার অকাল মৃত্যুতে বিষয়-সম্পত্তি অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। দীনেন্দ্রনারায়ণ এই বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে সম্পত্তিকে মুক্ত করেন। তিনি শিষ্টাচারসম্পন্ন ও বিনয়ী ছিলেন। তিনি গড়পারে দুইখণ্ড এবং জোড়াসাঁকো সিকদারপাড়া অঞ্চলে একখণ্ড ভূমি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীকে দান করেন। উহার মূল্য মোট ৩২০০০৲ টাকা হইবে। এই দানের জন্য মিউনিসিপ্যালিটী একটী রাস্তা রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট নামে এবং অপর দুইটী রাস্তা রাজা রাজনারায়ণ ষ্ট্রীট ও রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীট নামে অভিহিত করিয়াছেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "কুমার" উপাধি, এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। ইহা ব্যতীত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক উপলক্ষে তাঁহাকে গভর্ণমেণ্ট Certificate of Honour বা মানপত্র দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ ১৯১৪ খৃঃ হইতে ১৯১৫ খৃঃ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তিনি ১৮৮২ খৃঃ হইতে ১৯১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনে করদাতাদের নির্ব্বাচিত কমিশনার ছিলেন এবং ১৯১৫ খৃঃ তিনি কর্পোরেশনে গভর্ণমেণ্ট মনোনীত কমিশনার ছিলেন। তিনি কলিকাতা ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির সদস্য, সেক্রেটারী, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ও প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি ১৯০২ খৃঃ হইতে ১৯০৪ খৃঃ পর্য্যন্ত কলিকাতার পোর্ট কমিশনর ছিলেন। ১৮৮৬ খৃঃ হইতে ১৯১৫ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি অনারারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৮৪৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৫ খৃঃ ২৬শে আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু পর কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউসনে এক সাধারণ সভা আহূত হইয়াছিল

এবং উক্ত সভার প্রস্তাবানুযায়ী তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ কলিকাতা টাউন-হলে একটী মর্ম্মর-প্রস্তর নির্ম্মিত অর্দ্ধমূর্ত্তি (bust) সংস্থাপিত করা হইয়াছে।

কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়

রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়ের একমাত্র পুত্র কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ ১৮৮৬ খৃঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইঁহার পিতৃদেবের ন্যায় শিষ্টাচারপরায়ণ, বিনয়ী ও ভদ্রস্বভাব। ১৯১৪ খৃঃ গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে কুমার উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ইনি ডিষ্ট্রিকট চ্যারিটেবল সোসাইটীর ভারতীয় শাখার সহিত ১৯০৪ খৃঃ হইতে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। ১৯২৩ খৃঃ হইতে ইনি ইহার অনারারী সেক্রেটারীর কার্য্য করিতেছেন। উক্ত সোসাইটীর হস্তে ইনি ১০,২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। উহাতে তাঁহার নামে একটী স্থায়ী অর্থভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ইনি অনারারী প্রেসিডেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। ইঁহার ছয় পুত্র, শৈলেন্দ্রনারায়ণ, বীরেন্দ্রনারায়ণ, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ, সুরেন্দ্রনারায়ণ, জিতেন্দ্রনারায়ণ এবং আদিত্যনারায়ণ।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়

মহারাজা বাহাদুর সুখময় রায়ের মধ্যম পুত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১৮১৮ খৃঃ পরলোক গমন করেন। তিনি তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি তাঁহাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউকে উৎসর্গ করিয়া যান।

রাজা বৈদ্যনাথ রায়

রাজা বৈদ্যনাথ রায় মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র। তিনি বহু পরিমাণে পিতৃগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় উন্নত এবং উদার ছিল। তিনি যেমন নিষ্কলঙ্কচরিত্র, তেমনই শিষ্টাচারসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার বদান্যতায় প্রীত হইয়া লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁহাকে রাজা উপাধি, একটী সুবর্ণ পদক এবং তরবারি-প্রদানে সম্মানিত করেন।

হিন্দু কলেজ ফণ্ডে ৫০,০০০৲ টাকা এবং কুমারী উইলসনের প্রতিষ্ঠিত দেশীয় স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার-ভাণ্ডারে ২০,০০০৲ টাকা তিনি প্রদান করিয়াছিলেন। কর্ম্মনাশা নদীর উপর সেতুনির্ম্মাণের জন্য তিনি ৮০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। পশু-পক্ষী-পালনে তিনি সমধিক আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি লণ্ডনের পশুশালা-সম্পর্কিত বিদ্বৎ সভায় ৬০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। লণ্ডনের জুলজিক্যাল সোসাইটী তজ্জন্য তাঁহাকে উক্ত সমিতির সদস্য নিয়োগ করিয়া নিম্ন মর্ম্মে সদস্য-নিয়োগপত্র প্রেরণ করেন :—

লণ্ডনের প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি ইংলণ্ডের বহুগণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত বিদ্বজ্জনের সমবায়ে গঠিত। এই সমিতির প্রেসিডেণ্ট মারকুইস অব ল্যান্সডাউন এবং ভাইস-প্রেসিডেণ্ট (১) ডিউট অব সমরসেট (২) লর্ড অকল্যাণ্ড (৩) আরল অব চারনলি (৪) লর্ড ষ্ট্যানলি (৫) আরল অব এগ্রেমণ্ট এবং (৬) চার্লস বারিংওয়াল।

ইঁহারা উক্ত সমিতির পক্ষ হইতে রাজা বৈদ্যনাথ বাহাদুরকে জ্ঞাপন করেন :—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বঙ্গীয় গোলন্দাজ সেনার ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মেজর-জেনারেল টমাস হার্ডউইকের মারফতে আমরা জানিতে পারিলাম যে, রাজাবাহাদুর ও তাঁহার পুত্র আমাদের সমিতির সদস্য হইতে চাহিয়াছেন। ইহাতে আমরা আনন্দিত। মেজর-জেনারেল টমাস হার্ডউইক আমাদিগকে আরও জানাইয়াছেন যে, প্রাণিবিদ্যার অনুশীলনে সাহায্য করিতে আপনি সদাই প্রস্তুত। এজন্য আপনি একটি বড় পশুশালার ব্যয়ভার বহন করিতেছেন এবং তাহাতে সকলেরই অবাধ প্রবেশাধিকার আছে। আপনি অন্যান্য জনহিতকর অনুষ্ঠানেও মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করেন। ভারতে সাধারণ শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারকল্পে আপনি যে ২০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি এবং সেজন্য আপনার উপর আমাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ

জন্মিয়াছে। আপনি ও আপনার ভ্রাতৃবর্গ কাশীপুর ঘাট এবং তথা হইতে দমদমা গোরাবারিক পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত রাজপথ তৈয়ারি করাইয়া দিয়াছেন তজ্জন্য ব্রিটিশ ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল মহামান্য জন আলম আপনাকে সম্মানিত করিয়াছেন। এইসকল কারণে এই সমিতি আপনার উপর শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আপনাকে এবং আপনার পুত্র কুমার রাজকৃষ্ণ রায়কে এই সমিতির সদস্য-পদে বরণ করিলেন।

বর্ত্তমান গান ফাউণ্ড্রী রোডের উত্তর এবং বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিমে তাঁহার কাশীপুরস্থ ভবনের সংলগ্ন স্থানে তিনি এক পশুপালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় সাধারণের দর্শনাধিকার ছিল। তৎকালে উক্ত রূপ পশুশালা অন্য কোথাও ছিল না। উক্ত স্থান অদ্যাপি চিড়িয়াখানার মোড় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তিনি কাশীপুরে গঙ্গার ঘাট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কাশীপুরে গঙ্গার ঘাট হইতে দমদমা গোরাবারিক পর্য্যন্ত গান ফাউণ্ড্রী রোড নামে সুপ্রশস্ত রাজপথ—যাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান তিনি প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। এই কারণে সৈন্যগণ উক্ত রাস্তায় গমনাগমন-কালে রাজা বৈদ্যনাথ রায় মহাশয়ের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ তোপধ্বনি করিত। বিবিধ লোকহিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য ব্রিটিশ ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল মহামান্য জন আলম তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটী সম্মানসূচক সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ পদক পরিয়া সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কোন সভাদিতে যোগদান করিলে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে সম্মানসূচক আসনে অধিষ্ঠিত করাইতেন। ভারতীয় অস্ত্র আইন হইতে তিনি অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রশস্ত্র রাখিতে পারিতেন।

রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের গুপ্ত দানও বিস্তর ছিল। ভরতপুর যুদ্ধ জয়

করিয়া যখন লর্ড কম্বরমিয়ার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সে সময়ে রাজা বাহাদুর তাঁহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র, কুমার রাজকৃষ্ণ রায় এবং কুমার কালীকৃষ্ণ রায়। কুমার রাজকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই পুত্র কুমার জয়গোবিন্দ রায় এবং কুমার শ্যামাদাস রায় পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

কুমার আশুতোষ রায়

কুমার জয়গোবিন্দ রায়ের পুত্র কুমার মনোহরচন্দ্র রায়। কুমার মনোহরচন্দ্র রায়ের পুত্র কুমার আশুতোষ রায়। তিনি তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন এবং গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। সুব্যবস্থা দ্বারা তিনি তাঁহার সম্পত্তির আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। নর্থ সুবারবন হাসপাতালে তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন এবং তিনি বহু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি বিনা আড়ম্বরে গোপনে বিপন্নগণকে অর্থসাহায্য করিতেন। কুমার আশুতোষ রায় নাবালক পুত্র কুমার বিশ্বনাথ রায়কে উত্তরাধিকারী রাখিয়া ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হয়েন। কুমার বিশ্বনাথ এক্ষণে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর। তিনিও জনহিতৈষী এবং বহু সদনুষ্ঠানে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন।

কুমার শ্যামাদাস রায়ের চারি পুত্র,—কুমার কার্ত্তিকচন্দ্র রায়, কুমার বিহারীলাল রায়, কুমার পিয়ারীলাল রায় এবং কুমার গোরাচাঁদ রায়।

কুমার কালীকৃষ্ণ রায়

কুমার কালীকৃষ্ণ রায় অতি অল্প বয়স হইতেই দানশীলতার এবং শিক্ষানুরাগের পরিচয় প্রদান করেন। পাইকপাড়া এংলো-ভার্ণাকুলার সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল বহু বৎসর একমাত্র তাঁহারই অর্থসাহায্যে পরিচালিত হইয়াছিল। কাশীপুরে যখন নর্থ সুবারবন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি উক্ত সদনুষ্ঠানে ৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন এবং

হাসপাতালের পরিচালনার জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা হিসাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি লর্ড নেপিয়ারকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং লর্ড এলগিন তাঁহাকে দরবারের সময় তাঁহার পিতার স্বর্ণ পদক ও তরবারি ধারণ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কুমার কালীকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু হয়।

কুমার দৌলতচন্দ্র রায়

কালীকৃষ্ণের দুই পুত্র কুমার দৌলতচন্দ্র রায় এবং কুমার নগরনাথ রায়। কুমার দৌলতচন্দ্র রায় এবং কুমার নগরনাথ রায় দানশীল এবং শিক্ষানুরাগী ছিলেন। কুমার দৌলতচন্দ্র রায়ের প্রদত্ত টাকার উপস্বত্ব হইতে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় যে ছাত্র সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে তাহাকে একটী করিয়া স্বর্ণ পদক প্রদান করা হয়। বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের গৃহনির্ম্মাণ-তহবিলে তিনি ৩০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। অনেক সময় তিনি উক্ত স্কুলের পারিতোষিক-বিতরণের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিতেন। লেডী ডফারিণ ফণ্ডে তিনি ৩০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। কলিকাতার ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটেবল সোসাইটীতে তিনি প্রতি বর্ষেই অর্থসাহায্য করিতেন। সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিচালিত বালিকা-বিদ্যালয়ে তাঁহার মাসিক অর্থসাহায্য বরাদ্দ ছিল। তিনি আজীবন এই বিদ্যালয়ের উন্নতি-প্রয়াসী ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং ইণ্ডিয়া ক্লাবের সদস্য ছিলেন। লর্ড ল্যান্সডাউন তাঁহাকে দরবারের সময় তাঁহার পিতামহের স্বর্ণ পদক এবং তরবারি ব্যবহারের অনুমতি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

কুমার দৌলতচন্দ্র রায়ের দুই পুত্র, কুমার তেজেশচন্দ্র রায় ও কুমার সতীশচন্দ্র রায়। তেজেশচন্দ্র মেধাবী যুবক ছিলেন।

কুমার নগরনাথ রায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার হরিশচন্দ্র রায়কে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। কুমার হরিশচন্দ্র বিনয়ী, বিদ্যানুরাগী ও শিষ্টাচারশীল।

রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর

রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের চতুর্থ পুত্র। তিনি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। কুমার কালী-কুমার রায় তাঁহার দত্তকপুত্র। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মারা যান। বদান্যতা, এবং জনহিতকর কার্য্যে সাহায্য-প্রদানের জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট শিবচন্দ্রকে রাজাবাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর

রাজা নরসিংহ চন্দ্র রায় বাহাদুর মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র। মহারাজা সুখময়ের বিপুল সম্পত্তি তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইলে রাজা নরসিংহ চন্দ্রের অংশে পৈত্রিক প্রাসাদ ও রামলীলার বাগান পড়িয়াছিল। বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপরে এই বাগান অবস্থিত। সেকালে এত সুন্দর উদ্যান-বাটিকা সহরের উপকণ্ঠে আর ছিল না। কলিকাতার সৌখিন ধনবানগণ এই বাগানে বেড়াইতে আসিতেন। রাজা নরসিংহচন্দ্র দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা শিবচন্দ্র সেতুনির্ম্মাণ জন্য ১৬,৭০০৲ টাকা গভর্ণ-মেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন; দেশীয় হাসপাতাল-সমূহেও তাঁহারা ২০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। বহু জনহিতকর সদনুষ্ঠানে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য এবং অবিচলিত রাজভক্তির জন্য লর্ড আমহার্ষ্ট নরসিংহচন্দ্রকে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন এবং তাঁহাকে চারি ঘোড়ার গাড়ীতে বেড়াইবার অনুমতি দেন। সেকালে চারি ঘোড়ার গাড়ীতে আরোহণ করা সবিশেষ সম্মানজনক ছিল। বড়লাট বাহাদুরের প্রাসাদে অনুষ্ঠিত সকল দরবার ও লেভীতেই

রাজা নরসিংহ চন্দ্র

তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। ইহা ব্যতীত তিনজন অস্ত্রধারী রক্ষিনিয়োগের ক্ষমতাও তাঁহাকে গভর্ণমেণ্ট দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় সমারোহের সহিত জগন্নাথ-দর্শনে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার জন্য ছাড়পত্র দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার রাস্তা-সমূহের সুপারিন্টেন্‌ডেণ্ট মহাশয় রাজা নরসিংহ-চন্দ্রকে এক উর্দ্দু পত্র ১৮৪২ খৃঃ ১৫ই মার্চ্চ তারিখে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন :—

বড়লাট বাহাদুরের আদেশ অনুসারে আপনাকে জানাইতেছি যে, ১৮২৬ খৃঃ আপনি এবং আপনার ভ্রাতা রাজা শিবচন্দ্র রায় কর্ম্মনাশা নদীর সেতুর সংস্কার ও রক্ষা করিবার কর্ম্মচারীর ভরণ-পোষণ জন্য সেক্রেটারী কুলপেব সাহেবের হাতে ১০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খৃঃ পর্য্যন্ত সেই টাকার এক পয়সাও খরচ হয় নাই। সেই টাকা সুদে আসলে ১৬,৭০০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে এবং কোম্পানী বাহাদুরের তহবিলে মজুত আছে। উক্ত সেতুর পরিবর্ত্তে পাটনিমলের রাজা স্বব্যয়ে আর একটী পাথরের সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট কিন্তু উক্ত সেতুটীর সংস্কার-ব্যাপারে ১৯,৯৭৮৲ টাকা ৫ পাই ব্যয় করিয়াছেন। যদি আপনি ঐ টাকা অর্থাৎ ১৬,৭০০৲ উক্ত সেতুর সংস্কারে ব্যয়িত ১৯,৯৭৮৲ টাকা ৫ পাই এর আংশিক সাহায্য-হিসাবে দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাকে জানাইলে আমি আপনাদের দুই ভ্রাতার এই দানের বিবরণ একখণ্ড শ্বেতপ্রস্তরে খোদিত করিয়া সেতুর প্রাচীরে গাঁথিয়া দিতে পারি। অথবা যদি আপনি একটী নূতন সেতুই তৈয়ারি করাইতে চান, তাহা হইলে কলিকাতা হইতে কাশী যাইবার পথে অন্য কোন নদীর উপর একটী লোহার সেতু তৈয়ারি করা যাইতে পারে, ইহাতে আপনাদের নাম চিরস্মরণীয় হইবে। এই দুইটী বিষয়ের মধ্যে কোন্‌টী আপনার অভিপ্রেত তাহা

আপনি সত্বরে আমাকে জানাইবেন; কারণ আপনার অভিপ্রায় মিলিটারী বোর্ড ও গভর্ণমেণ্টকে জানাইতে হইবে।

তারিখ ১৫ই মার্চ্চ ১৮৪২ স্বাক্ষর

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট, বি ও বি রোডস্।

বর্দ্ধমান ও বেনারস রোডস্ আপিশ হইতে ১৮৪২ খৃঃ ২২শে জুলাই তারিখে রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়ের নিকটে এই মর্শ্মে আর একখানি পত্র আসিয়াছিল :—

মিলিটারী বোর্ডের সেক্রেটারী এ সম্বন্ধে গত ২১শে জুন আমাকে যে পত্র লেখেন এবং যাহার নকল আপনাকে এই সঙ্গে পাঠাইতেছি তদনুসারে আমার অনুরোধ যে, আপনাদের প্রদত্ত ১৬,৭০০৲ টাকায় একটী নূতন সেতু নির্ম্মিত হইবে কি না সে সম্বন্ধে শীঘ্র আপনার মতামত জানাইবেন। বলা বাহুল্য, এই টাকায় নূতন সেতু নির্ম্মিত হইলে তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি পূর্ণভাবে আপনাদেরই নিজস্ব হইবে। আপনি ইতিপূর্ব্বে আপনার প্রেরিত পূর্ব্ব পত্রে জানাইয়াছিলেন যে, আপনি ইহার অধিক টাকা দিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনার উদ্বেগের কোন কারণ নাই। কারণ নূতন রাস্তায় যে কয়েকটী সেতু নির্ম্মিত হইবে তাহাদের মধ্যে একটী আপনাদের প্রদত্ত টাকায় তৈয়ারী হইতে পারিবে।

সেতু নির্ম্মিত হইলে পর একখণ্ড মর্ম্মরপ্রস্তরে আপনাদের দানের যথাযোগ্য বিবরণ খোদিত হইবে এবং উহা সেতুগাত্রে সংলগ্ন করা হইবে।

উপরিলিখিত প্রস্তাব আপনার অনুমোদিত হইলে যে নদীর উপর সেতু নির্ম্মিত হইবে সেই নদীর নাম এবং সেতুর নক্সা আপনার অবগতির জন্য পাঠাইয়া দিব।

(স্বাক্ষর) সি, এ, সি, এলকক, কাপ্তেন

সুপাঃ রোডস্।

হাসপাতালে দান

রাজা শিবচন্দ্র রায় ও রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়

সমীপে

মহাশয়গণ,

গভর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী মহাশয় নেটিভ হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে, আপনারা এই হাসপাতালে ২০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই বিরাট দানের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে আমি আপনাদিগকে কর্ত্তৃপক্ষের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আপনাদিগকে আরও ইহা জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, চাঁদা-দাতৃগণের পরবর্ত্তী সভায় আপনাদের নাম উপস্থাপিত করা হইবে এবং নেটিভ হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষভুক্ত হইবার অর্থাৎ গভর্ণর হইবার দাবীর বিষয়ও নিঃসন্দেহে এই সভাতে আলোচিত ও গ্রাহ্য হইবে।

স্বাক্ষর (বুঝা যায় না)

সেক্রেটারী

২১শে এপ্রিল, ১৮২৬

রাজা বাহাদুরের সনন্দ

ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারল লর্ড আমহার্ষ্ট কর্ত্তৃক রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুরের নিকট প্রেরিত ফারসী ভাষায় লিখিত চিঠির বঙ্গানুবাদ—

আপনার ঔদার্য্য ও সৎসাহস আপনাকে সমাজে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে; বংশগৌরবে ও পদমর্য্যাদায় আপনি সর্ব্বত্র সম্মানিত, প্রতিষ্ঠিত ও সাধারণের গৌরবভাজন হইয়াছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, আপনি শান্তিতে থাকুন। পুরুষানুক্রমে আপনারা রাজানুরক্ত এবং সকল সদনুষ্ঠানে অগ্রণী। গভর্ণমেণ্ট পুনঃ পুনঃ ইহার পরিচয় পাইয়াছেন। বিশেষতঃ আপনি দেশের এবং দশের কল্যাণকর কর্ম্ম

করিতে সদাই আগ্রহান্বিত এবং তাহা করিয়াও থাকেন। এই সকল কারণে আমি আপনাকে রাজা এবং বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়া আপনার সম্মান বর্দ্ধন করিলাম। আপনি অতঃপর চারি ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহার করিবার অধিকার পাইলেন। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আপনি এই যে রাজসম্মান ও উচ্চসম্ভ্রমসূচক উপাধি লাভ করিলেন, আশা করি, আপনি ইহার সদ্ব্যবহার করিবেন এবং আপনার রাজভক্তি ও দেশের কল্যাণসাধনে অনুরাগ ও আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

(স্বাক্ষর) আমহার্ষ্ট

১৯শে মে, ১৮২৬

(হিজরী ১২৪১, ১০ই শাওয়ান)

দরবারে উপস্থিতির সনন্দ

রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুরকে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তারিখে গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী মার্কনটন সাহেব এক পত্র লিখিয়া জ্ঞাপন করেন যে, মহামান্য বড়লাট বাহাদুর আপনার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন, অতঃপর আপনি দরবারে উপস্থিত হইবেন।

উক্ত খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী আর একখানি পত্রে তিনি আরও স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, বড়লাট বাহাদুরের লেভিতে আপনি যোগদান করিবার অনুমতি পাইয়াছেন এবং বড়লাট বাহাদুর আমাকে এ সংবাদ আপনার নিকট পাঠাইতে বলিয়াছেন।

পুরীতীর্থে যাইবার ছাড়পত্র

১২৪৯ হিজরী ১৫ই সুকুর তারিখে অর্থাৎ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে গভর্ণমেণ্ট রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুরকে পুরীতীর্থে যাইবার জন্য এক ছাড়পত্র (Passport) দান করেন। মূল ছাড়পত্র-

খানি ফারসী ভাষায় লিখিত, উহার বাঙ্গলা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শুল্ক বা কর-সংগ্রহের কলেকটরগণ, প্রহরী শান্ত্রী সকল, রাস্তা ঘাটের রক্ষকদল, তোমরা জানিয়া রাখ যে রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর হাঁটা পথে কলিকাতা হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথতীর্থে গমন করিতেছেন। তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত লোকজন ও জিনিষপত্র আছে। মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের আদেশমত আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, অসঙ্গত কর আদায়ের জন্য তোমরা কেহ পথে বা ঘাঁটিতে তাঁহার গতি-রোধ করিবে না ; কিন্তু তদ্বিপরীতে তাঁহাকে রক্ষা করিবে এবং তোমা-দের নিজ নিজ ঘাঁটির ভিতর দিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে যাইতে দিবে। যে কর গভর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে ধার্য্য আছে তাহা তিনি বিনা আপত্তিতে প্রদান করিবেন। তোমরা এই আদেশ বিশেষ জরুরি বলিয়া জানিবে এবং তদনুসারে কর্ম্ম করিবে।

লোকজন ও জিনিষপত্রের তালিকা

হস্তী ....২টী

ঘোড়া........................১০টী

গাড়ী........................২০খানা

পালকী........................১৬খানা

পশমী, সোণার জড়িদার
ও অন্যান্য পরিধেয় ১ প্রস্থ

সোণার ও রূপার থালা ....১প্রস্থ

মালপত্র ও কার্পেট প্রভৃতি……………১প্রস্থ

সশস্ত্র অনুচর, শান্ত্রী ও প্রহরী……………১০০জন

তারিখ ৪ঠা জুলাই ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ

১২৪৯হিজরী ১৫ সুকুর

গভর্ণমেণ্টের

শীল মোহর (স্বাক্ষর) ডব্লিউ এইচ ম্যাকটন

গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

রাজকুমার রায়

রাজকুমার রায় রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়ের একমাত্র সন্তান; তিনি তাঁহাদের পৈত্রিক বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়ের দুই স্ত্রী সরস্বতী ও চুণীমণি। রাজকুমার রায়ের শ্যামা নামে এক ভগিনী ছিলেন।

সন ১২৬৬ সালে রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় তাঁহার একমাত্র সন্তান—রাজকুমারকে রাখিয়া পরলোকগমন করেন। তখন রাজকুমার রায়ের বয়স প্রায় ৪১ বৎসর। তিনি পৈত্রিক বিষয় পাইয়া উহাকে বৰ্দ্ধিত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু অনেক সময় তিনি প্রতারণায় পড়িতেন। তাঁহার পিতার রাজা উপাধি ছিল বলিয়া তিনি কুমার উপাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু জনসাধারণ তাঁহাকে সম্মান করিয়া রাজা বলিতেন। তিনি যেমন শান্ত শিষ্ট তেমনই পরদুঃখকাতর ছিলেন; নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও মধুর স্বভাবের জন্য সকলেই তাঁহার অনুরাগী ছিলেন। কুমার রাজকুমার রায়ের সরলতা ও যোগ্যতা দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দিয়াছিলেন।

অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিয়োগপত্র।

ইংরাজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তারিখে কুমার রাজকুমার

কুমার রাজকুমার রায়

রায়কে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট কলিকাতার অনারারি ম্যাজি-ষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন। এই সঙ্গে তাঁহাকে "জষ্টিস অফ দি পিশ ফর দি টাউন অফ ক্যালকাটা"র নিয়োগপত্র দিবারও ব্যবস্থা হয়।

অস্ত্র আইন হইতে অব্যাহতি

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার বেভারলি সাহেব কুমার রাজকুমার রায়কে পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্টের আদেশে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১১ আইন-মতে অস্ত্র আইনের আমল হইতে আপনাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল।

কুমার রাজকুমার রায় এরূপ পরদুঃখকাতর ছিলেন যে, বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত কোন ব্যক্তি অসময়ে অর্থের জন্য আসিলে তাঁহাকে বিমুখ করিতেন না। তিনি যাঁহা-দিগকে টাকা কর্জ্জ দিতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকের নিকট হইতে আর টাকা ফেরত পাইতেন না; এইরূপে তাঁহার বিস্তর অর্থ নষ্ট হয়। অযোধ্যার বেগমগণ ও মুচিখোলার নবাব তাঁহার নিকট হইতে অনেক টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন কিন্তু তাহা আর পরি-শোধ করা হয় নাই। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হয় তখনও তাঁহার কয়েক লক্ষ টাকা নষ্ট হয়, ইহাতে তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হন। এইরূপে বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তিনি বড়ই চিন্তিত হন এবং ঐ সময় হইতে তিনি সকল আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া খুব অল্প খরচে চলিতে থাকেন। তিনি বাজে খরচ একে-বারেই পছন্দ করিতেন না এবং কোনও রূপ বাবুগিরিতে মত্ত থাকি-তেন না, কুমার রাজকুমার রায়ের দুই স্ত্রী ছিলেন, আনন্দময়ী ও প্রসন্নময়ী। আনন্দময়ীর এক কন্যা কালিদাসী। প্রসন্নময়ীর এক কন্যা দুর্গাদাসী এবং দুই পুত্র—রাধাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ।

কুমার রাজকুমার রায় ১২৯৭ সালে প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে এক পুত্র

রাধাপ্রসাদ রায় ও দুই কন্যা রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। দেবী প্রসাদ রায় তাঁহার জীবদ্দশাতেই মারা যান।

রাধাপ্রসাদ রায়

রাধাপ্রসাদ রায় কুমার রাজকুমার রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। অনুমান ১২৫৭ সালে পোস্তার বাটীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু স্কুল হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। লেখাপড়া শিখিতে তাঁহাকে ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। পুত্রগণকে লেখাপড়া শিখাইবার তাঁহার পিতার বিশেষ কোন চেষ্টা ছিল না, তজ্জন্য রাধাপ্রসাদ রায়ের উচ্চশিক্ষা পাইবার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে নাই।

রাধাপ্রসাদ রায়ের পুত্র হয় নাই, কেবল দুইটী কন্যা। এই কন্যাদ্বয়ের বিবাহের সময় তিনি তাঁহার বসত-বাটীর ভাড়াটিয়া তুলিয়া দেন এবং বাটীটী ভাল করিয়া মেরামত করিয়া লন। তাঁহার পিতার এরূপ স্বভাব ছিল যে, তিনি কখনও একটী গাড়ী কিম্বা ঘোড়া রাখেন নাই। কিন্তু রাধাপ্রসাদ তাঁহার পিতাকে বুঝাইয়া গাড়ী-ঘোড়া রাখাইয়াছিলেন। রাধাপ্রসাদ রায়ের কন্যাদ্বয়ের বিবাহের সময় কুমার রাজকুমার রায় জীবিত ছিলেন। রাধাপ্রসাদ রায় অতিশয় দয়াবান ও পরদুঃখকাতর ছিলেন; তাঁহার দ্বার অবারিত ছিল। তাঁহার কাছে কখন কেহ কিছু চাহিলে তিনি তাহাকে বিমুখ করিতেন না। তাঁহার একটী বাটী ছিল, আত্মীয়স্বজন বিপদে পড়িলে সেই বাটীতে থাকিতে দিতেন। মহারাজা স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর ও রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কখনও বিপদে পড়িলে পরস্পর পরস্পরকে সাধ্যানুসারে বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন। গীতবাদ্যে রাধাপ্রসাদের খুব সখ ছিল। তিনি দেশ বিদেশ হইতে গায়ক আনাইয়া তাহাদের গান শুনিতেন। অন্ত্র

৺রামাপ্রসাদ রায়

আইন হইতে তাঁহার ছাড় ছিল। তিনি বহু সদনুষ্ঠানে সাহায্য করিয়া রাজভক্তি ও সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন।

রাধাপ্রসাদ রায় যদিও উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই তথাপি এরূপ বিদ্যানুরাগী ছিলেন যে, স্বয়ং "বিজ্ঞানকল্পলতিকা" "বিজ্ঞানশান্তি কুসুম," "বিজ্ঞানীতিপ্রসূন" ও "বঙ্গে বর্ত্তমান বিবাহপ্রণালী" নামে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়া সাধারণকে বিতরণ করিয়াছিলেন। নিজে বাল্যে ভাল রকম শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া বিদ্যাশিক্ষার অভাব যে কত তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন এবং এই অভাব দূর করিবার জন্য তিনি "কুমার রাধাপ্রসাদ ইনষ্টিটিউশন" নামে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন। এই বিদ্যালয়ে গরীব ছাত্রদিগের বিনা বেতনে পড়িবার ব্যবস্থা আছে এবং পরীক্ষার ফল বাহির হইলে কৃতী ছাত্রদিগকে দুই বৎসরের জন্য মাসিক বৃত্তি দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর মধ্যে মারা যান।

তাঁহার পুত্রসন্তান না থাকায় কনিষ্ঠ কন্যার মধ্যম পুত্র গৌরমোহন মল্লিককে শৈশব হইতে তিনি আপন কাছে রাখিয়া পুত্রের ন্যায় লালন-পালন করিতেন। রাধাপ্রসাদ রায় ১৩০৯ সালে পত্নী কস্তুরীমঞ্জরী দাসী ও নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র হরিপ্রসাদ রায়কে রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রাণী কস্তুরীমঞ্জরী

কস্তুরীমঞ্জরী দাসী তাঁহার পতির মৃত্যুর পর বড়ই শোকগ্রস্তা হন এবং অতিশয় অসহায় অবস্থায় পড়েন। এই সময় তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা রসিকলাল মল্লিক তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। ১৩১০ সালে হরিপ্রসাদ রায় সাবালক হইলে হরিপ্রসাদ রায়ের মাতুল প্রমথনাথ মল্লিক কস্তুরীমঞ্জরীর নিকট হইতে হরিপ্রসাদ

রায়ের বিষয় পৃথক করিয়া লইয়া নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। হরিপ্রসাদ রায় বসত-বাটীর সদর ও রামলীলার বাগান এবং কস্তুরীমঞ্জরী দাসী বসত-বাটীর অন্দর প্রাপ্ত হন। ১৩১২ সালে কস্তুরীমঞ্জরী স্বর্গীয় রাধাপ্রসাদ রায়ের নির্দ্দেশমত গৌরমোহন মল্লিককে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া ইঁহার নাম বিষ্ণুপ্রসাদ রায় রাখেন।

কস্তুরীমঞ্জরী দাসী যে অতিশয় দানশীলা ও পরদুঃখকাতর ছিলেন তাহা তাঁহার কতিপয় কীর্ত্তি দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ১৩১৩ সালে তিনি একবার বাতরোগে আক্রান্ত হন, ইহাতে তিনি প্রায় দেড় বৎসর ধরিয়া কষ্ট পান। পরে ডাক্তার এম-এন ব্যানার্জ্জি এই রোগের কথঞ্চিত উপশম করিয়া দেওয়ায় তিনি ডাক্তারী চিকিৎসার উন্নতি ও দরিদ্র রোগীগণের রোগ-মুক্তির জন্য ডাক্তার এম-এন ব্যানার্জ্জির পরামর্শানুসারে বেলগাছিয়ার হাসপাতালটীকে দোতলা করিয়া দেন।

১৩১৪ সালে বিষ্ণুপ্রসাদ রায় এই হাসপাতালের ভিত্তিস্থাপন করেন। হাসপাতালটী নির্ম্মাণ করিতে কস্তুরীমঞ্জরী দাসীর প্রায় ৫১০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এস্থানে ইহার একটী ওয়ার্ড আছে তথায় দরিদ্রগণ বিনা ব্যয়ে সুচিকিৎসা পাইয়া থাকে। এই হাসপাতালটীর নাম "এলবার্ট ভিক্‌টর হাসপাতাল।" কস্তুরীমঞ্জরী দাসী কেবল ইহা করিয়া নিরস্ত রহিলেন না, তাঁহার সৎকার্য্যের প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক গণের মধ্যে একজন প্রধান ডাক্তার ডি-এন রায় কস্তুরীমঞ্জরী দাসীকে বেলগেছিয়া হাসপাতালের মত একটী হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল করিবার জন্য বলেন। ইহাতে তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, সত্য সত্যই ইহা একটী আবশ্যকীয় অনুষ্ঠান। এমন অনেক রোগ আছে যাহা কেবল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আরোগ্য হয়, অথচ এই সা-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য হাসপাতাল নাই।

এই সকল আলোচনা করিয়া কস্তুরীমঞ্জরী দাসী হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালের জন্য সারকুলার রোডের উপর প্রায় ১৫০০০৲ টাকা দিয়া একটী জায়গা কিনিয়া দেন। এখন ঐ জায়গায় হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট পাঠ করিলে সম্যক উপলব্ধি হয়।

"কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক হস্পিট্যাল সোসাইটী"র এই হাসপাতাল সম্ভবপর হইত না যদ্যপি পোস্তার রাণী কস্তুরীমঞ্জরীর জীবন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা রক্ষিত না হইত। তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ২৬৫নং আপার সারকুলার রোডে হাসপাতাল-বাটী নির্ম্মাণ এবং জায়গা খরিদ করিবার নিমিত্ত ২২০০০৲ বাইশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।"

রামমোহন লাইব্রেরী যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কস্তুরীমঞ্জরী দাসী এই লাইব্রেরীর যাবতীয় ইতিহাস-পুস্তক ক্রয় করিয়া দেন। তিনি এইরূপে সাধারণের উপকারার্থ অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। কস্তুরীমঞ্জরী দাসী ঠাকুরপূজা করিতে বড় ভাল-বাসিতেন। তিনি তাঁহাদের পৈত্রিক ঠাকুর ৺শ্যামসুন্দর জীউর তিন হস্ত পরিমাণ উচ্চ একটী স্বর্ণময় সিংহাসন করিয়া দিয়াছেন। পৈত্রিক রামলীলার বাগান তাঁহার অংশে না পড়ায় তিনি বেলুড়ের মাঠে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত গঙ্গার উপরে একটী বাগান ক্রয় করেন।

কস্তুরীমঞ্জরীর সদর বাটী নিজ অংশে না থাকায় ১৩১৯ সালে বিষ্ণুপ্রসাদের দ্বারা তিনি সদর-বাটীর নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করান; কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বাটী প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই ১৩২০ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

দেবীপ্রসাদ ও হরিপ্রসাদ

দেবীপ্রসাদ রায় রাজকুমার রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া ১২৯৪ সালে পিতার জীবদ্দশায় প্রায় ২৮ বৎসর বয়সে মারা যান।

তাঁহার পুত্র হরিপ্রসাদ রায় তাঁহাদের পোস্তার আদি বাটীতে বাস করিতেন।

হরিপ্রসাদ রায়ের পশুপক্ষী পুষিবার সখ ছিল তিনি তাঁহার পৈত্রিক রামলীলার বাগানে নানা দেশ-বিদেশ হইতে পশু-পক্ষী আনাইয়া রাখিতেন। হরিপ্রসাদ রায় এক কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করেন।

কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

বাঁশবেড়িয়া-রাজবংশ বঙ্গের সম্ভ্রান্ত ও প্রাচীনতম রাজবংশ-সমূহের মধ্যে অন্যতম। কুমার মুনীন্দ্রদেব রাজা পূর্ণেন্দুদেব রায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তিনি বাঁশবেড়িয়া রাজ-পরিবারের গড়বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন।

বাঁশবেড়িয়া-রাজবংশের বাসভূমি হুগলী জেলার এলাকায় অবস্থিত। এত বড় প্রাচীন বনিয়াদী রাজ-পরিবার বঙ্গদেশে দুই একটীর অধিক আছে কি না সন্দেহ। এই রাজ-পরিবারের এক হাজার বৎসরের শৃঙ্খলা ও ক্রমবদ্ধ এবং সুবিন্যস্ত ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস। হিন্দু-শাসন-সময়ে এই রাজপরিবারভুক্ত তিন জন প্রধান মন্ত্রী ও তিনজন প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; পাঠান-শাসনকালে এই রাজ-বংশীয় দুই ব্যক্তিকে প্রধান সেনা-নায়কের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মোগল আক্রমণের পূর্ব্বে বাঁশবেড়িয়া-রাজ-বংশের রাজা গণেশ ও তদীয় পুত্র রাজা যদু বাঙ্গালার স্বাধীন নরপতি ছিলেন এবং ইঁহাদের রাজ্যের পরিধি সুবিস্তীর্ণ ছিল। মোগল-শাসন-সময়ে বাঁশবেড়িয়া-রাজবংশ করদ রাজন্যবর্গের তালিকা-ভুক্ত হইয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু রাজ্যের আভ্যন্তরীণ-শাসন-ব্যবস্থায় তাঁহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান ও ঔরঙ্গজেব এই রাজবংশীয়গণকে উপাধি ও সম্মান-দানে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এই রাজ-পরিবারের দুই জন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। এমন কি নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর আমলেও বাঁশবেড়িয়া-রাজবংশ করদ-রাজ্যের মর্য্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহারা নবাব-

সরকারে বার্ষিক অর্দ্ধ কোটিরও উপর টাকা কর প্রদান করিতেন। এই রাজ-পরিবার চিরদিনই ন্যায় ও নীতিনিষ্ঠ এবং ধর্ম্মপ্রবণ; অধর্ম্ম ও দুর্নীতি-মূলক উপায় অবলম্বন করিয়া ইঁহারা উন্নতি ও অভ্যুদয়ের শিখরে আরোহণ করেন নাই। বঙ্গদেশের অল্পসংখ্যক রাজ-পরিবারই এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন। প্রতারণা, প্রবঞ্চনা বা লুণ্ঠন দ্বারা ইঁহারা একখণ্ড ভূমিও ইঁহাদের অধিকারভুক্ত করেন নাই। রাজা নৃসিংহদেব রায় মহাশয় যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন সেই সময়ে বাঙ্গালার দুইটী রাজ-পরিবার তাঁহার বহু ভূমি হস্তগত করিয়া আপনাদিগকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে রাজা পূর্ণেন্দুদেব রায় মহাশয় ব্রিটিশ গর্ণমেণ্টকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন।

বাঁশবেড়িয়াতে বহু প্রাচীন কীর্ত্তি-কলাপ আছে; ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও স্থাপত্যের হিসাবে সেগুলি মূল্যবান। এইগুলিই বাঁশবেড়িয়ার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এখানে দুইটী উৎকৃষ্ট প্রাচীন দুর্গ আছে; একটী দুর্গ রাজা রামেশ্বরের—সাধারণ লোকে ইহাকে বলে "গড়বাটী"; অপর দুর্গটি রাজা রঘুদেবের—ইহা সাধারণের নিকট "বাহিরগড়" বলিয়া পরিচিত। দর্শকেরা এই প্রাচীন দুর্গ দুইটার নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং অনেকে বলেন যে, আধুনিক যুগেও ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল বর্ত্তমান পূর্ত্তবিদ্যাবিৎগণের ঈর্ষ্যার বিষয়।

রাজা রামেশ্বর গৃহদেবতা শ্রীশ্রীবাসুদেবের মন্দির ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন; এই মন্দিরে পৌরাণিক মূর্ত্তিসমূহের অল্পমাত্র-উদ্গত যে ভাস্করকার্য্য আছে তাহার কলা-নৈপুণ্য সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীস্বয়ম্ভবা দেবীর মন্দির ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রাজা নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। রাজা নৃসিংহদেবের মহিষী রাণী শঙ্করী ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীহংসেশ্বরী দেবীর

মন্দির নির্ম্মাণ করেন ; বঙ্গদেশে এই মন্দিরের মত সুন্দর মন্দির অল্পই আছে ; ইহার পরিকল্পনা ও স্থাপত্য-কৌশল বিস্ময়কর।

বাঁশবেড়িয়া-রাজবংশ চিরদিনই বিদ্যোৎসাহী এবং প্রতিষ্ঠাকাল হইতে অদ্যাবধি এই রাজবংশ বিদ্যোন্নতির জন্য মুক্তহস্তে দান করিয়া আসিতেছেন। রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয় বাঁশবেড়িয়াতে বিরাট সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন ও উহার পরিরক্ষণ করিতেন। তাঁহার পুত্র রাজা রঘুদেব রায় মহাশয় টোল-চতুষ্পাঠী পরিচালন, পণ্ডিত ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য একলক্ষ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন।

"বস্তুতঃ কি রাজকার্য্যে, কি সমরকৌশলে, কি দানধর্ম্মে,—কি নীতি-নিপুণতায় বাঁশবেড়িয়ার মহাশয় বংশ বাঙ্গালার গৌরবস্থান। বিচক্ষণ আকবর, ক্রূরনীতি অওরঙ্গজেব, রাসকলাপটু-জাঁহাগীর ও সমৃদ্ধি-শোভমান শাহজহাঁ বাঁশবেড়িয়ার রাজ-বংশকে গরীয়ান করিতে সকলেই মুক্ত-হস্ত। মুরসিদকুলী ও মুয়াজম, ইসলাম ধর্ম্মে অবিশ্বাসী, বিশ্বাসী ও অতি-বিশ্বাসী,—হিন্দু-তান্ত্রিক বংশকে সকলেই কুসুমদাম উপহার দিয়াছেন। মহাশয় বংশের নীতি নিপুণতার ইহা চূড়ান্ত প্রমাণ। *

---

* ৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম-এ লিখিত ৺রাজা নৃসিংহদেব রায় মহাশয়ের-জীবনী।

কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুপ্রাচীন সম্ভ্রান্ত রাজবংশের যোগ্য বংশধর। সমুন্নত চরিত্র, জ্ঞানানুশীলন, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং লোকহিত, শিক্ষাবিস্তার ও বিদ্যাচর্চ্চার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন। উপাধিলাভের পূর্ব্বে

তিনি হুগলী কলেজ ও পরে কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বড়লাটের প্রাভাতিক দরবার বা মজলিসে (Levee) আমন্ত্রিত ও বড়লাটের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জন, সারজন উডবরণ, স্যার জেম্‌স বোডিলন, স্তর হারবার্ট রিজলি, লর্ড সিংহ প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ও লোকপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ তাঁহার বাঁশবেড়িয়া প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি হুগলীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট-রূপে একক বিচারাসনে বসিয়া দেশের বিচারকার্য্যে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। তিনি হুগলী জেলা-বোর্ডের সদস্য এবং হুগলী জেলা-জেল ও শ্রীরামপুর মহকুমা-জেলের বে-সরকারী পরিদর্শক। তিনি বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান। কুমার মুনীন্দ্রদেব প্রায় ৩০০ বিঘা পরিমিত এক প্রস্থ ভূমি মেসার্স ম্যাকনীল এণ্ড কোম্পানীকে ইজারা দিয়াছিলেন। এই ভূমিখণ্ডের ভিতরে কতকগুলি জমি যাতায়াতের পথরূপে ব্যবহৃত হইত; সেগুলি ইজারা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। যখন বাঁশবেড়িয়ায় জলের কল স্থাপিত হয় সেই সময়ে তিনি এই জমিগুলির দাবী মিউনিসিপ্যালিটীর অনুকূলে ত্যাগ করেন। জলের কল স্থাপন করিতে একলক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে ৪০ হাজার টাকা মিউনিসিপ্যালিটী এইসকল জমি বিক্রয় করিয়া পান। তাহাতেই জলের কল-স্থাপন সম্ভবপর হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে জলের কল স্থাপিত হইয়াছে এবং বাঁশবেড়িয়ার অধিবাসিবর্গ প্রচুর বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করিতে পাইতেছেন। মিউনিসিপ্যালিটী অধিবাসীদিগের বাড়ীতে বাড়ীতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহও করিতেছেন। বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটীর এলেকায় শীঘ্রই বৈদ্যুতিক আলোকও জ্বলিবে; ইতিমধ্যেই মাটীর নীচে বৈদ্যুতিক তার বসান হইয়াছে। ড্রেণ বা জল নিকাশের বন্দোবস্তও হইতেছে এবং ইহার কার্য্য দ্রুতগতিতে
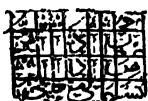
بسم الله الرحمن الرحیم

১৭ পৃষ্ঠোক্ত রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয়কে সম্রাট ঔরঙ্গজেব কর্তৃক প্রদত্ত বংশানুক্রমিক "রাজা মহাশয়" উপাধির সনদ।

বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির।

(হংস সরোবরে প্রতিবিম্বিত)।

পূর্ণতারদিকে অগ্রসর হইতেছে। বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটির এলেকায় একটি হাঁসপাতাল ও প্রসবাগার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার চেষ্টায় ৫৫ হাজার টাকা দান সংগৃহীত হইয়াছে। দাতার নামেই এই হাঁসপাতাল ও প্রসবাগারের নামকরণ হইয়াছে এবং রায় মহাশয় হইয়াছেন এই দুই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক।

কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের হস্তে স্ত্রীশিক্ষার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে এবং তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে ও নেতৃত্বে বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যাল-এলেকায় তিনটী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত হইতেছে। "চুঁচূড়া বালিকা বাণীমন্দির"-প্রমুখ কতিপয় বালিকাবিদ্যালয়ের বাটী তাঁহার প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছে।

বাঁশবেড়িয়ায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের যে পরিকল্পনা তিনি করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের তহবিলে অর্থের স্বাচ্ছল্য হইলেই এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

রায় মহাশয় সাধারণের বায়ু-সেবন ও ভ্রমণ এবং বিশ্রামের জন্য তিনটী উদ্যান (Park) রচনা করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালটীর এলেকার ভিতরে দুইটী পাঠাগার অধিবাসীদিগের জ্ঞান-স্পৃহা তৃপ্তি করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতেছে। বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারের সহিত তিনি শিশুদিগের জন্যও এক পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতার রাস্তা যেমন পাথরকুচির এবং পিচ ও আলকাতরা-সহযোগে তৈয়ারি বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তাও তেমনইভাবে তিনি তৈয়ারি করাইয়া দিয়াছেন। বাঁশবেড়িয়ার অধিবাসীরা সহরের সকল সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য যাহাতে পাইতে পারেন, সেজন্য তাঁহার চেষ্টার বিরাম নাই।

তিনি বংশবাটী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ডিরেক্টর-বোর্ডের

চেয়ারম্যান, তারকেশ্বর কো-অপারেটিভ সেল এণ্ড সাপ্লাই সোসাইটী লিমিটেডের ডিরেক্টর এবং বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েসন, হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরী এসোসিয়েসন, বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী, খামার-পাড়া নৈশ বিদ্যালয়, বাঁশবেড়িয়া বালিকা বিদ্যালয়, কালীঘাট পার-পেচুয়াল ক্লাব ও এন এম লাইব্রেরী, বাঁশবেড়িয়া ডিফেন্স পার্টি, কালী-ঘাট বাণীমন্দির, ও তারকেশ্বর ভরমল্ল স্মৃতি-সমিতির প্রেসিডেণ্ট এবং ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েসন, অল্-ইণ্ডিয়া পাবলিক লাইব্রেরী এসো-সিয়েসন, হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েসন, কালীঘাট পিপল্স এসোসিয়েসন ও চুঁচুড়া ফিজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। তিনি হুগলী ঐতিহাসিক গবেষণা সমিতির (Hooghly Historical Research Association) অবৈতনিক সম্পাদক। তিনি পাবলিক লাইব্রেরির এনকোয়ারী কমিশনের চেয়ারম্যান এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বিচার ও কারা-বিভাগ-সংক্রান্ত ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য ছিলেন। বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটীর এলেকায় গত ১৯৩১ সালে যে লোক-গণনা হইয়াছিল তিনি উহার সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। ইউনিভারসিটির লাইব্রেরীয়ানগণকে লাইব্রেরী পরিচালন-বিদ্যা শিক্ষা দিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কলিকাতা ইউনিভর্সিটির সিণ্ডিকেট যে কমিটি গঠিত করিয়াছিলেন তিনি সেই কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি নিখিল ভারত ন্যাশন্যাল লিবারেল ফেডারেশন, হুগলী ইনডাষ্ট্রীয়াল এসো-সিয়েসন এবং হুগলী জেলা-বোর্ডের তরু-গুল্মাদির চাষ সংক্রান্ত সমিতির (Arboricultural Committee) সদস্য। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, প্রেসিডেন্সি মেডিকাল এডুকেশন সোসাইটি এবং একাডেমি অফ লিটারেচার এণ্ড সায়েন্সের বিশিষ্ট সদস্য। তিনি হুগলী সেণ্ট্রাল এসোসিয়েসন, বঙ্গীয় কৃষক ও রায়ত সভা, বঙ্গীয় সাহিত্য ও সঙ্গীত সভা এবং অন্যান্য সাধারণ-হিতকর প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক।

তিনি "The Eastern Voice" নামক ইংরেজী দৈনিকপত্রের, "The United Bengal" সাপ্তাহিক পত্রের এবং কয়েক বৎসর 'পূর্ণিমা' নামক বাঙ্গালা মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। মাদ্রাজ প্রদেশের বেজওয়াদা নগরী হইতে প্রকাশিত "The Indian Library Journal" নামক পত্রিকার এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার মুখপত্র "কায়স্থ পত্রিকার" তিনি সম্পাদক। বঙ্গদেশে তিনিই পাঠাগার আন্দোলনের প্রবর্ত্তক এবং ভারতের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন।

কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় নিম্নলিখিত
পুস্তকগুলির রচয়িতাঃ—

(১) হুগলী-কাহিনী—হুগলীর ইতিহাস।
(২) Benares and Sarnath.
(৩) Current Problems.
(৪) Decadence of Rural Bengal.
(৫) সিংহলদ্বীপ (সিংহলের সচিত্র বিবরণ)।
(৬) দক্ষিণ ভারত (দক্ষিণ ভারতের সচিত্র বিবরণ)।
(৭) উত্তর ভারত।
(৮) Mathura and Brindaban.
(৯) Delhi—Past and Present.
(১০) Bansberia—Past and Present.
(১১) Saptagram—a glory that is no more.
(১২) Pandua—an ancient city in ruins.
(১৩) Tribeni—a seat of ancient culture.
(১৪) Bandel and its chequered history.
(১৫) Hooghly under the Moghuls.
(১৬) History made by Rivers.

এই পুস্তকগুলি ব্যতীত তিনি আরও কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ; সেগুলিতেও তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি হুগলী মিউনিসিপ্যাল (অ-মুসলমান) নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি বাণিজ্য, ও কারা-বিভাগ-সম্পর্কিত ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি-সমূহের নির্ব্বাচিত সদস্য। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় বহু বিষয়ে আন্দোলন করিয়া তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে এইগুলি—১৯৩১ সালের সংশোধিত বঙ্গীয় মিউ-প্যাল আইন, এই সংশোধনের ফলে যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছেন ; ১৯৩২ সালেরসংশোধিত বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্তশাসন আইন, এই সংশোধনের ফলে ইউনিয়ন বোর্ডের হস্তে ছোটখাটো জলনিকাশের কার্য্যে হাত দিবার, দাতব্য চিকিৎসালয়ে এবং সাধারণ পাঠাগারে অর্থসাহায্য করিবার ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে এবং ১৯৩২ সংশোধিত কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন, ইহাতে তিনি গবর্ণমেণ্ট পক্ষকে (৫৫-৩৮) ১৭ ভোট পরাজিত করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ব্যবস্থাপক সভার এই অধিবেশনে বে-সরকারী সদস্যের হস্তে গভর্ণমেণ্টের এই একমাত্র পরাজয়। এই আইনে কালীঘাটকে ২২নং ওয়ার্ড হইতে স্বতন্ত্র করিয়া আর একটী নূতন ওয়ার্ডের সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব গৃহীতও হইয়াছিল। ১৯৩৩ সালের মার্চ্চ মাসে কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্ব্বাচনের সময়ে সংশোধিত কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের এই গৃহীত প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করা হয় এবং এই স্বতন্ত্রীকৃত নূতনওয়ার্ডটীর ২২এনং ওয়ার্ড বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই নির্ব্বাচনের সময়েই এই নূতন ওয়ার্ড হইতে একজন কাউন্সিলার

নির্ব্বাচিত হন। ইহা যে রায় মহাশয়ের একটী বিশিষ্ট কীর্ত্তি, তাহা বলাই বাহুল্য। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার সরকারী চাকরীতে বাঙ্গালী ব্যতীত অপর কোনও জাতিকে নিযুক্ত করিতে পারা যাইবে না। গত ১৯৩৩ সালের ১০ই আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে তাঁহার এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল।

তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯৩১ সালের সংশোধিত বঙ্গীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইনের সংস্কারার্থ এই মর্ম্মে এক সংশোধন-প্রস্তাব পেশ করেন যে, জেলা-বোর্ড-সমূহকে তাহাদের এলাকা-ভুক্ত পাবলিক লাইব্রেরী ও রিডিং রুমগুলিতে অর্থসাহায্য দিবার ক্ষমতা দেওয়া হউক। তিনি ১৯৩১ সালের সংশোধিত বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের সংস্কারার্থ এই মর্ম্মে এক সংশোধন-প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, বাঙ্গালীর মিউনিসিপ্যালিটী-সমূহে নারীজাতিকে ভোটের অধিকার দেওয়া হউক। উক্ত আইনের সংস্কারার্থ তাঁহার আর একটি প্রস্তাবের মর্ম্ম এই—আয় বাড়াইবার প্রয়োজন হইলে মিউনিসিপ্যালিটী ব্যবসায়ী, উকীল, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কর আদায় করিতে পারিবেন। উক্ত আইনের সংস্কারার্থ তাঁহার আর একটি প্রস্তাব এই মর্ম্মের—মোটর-যানগুলির উপর ট্যাক্স বসাইতে পারা যাইবে এবং তদ্দ্বারা সংগৃহীত অর্থ রাস্তা, সেতু ও যাতায়াতের সুবিধা-বৃদ্ধি-সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে। তাঁহার এই প্রস্তাবগুলি গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন এবং নিম্নলিখিত আইনগুলিতে বিধিবদ্ধ হয়—১৯৩২ সালের সংশোধিত বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন এবং ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় মোটর-যান-সংক্রান্ত ট্যাক্স আইন।

কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী এবং উচ্চশ্রেণীর

রাজনীতিক। তাঁহাকে নব্য বঙ্গের অন্যতম রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাশীল মনীষী বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। নিরক্ষরতা দূর করিবার সম্পর্কে তিনি শ্রীরামপুর টাউন হলে যে উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং কোন্নগর ও বৈদ্যবাটীতেও পর পর যে বক্তৃতা তাঁহাকে পুনরায় করিতে হইয়াছিল সেই বক্তৃতার অব্যবহিত পরেই তদঞ্চল-সমূহে কতকগুলি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বক্তৃতাটি মুদ্রিত এবং পরে বাঙ্গালার দুইটী প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যে সকল উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছেন এবং বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য তিনি যেভাবে সুপরি-চালিত করিয়া আসিতেছেন তাহাতে তাঁহার সুনাম ও সুখ্যাতি দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। তিনি বাঁশবেড়িয়াকে একটী আদর্শ নগ-রীতে এবং সর্ব্বপ্রকার কৃষ্টি ও উন্নতিমূলক অনুশীলনীর কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছেন। তিনি সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছেন। স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার জন্য তিনি কয়েকটী ব্রিটিশ উপনিবেশও পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। বাঙ্গালার জলনিকাশের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি এই বিষয়টী শিক্ষার্থীর মত গভীর মনোনিবেশের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা দেশের সুগম অঞ্চলের হাজা-মজা নদ-নদী-স্রোতস্বিনী, খাল-বিল ইত্যাদি পরিদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, দুর্গম অঞ্চলের নদী, খাল, বিল ইত্যাদি দেখিবার জন্যও যথেষ্ট অর্থ ও সময় ব্যয় এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। হাজা-মজা নদীগুলি পুনরায় বহতা করিবার জন্য তিনি যে অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন তাহা হইতেই বুঝা যায়—দেশের কল্যাণসাধনের জন্য তাঁহার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা কিরূপ আন্তরিক। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বহু অধিবেশনে বাঙ্গালার

নদ নদী-খাল-বিল ও জল-নিকাশ সম্পর্কে তিনি যে সকল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন এবং প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া এই সম্বন্ধে তিনি বাঙ্গালা দেশের পত্র-পত্রিকাগুলিতে যে সকল অনুসন্ধিৎসা-পূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়—এই স্বদেশগতপ্রাণ কর্ম্মবীরের স্বদেশপ্রীতি কত গভীর ও অকপট।

রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ললিতকলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে; সংবাদ-পত্র-ক্ষেত্রে ও ব্যবস্থাপক সভায়; রোগার্ত্ত মানবের সেবা-মূলক-সামাজিক কার্য্যে; বিচার ও পুরসেবা-কার্য্যে; জ্ঞানপ্রচারে; ব্যায়াম-চর্চ্চায় ও বিদ্যানুশীলনে উৎসাহ-প্রদানে; তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি ও জমিদারী পরিচালনায় এবং ব্যাঙ্কের কার্য্যে, মুদ্রা বাটা-সংক্রান্ত জটিল সমস্যার সমাধানে তাঁহার সমসাময়িক কর্ম্মীগণের মধ্যে তাঁহার তুল্য কৃতী ও যোগ্য অল্প লোকই আছেন। স্বদেশের কল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁহার কর্ম্মকুশলতা ও যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহাকে যে শ্রদ্ধা ও সম্মানের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন খুব অল্প কর্ম্মীরই সেই সৌভাগ্য-লাভ হইয়া থাকে।

কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের পুত্রগণের মধ্যে কুমার বিনয়েন্দ্র দেব রায় মহাশয়, এম্-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রাজনীতি ও অর্থনীতিশাস্ত্রে এম্-এ উপাধি এবং আইন পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া এখন পৈত্রিক জমিদারী পরিচালনা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার আর এক পুত্র বিজয়েন্দ্র দেব বিদেশের সহিত মাল আমদানী-রপ্তানি কার্য্যে বিশেষজ্ঞ। তিনি এখন ঐ কার্য্যে লিপ্ত আছেন।

এই সুপ্রাচীন রাজ-বংশ যাহা যুগ-যুগ-ব্যাপী বিপুল পরিবর্ত্তনের মধ্যে সগৌরবে আপনার অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে, যাহা বহু

রাজ্য ও রাজ-পরিবারের উত্থান-পতন লক্ষ্য করিয়াছে, কালের ধ্বংসকর শক্তি যাহাকে ধ্বংস করিতে পারে নাই, যাহার গৌরব আজও অক্ষুণ্ণ, এবং যাহার যশোরাশি আজও অপরিম্লান রহিয়াছে শ্রীভগবানের কৃপায় তাহা চিরদিন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির অধিকারী হউক।

স্বর্গীয় বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও
স্বর্গীয় রায় অখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

(বাকুলিয়া হাউস, খিদিরপুর)

বাকুলিয়া নামক ক্ষুদ্র গ্রামটী হুগলী জেলার অন্তর্গত হইলেও ইহা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত কালনা নামক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত। এই বাকুলিয়া গ্রামের মুখোপাধ্যায়-বংশে সন ১২৩২ সালের ৩রা ফাল্গুন তারিখে বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায়।

কৃষ্ণকিশোরের দুই পুত্র। বিশ্বেশ্বর কনিষ্ঠ এবং কাশীপ্রসাদ জ্যেষ্ঠ।

কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন এবং জমি-জমাদির উপস্বত্ব হইতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বাকুলিয়া গ্রামে বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা না থাকায় বিশ্বেশ্বর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তাঁহাদের মাতুলালয় গুপ্তিপাড়া গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং তাঁহারা তথায় থাকিয়া তথাকার বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতে থাকেন। অতঃপর পিতা কৃষ্ণকিশোর পুত্রদ্বয়কে হুগলীতে আনয়ন করেন এবং স্বয়ং তথায় থাকিয়া দুই পুত্রকেই হুগলী কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কাশীপ্রসাদ ও বিশ্বেশ্বরের পাঠ্যাবস্থা হুগলীতেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ কাশীপ্রসাদ স্থির করিলেন যে, তিনি চাকরী করিবেন না, শাস্ত্রালোচনা ও গৃহধর্ম্ম করিবেন। কনিষ্ঠ বিশ্বেশ্বর হুগলীর

কলেক্টরীতে মাসিক ২৩৲ টাকা বেতনে কেরাণীর পদ গ্রহণ করেন এবং হুগলীর বাসা-বাটীতেই অবস্থান করিতে থাকেন।

এই সময়ে হুগলী জেলার অন্তর্গত ইলছোবা মণ্ডলাই গ্রামের বিখ্যাত জমিদার শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত বিশ্বেশ্বরের বিবাহ হয়।

শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল। তিনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আপন ভাগিনেয় গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং জামাতা বিশ্বেশ্বরের সহিত একযোগে গঙ্গাধর ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী নামক একটী ফার্ম (firm) স্থাপন করেন। এই ফার্ম এখনও বর্ত্তমান আছে। ইঁহারা গবর্ণমেণ্টের সমর-বিভাগের বিশিষ্ট কনট্রাক্টর ছিলেন। ইঁহারা এরূপ দক্ষতা ও শৃঙ্খলার সহিত মাল সরবরাহ করিতেন যে, সমর-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহাদের কার্য্যে সন্তোষ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। সে সময়ে গভর্ণমেণ্টের সমর-বিভাগ হইতে যে সমস্ত কণ্ট্রাক্ট বিলি হইত ঐগুলির মেয়াদ সর্ব্বনিম্ন তিন বৎসর ও সর্ব্বোচ্চ পাঁচ বৎসর কাল পর্য্যন্ত থাকিত। এই নিয়মে কনট্রাক্টর-গণের সুবিধাও যেমন ছিল, দায়িত্বও তেমনই ছিল। বহু টাকা জামীন-স্বরূপ না রাখিলে কাহাকেও কনট্রাক্টর-তালিকাভুক্ত করা হইত না। এই নিয়ম প্রচলিত ছিল বলিয়া বিশিষ্ট অর্থশালী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোকের পক্ষে সমর-বিভাগের কনট্রাক্ট পাওয়া অসম্ভব ছিল। এই নিয়ম প্রচলিত ছিল বলিয়া কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ভাগীরথীর পশ্চিমকূলস্থিত কয়েকটী বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের অর্ডন্যান্স-বিভাগের কনট্রাক্ট বা ঠিকাদারী সীমাবদ্ধ ছিল।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মেসার্স গঙ্গাধর বানার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী কলিকাতা-স্থিত ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের আর্সেন্যাল বিভাগে মালপত্র সরবরাহের কনট্রাক্ট প্রাপ্ত হন। এই

সময়ে জিনিসপত্রের দর অত্যধিক বাড়িয়া উঠে। বিশেষতঃ এই সময়ে ব্রহ্ম-দেশের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় জিনিস-পত্রের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ৪০।৫০ হাজার টাকা ক্ষতি স্বীকার করিয়াও মেসার্স গঙ্গাধর ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী যথা-সময়ে মালপত্র সরবরাহ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। সমর-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহাদের কার্য্যে অতীব সন্তোষ প্রকাশ করেন। ইহার ফলে গবর্ণমেণ্টের নিকট ইঁহাদের প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

সমর-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই কোম্পানীর উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া উঠেন। এই সম্বন্ধে কে (Kay) সাহেবের "History of the Sepoy War" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে এই ফার্মের নামোল্লেখ আছে। ইহার ফলে সমর-বিভাগের কনট্রাক্ট তাঁহারা একরূপ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা যে বিশ্বেশ্বরবাবুর বিপুল কৃতিত্বের পরিচায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি একদিকে যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ব্যবসায়ী ছিলেন অন্যদিকে জমিদার-হিসাবে তেমনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও জেদি ছিলেন। প্রজাপালনের জন্য তিনি কিছুমাত্র কৃপণতা করিতেন না; ইহার সম্যক প্রমাণ পাওয়া যায় বিখ্যাত Rent case (খাজনা আদায়ের মকর্দ্দমা) হইতে। ইহার বিচার কলিকাতা হাইকোর্টের full bench অর্থাৎ সমগ্র বিচারপতিগণের বৈঠকে সম্পাদিত হয়। বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় বনাম ঠাকুরমণি দাসীর মকর্দ্দমা এখনও পর্য্যন্ত আইন-ব্যবসায়ীগণ নজির-হিসাবে প্রয়োগ করেন।

অতঃপর কনট্রাক্টের কারবার হইতে প্রভূত লাভ হইতে থাকিলে বিশ্বেশ্বরবাবু জন্মভূমি বাকুলিয়া গ্রামে সম্পন্ন গৃহস্থের উপযোগী আবাস-বাটী ও চারিদিকে গড়বন্দী বাগান-বাটী প্রস্তুত করাইলেন।

এই সময়ে বাকুলিয়া গ্রামের সন্নিকটে হুগলির কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত আলিসেগড় নামক একটী মহল এবং ডায়মণ্ড হারবার,

হুগলি, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে কয়েকটী জমিদারী বিশ্বেশ্বরবাবু ক্রয় করেন।

ইহার কিছুদিন পরে বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় খিদিরপুরে এক প্রাসাদোপম বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া এইখানেই বসবাস করিতে লাগিলেন। ইহাই এক্ষণে "বাকুলিয়া হাউস" নামে পরিচিত।

ইহার পর বিশ্বেশ্বরবাবু বাকুলিয়া গ্রামের নবনির্ম্মিত বসত-বাটী ও গড়বন্দী বাগান এবং সদ্য-ক্রীত আলিসেগড় নামক তালুক, স্বোপার্জ্জিত অর্থে নির্ম্মিত ও ক্রীত হইলেও, তদীয় অগ্রজ কাশীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে রীতিমত দানপত্র লিখিয়া সম্প্রদান করেন।

খিদিরপুর হইতে বিশ্বেশ্বরবাবু যখন বাকুলিয়ায় যাইতেন সেই সময়ে তাঁহার পরিবারবর্গ ও অন্যান্য লোকজন এবং দ্রব্যসামগ্রী এত অধিক হইত যে, তাঁহাকে অন্ততঃ পক্ষে ৫।৬খানি নৌকার সাহায্যে এবং জলদস্যু হইতে আত্মরক্ষাহেতু সশস্ত্র প্রহরী লইয়া ভাগীরথীবক্ষে যাতায়াত করিতে হইত।

অখিলচন্দ্র ব্যতীত তাঁহার আরও দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

কনিষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার অল্পদিন পূর্ব্বে ৺শারদীয়া মহাপূজা-উপলক্ষে বিশ্বেশ্বরবাবু সপরিবারে খিদিরপুর হইতে পূর্ব্বোল্লিখিতভাবে নৌকাযোগে বাকুলিয়া যাত্রা করেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী আসন্নপ্রসবা থাকায় বহুকষ্টে একখানি ডুলি জোগাড় করিয়া তাঁহাকে বাকুলিয়ায় প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তবে অপরাপর মহিলাগণ বাধ্য হইয়া হাঁটিয়াই বাকুলিয়া পৌছেন।

এই ঘটনায় ব্যথানুভব করিয়া বিশ্বেশ্বরবাবু ভবিষ্যতে নিজ খিদিরপুরের বাটীতেই ৺শারদীয়া পূজা করিবার মানস করেন ও নিজ বাটী-সংলগ্ন একটী পূজা বাড়ী নির্ম্মাণ করাইলেন। তদবধি—সন ১২৬৭ সাল হইতে

১২৭৫ সাল পর্য্যন্ত খিদিরপুরের বাটীতে প্রতি বৎসরই ৺শারদীয়া মহা-পূজা এবং শ্রীশ্রীবাসন্তী ও অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার মাতার মৃত্যুকালীন নিষেধ-অনুসারে তিনি শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ও বাসন্তী পূজা বন্ধ করেন। সেইজন্য ১২৭৬ সাল হইতে পূজা-বাড়ীতে কেবল ৺শারদীয়া মহাপূজাই হইয়া আসিতেছে।

১২৬৭ সালের চৈত্র মাসে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজার অল্পদিন পরে বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নীবিয়োগ ঘটে। অতঃপর তিনি মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ও আত্মীয়-স্বজনগণের সবিশেষ অনুরোধে দ্বিতীয়-বার দারপরিগ্রহ করেন।

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের পূর্ব্বে তিনি তদীয় স্বোপার্জ্জিত সমুদয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি একটী ফ্যামিলি ট্রাষ্টে পরিণত করেন এবং তদীয় অগ্রজ ও চারিজন বন্ধুকে এই ট্রাষ্ট সম্পত্তির ট্রাষ্টি বা অছি নিযুক্ত করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার দুই ভগিনী ও তাঁহাদের সন্তানগণের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও তিনি করেন।

সন ১২৭৮ সালে ৺শারদীয়া মহাপূজার পরে বিশ্বেশ্বরবাবুর খিদির-পুরের বাটীতে শ্রীশ্রীমহাভারত-পাঠের উদ্যোগ-আয়োজনকালে তাঁহার ৩০ নম্বর ক্লাইভ ষ্ট্রীট-স্থিত বাটী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। এই বাটী হইতে মাসিক ১১০০৲ টাকা ভাড়া আদায় হইত। অগ্নিকাণ্ডে লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি হয়। এই সংবাদে বিশ্বেশ্বরবাবুর বাটীর সকলেই বিচলিত হইয়া এই অনুষ্ঠান বন্ধ করিতে বলিলে তিনি বলেন,—'ঋষিগণ যে বলিয়া গিয়াছেন "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"—শুভকার্য্যে বহু ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে ইহা সত্য। আজ আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সত্য পরীক্ষিত হইবে। আমি কদাচ এই শুভ সঙ্কল্প প্রত্যাহার করিব না; তোমরা সকলে আয়োজনে প্রবৃত্ত হও।'

মাসাধিককাল শ্রীশ্রীমহাভারত-পাঠ চলিতে থাকার পর বিশ্বেশ্বরবাবুর

দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র শ্রীমান্ নবগোপাল মুখোপাধ্যায় বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হয়। তখন উহার বয়স কিঞ্চিদধিক এক বৎসর। চিকিৎসার জন্য প্রসিদ্ধ ইংরেজ ডাক্তার চার্লস সাহেবকে ডাকা হয়। পূজা-বাটীতেই শ্রীশ্রীমহাভারতের পাঠ ও ব্যাখ্যার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং রুগ্ন শিশুও এই বাটীতেই ছিল।

বিশ্বেশ্বরবাবু পূজা-বাটীতে অহিন্দু ইংরাজ ডাক্তারকে জুতা পরিয়া প্রবেশ করিতে না দিয়া শিশুকে সদর-বাটীর দ্বিতলে স্থানান্তরিত করিয়া তথায় চিকিৎসা করান। ইহা হইতেই তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অচলা নিষ্ঠার কথা জানা যায়।

শ্রীশ্রীমহাভারত-পাঠ ও তদ্ব্যাখ্যা শেষ হইলে নগর-কীর্ত্তন ও কাঙ্গালী-বিদায় হয়। অতঃপর ফাল্গুন মাসের প্রথমেই অন্নমেরুর অনুষ্ঠানে তিনি প্রবৃত্ত হন। এই মহাভারত ও অন্নমেরুর অনুষ্ঠানে তাঁহার লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়।

অন্নমেরুর দ্রব্য-তালিকা

আতপ চাউল—১০০১ মণ
সোনামুগ—— ৫০১ মণ
কৃষ্ণ কলাই————ঐ
ছোলা—————— ঐ
যব—————— ঐ

এইসমস্ত দ্রব্য সদর-বাটীর প্রাঙ্গণে নিম্নলিখিতভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। এই বিরাট পর্ব্বতসমান প্রত্যেক দ্রব্য রৌপ্যনির্ম্মিত বেষ্টনী দ্বারা ঘেরিয়া দেওয়া হয়।

পাঠ-সমাপন হইয়া যাইলে প্রত্যহ বিশ্বেশ্বরবাবু শুভ্রবস্ত্রোপরি সঞ্চিত ব্রাহ্মণ-পদরজ ভক্তিসহকারে সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতেন ও পরে ঐ পদরজ একটি রৌপ্যাধারে রক্ষিত হইত।

অবসর-গ্রহণ ও কাশী-যাত্রা

১২৭৮ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ তিনি সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীধামে চতুঃষষ্টি যোগিনীঘাটে স্বনির্ম্মিত বাটীতে অবস্থান করেন।

বিশ্বেশ্বরবাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তদীয় জমীদারী-এষ্টেটের নায়েব বাবু গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার জমিদারী এবং স্থাবর ও অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির ট্রাষ্টি মনোনীত করেন।

এই সময়ে তাঁহার মধ্যম ও কনিষ্ঠ উভয় পুত্র নাবালক ছিল। অখিলচন্দ্রই পিতার ন্যায় স্নেহ-যত্নে তাহাদিগকে লালন-পালন করিতে থাকেন।

সন ১২৭৫ সালের শ্রাবণ মাসে বিশ্বেশ্বরবাবুর বৃদ্ধা জননী গ্রহণী-রোগে আক্রান্ত হইয়া পুণ্যসলিলা ভাগীরথীতীরে সজ্ঞানে ৺গঙ্গা লাভ করেন। মহাসমারোহে ও বিপুল অর্থব্যয়ে বিশ্বেশ্বরবাবু তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

তাঁহার মধ্যম পুত্র ও কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহকালে সকলের অনুরোধে তিনি কিছুকালের জন্য খিদিরপুরে আসেন কিন্তু তাঁহার বহুমূত্ররোগ বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রসিদ্ধ ইংরাজ ডাক্তার চার্লস সাহেব ও কবিরাজ রমানাথ সেনের উপদেশানুযায়ী কিছুকাল নদীবক্ষে বজরায় অবস্থান করেন। পরে ১৮৮১ সালে তিনি কাশীধামে গমন করেন ও তথায় মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে ইহলীলা ত্যাগ করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি মৃত্যুর কথা পূর্ব্বে হইতে জানিতে পারিয়া মৃত্যুকালীন সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন; এমন কি, শববহনের খাট অবধি তৈয়ারি করাইয়া গিয়াছিলেন।

রায় স্বর্গীয় অখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

হুগলী জেলার অন্তর্গত কাল্‌নার সন্নিকটস্থ মোগুলাই গ্রামে অখিলচন্দ্র তাঁহার মাতুলালয়ে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ২৮শে এপ্রেল জন্মগ্রহণ করেন ও তথায় তাঁহার মাতামহ বিখ্যাত ধনী স্বর্গীয় শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক তাঁহার জন্মোৎসব খুব ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হয়। অখিলচন্দ্রের শিশুজীবন মাতুলালয়ে অতিবাহিত হয়। তৎপরে পিতৃ-সন্নিধানে বাকুলিয়ার গ্রাম্য পাঠশালায় তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। কয়েক বৎসর অতি-বাহিত হইলে খিদিরপুরের বাটীতে আসিয়া হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং এখান হইতে প্রবেশিকা (Entrance) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ অবধি অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতাঠাকুরের শরীর অসুস্থ হওয়ায় কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহাকে এই অল্পবয়সেই বাণীমন্দির হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং প্রভূত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্র ১৮।১৯ বৎসর বয়সে তাঁহাকে এক বৃহৎ দায়িত্বপূর্ণ ব্যবসায়, বিস্তৃত জমিদারী, বহুজনপূর্ণ সংসার এবং নানাবিধ বৈষয়িক ব্যাপারে জড়িত হইতে হয় এবং কোমল বয়স সত্ত্বেও কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সাফল্যের সহিত কর্ম্মজীবনে অগ্রসর হয়েন। এই সময়ে স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মীর সহিত তাঁহার প্রথম দারপরিগ্রহ হয়, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই মাত্র একটী পুত্রসন্তান লাভ করিয়া তিনি বিপত্নীক হয়েন। এই সন্তানই অখিলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়। কিছুকাল পরে শিবপুরের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী এবং জমিদার ৺লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর সহিত তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। "অন্নপূর্ণা"র আগমনে এই সংসারের শ্রী, সম্পদ, শান্তি, গরিমা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই অলোকসামান্যা, ধর্ম্মনিরতা, পরদুঃখ-

কাতরা, সর্ব্বগুণশালিনী দেবীস্বরূপিণী মহিলা সমগ্র গ্রামবাসীর মধ্যে এখনও মাতৃ-স্থানীয়া হইয়া জীবন যাপন করিতেছেন। "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ" এই প্রবাদবাক্য তাঁহাদের মিলনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। অখিলচন্দ্র উদার, সরল, অমায়িক, পরদুঃখকাতর, মুক্তহস্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন এবং সার্ব্বজনীন প্রীতির আকর্ষণে শত্রুমিত্র সকলকেই মুগ্ধ করিতে পারিতেন।

সন ১২৮১ সালে ৺কাশীধামে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অখিলচন্দ্রের দায়িত্ব অধিকপরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। বিশ্বেশ্বর একটী বৃহৎ Family trust সম্পাদন করিয়া অখিলচন্দ্রকে তাঁহার বিপুল সম্পত্তির Trustee নিযুক্ত করিয়া যান। ইহা ব্যতীত তিনি গঙ্গাধর ব্যানার্জ্জী নামীয় firmএর একমাত্র স্বত্বাধিকারী হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইহার সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখেন।

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের ফলে অখিলচন্দ্রের সর্ব্বসমেত ৮ পুত্র এবং ৭ কন্যা জন্মগ্রহণ করে; ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র ব্রজগোপাল এবং ৫টী কন্যা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র ননীগোপাল সন ১২৮২ সালের ২রা ভাদ্র তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইঁহার সহিত পটলডাঙ্গার পটুয়াটোলার বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশীয় এটর্নি স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হয়। স্বর্গীয় পিতৃদেবের উইল (Will) অনুযায়ী ইনি তাঁহার ত্যক্ত এষ্টেটের executor নিযুক্ত হন। তৃতীয় পুত্র ক্ষীরোদগোপালের সহিত তেলিনীপাড়ার (অধুনা Wellington Street-নিবাসী) শ্রীযুক্ত বাবু বিনয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যার বিবাহ হয়। এই বিবাহই অখিলচন্দ্রের জীবনের শেষ সামাজিক কাজ। ক্ষীরোদগোপাল একসঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজি সাহিত্যে এম্-এ ও রিপন কলেজে আইন অধ্যয়ন করেন; পরে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন এবং পরে

এড্‌ভোকেট-শ্রেণীভুক্ত হয়েন। কিন্তু ক্রমশঃ নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ায় তিনি কর্ম্মজীবন হইতে একরূপ অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। অখিলচন্দ্রের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সুশীলার সহিত জনাই-নিবাসী বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় এবং দ্বিতীয়া কন্যা চারুশীলার সহিত বঙ্গের স্বনামধন্য কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্রের বিবাহ হয়। অন্যান্য পুত্রগণ যথা—বিনোদগোপাল, রামগোপাল, ধনগোপাল, জয়গোপাল ও প্রাণ-গোপালের বিবাহ অখিলচন্দ্রের মৃত্যুর পর সম্পাদিত হয়। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র প্রাণগোপাল যখন মাত্র ত্রয়োদশ দিবসের শিশু তখন অখিলচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন।

অখিলচন্দ্রের কর্ম্মবহুল জীবনের অধিকাংশ সময় দেশহিতকর ও জনসাধারণের কার্য্যে ব্যয়িত হইত। তিনি সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক Municipal Commissioner মনোনীত হন এবং পরে জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন ও ক্রমান্বয়ে ২১ বৎসর কাল এই কার্য্য সাফল্যের সহিত পরিচালনা করেন। পরে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট Sir William Mackenzie কর্ত্তৃক রচিত নূতন Municipal Billএর মর্ম্মানুযায়ী Commissionerগণের প্রতিপত্তি খর্ব্ব হইবার আশঙ্কায় স্বেচ্ছায় এই পদ ত্যাগ করেন। তাঁহার বন্ধুগণ যথা—৺স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, ৺স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু-প্রমুখ Commissionerগণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি ইহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি Hony. Magistrateএর পদ-গৌরব সম্মানের সহিত বহুদিন রক্ষা করেন। Masonia Lodge-এর তিনি একজন খুব উচ্চপদস্থ সভ্য ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মত এইরূপ সম্মান-বিভূষিত বাঙ্গালী Lodgeএর মধ্যে খুব বিরল ছিলেন।

স্বদেশী যুগের বহুপূর্ব্বে অখিলচন্দ্র প্রভৃত অর্থব্যয়ে খিদিরপুরে ওরিয়েণ্টাল হোসিয়ারী কোম্পানী নামক এক কারখানা স্থাপন করেন এবং ইহার ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ইহা হইতেই বুঝা যায় স্বদেশের উন্নতিকল্পে তাঁহার অর্থ এবং অধ্যবসায় উন্মুক্ত ছিল। সন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন।

বহুদায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও বন্ধুবান্ধব ও পরিবার-বর্গকে লইয়া দেশভ্রমণ করা অখিলচন্দ্রের একটী প্রধান সখ ছিল। কৃষিকার্য্য, মাছধরা, উষ্ঠানরচনা ও প্রায়ই লোকজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান তাঁহার জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার নব-রচিত "Alipore Villa" নামক বাগান-বাটীতে বাস করিবার উদ্দেশ্যে গমন করেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সেইখানেই অবস্থান করেন। এইরূপ বিস্তৃত, নানা দুষ্প্রাপ্য-ফল ফুল-শোভিত নয়নরঞ্জন সুন্দর উষ্ঠান সেই সময় এই অঞ্চলে অল্পই ছিল। ইহাই এখন বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের "বিজয় মঞ্জিলে'র অংশরূপে শোভা পাইতেছে।

সমর-বিভাগের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ-সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার সরল সহাস্য মুখের সম্মুখে যে কেহ আসিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে।

তাঁহার পুত্র ব্রজগোপালের মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে অকাল মৃত্যু ঘটে, ইহাতে তিনি অতিমাত্র শোকসন্তপ্ত হন এবং ইহার কিছুকাল পরেই তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা চারুশীলা মাত্র ১২ বৎসর বয়সে বিধবা হওয়ায় তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। উপর্য্যুপরি শোকের আঘাতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি সিমলা পাহাড়ে স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে গমন করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনও উপকার হয় নাই। শরতের এক হিমনিষিক্ত রজনীর অন্ধকারে

মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে (১লা অক্টোবর ১৮৯৯, রাত্রি ১২টা) তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়। চারুচন্দ্র-প্রমুখ ভাগিনেয়গণ তাঁহাকে পুত্রাধিক সেবাযত্ন করেন; মৃত্যুর সময় তাঁহার দুই পুত্র নৃত্যগোপাল ও ননীগোপাল এবং অন্যান্য আরও কতিপয় আত্মীয়-স্বজনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সিমলা পাহাড়ের সমর-বিভাগ একদিনের জন্য ছুটী হইয়া যায় এবং বহু বাঙ্গালী তাঁহার সৎকার-কার্য্যে যোগদান করেন।

অখিলচন্দ্র দানে মুক্তহস্ত ছিলেন, কিন্তু ইহা সাধারণে প্রকাশ পাইত না। প্রার্থী কখনও তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হইত না। তাঁহার সদনুষ্ঠানের ফলে বহু দীনদরিদ্র জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহার খ্যাতি, প্রশংসা এবং ব্যবসায়ের সুপরিচালনা সম্বন্ধে 'Encyclopœdia of India' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (Vol. II) এবং Kay-প্রণীত "History of the Sepoy War' নামক পুস্তকে উল্লেখ আছে।

বংশ-লতা

শ্রীহীর বা মুকুটালঙ্কার হীর (কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ)

১। শ্রীহর্ষ

(আদিশূর কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ জন্য কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম; সম্বৎ ৯৯৯, খৃষ্টাব্দ ৮৪২)।

২। শ্রীগর্ভ

৩। শ্রীনিবাস

৪। মেধাতিথি

৫। আরব

আরব
|
৬। ত্রিবিক্রম
|
৭। কাক
|
৮। ধাঁদু (বা সাধু)
|
৯। গুহ (গুই—প্রাণেশ্বর)
|
১০। মাধব (মাধবাচার্য্য)
|
১১। কোলাহল (কোলাই সন্ন্যাসী)
|
১২। উৎসাহ (ইনি বল্লালী মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন—প্রথম কুলীন)
|
১৩। আহুত
(কুলীনপুত্র-প্রকৃতি সমীকরণকারী ব্যক্তি)
|
১৪। উদ্ধব (বা উদ্ধর)
|
১৫। জির (বা জিয়)
|
১৬। নৃসিংহ
|
১৭। গর্ব্বেশ্বর
|
১৮। মুরারি (মুরারি ওঝা)
(ইনি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পিতামহ)
|
১৯। অনিরুদ্ধ—কামালী
| |
| কৃত্তিবাস—(রামায়ণ-রচয়িতা)
২০। লক্ষ্মীধর হালদার
(ইঁহার সময়ে সর্ব্বদ্বারী বিবাহ লোপ পায়)
|
২১। মনোহর পণ্ডিত (মেলবন্ধনের কুলীন)
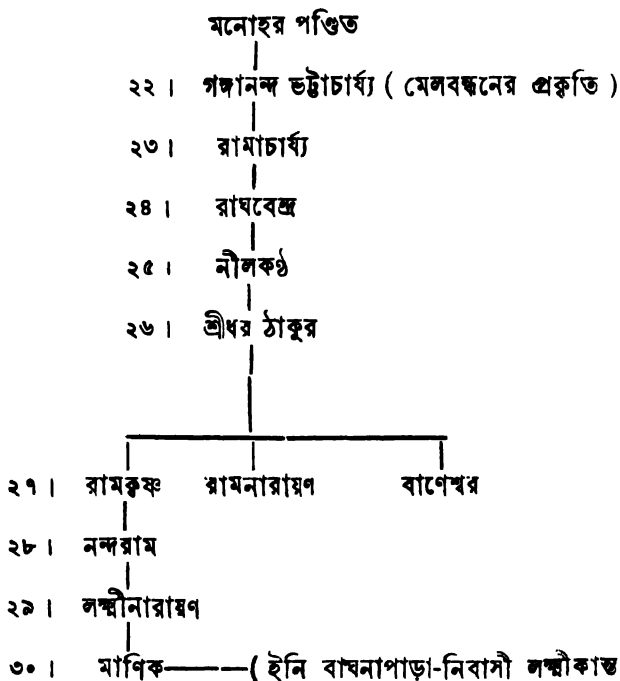
মনোহর পণ্ডিত
|
২২। গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য (মেলবন্ধনের প্রকৃতি)
|
২৩। রামাচার্য্য
|
২৪। রাঘবেন্দ্র
|
২৫। নীলকণ্ঠ
|
২৬। শ্রীধর ঠাকুর
|
২৭। রামকৃষ্ণ — রামনারায়ণ — বাণেশ্বর
|
২৮। নন্দরাম
|
২৯। লক্ষ্মীনারায়ণ
|
৩০। মাণিক———(ইনি বাঘনাপাড়া-নিবাসী লক্ষ্মীকান্ত গোস্বামীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হয়েন। তৎপরে হুগলী জেলার অন্তর্গত বাকুলিয়া গ্রামের কৃষ্ণরাম তর্কসিদ্ধান্তের কন্যা হৈমবতীকে বিবাহ করিয়া পূর্ণভঙ্গ হয়েন। এই হৈমবতীই ইঁহার সহিত সহমৃতা হন। ইনি বৰ্দ্ধমান-রাজের সভাপতি ছিলেন। চণ্ডীপাঠ লইয়া জনৈক দণ্ডধারীর সহিত ইঁহার তর্ক হয়; তর্কে ইনি জয়লাভ করেন)।
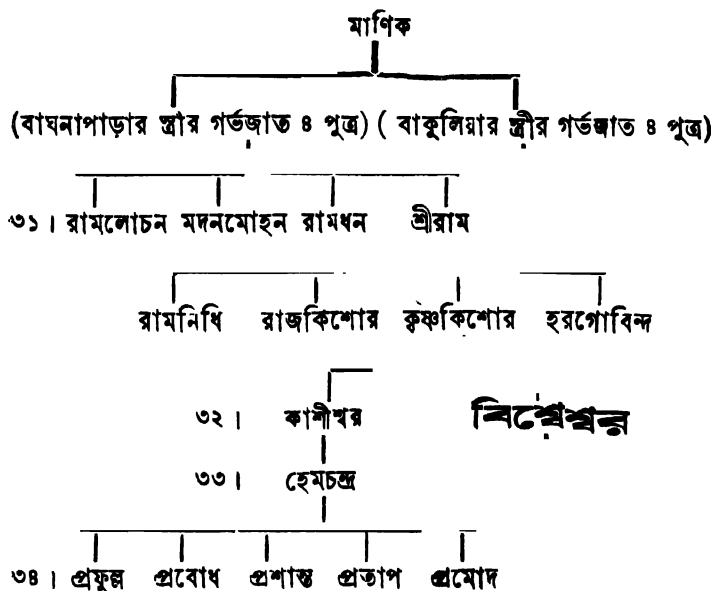
৩৫। অখিলচন্দ্র খেলাৎচন্দ্র শরৎচন্দ্র নবগোপাল

বিশ্বেশ্বরের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র নবগোপাল ১৯৩১ সালে ও মধ্যম পুত্র ৭৮ বৎসর বয়সে ১৯৩৩ সালে ইহলীলা ত্যাগ করেন। এই দুইজনেই সন্ন্যাসরোগে হঠাৎ মারা যান।

অখিলচন্দ্র

- ১ নৃত্যগোপাল (প্রথমপক্ষের সন্তান)
  - সুধীরকুমার (অকালে মৃত)
- ২ ননীগোপাল
  - সাধনগোপাল
    - সত্যগোপাল
  - কৃষ্ণগোপাল
- ৩ ব্রজগোপাল (অকালমৃত)
- ৪ ক্ষীরোদগোপাল
  - বৈদ্যনাথ (মৃত্যু ১৯ বৎসরে)
  - কেদারনাথ
  - অমরনাথ
- ৫ বিনোদগোপাল
  - মোহনকুমার
  - মিলনকুমার
  - বীরকুমার
  - মানসকুমার
- ৬ রামগোপাল
  - নীরোদগোপাল
- ৭ ধনগোপাল
  - বীরেশ্বর
  - রত্নেশ্বর
- ৮ জয়গোপাল
- ৯ প্রাণগোপাল

স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক

পাঁচথুপীর ঘোষ-বংশ

শ্রীশ্রীচিত্রদেবের বংশে রাজা সূর্য্যধ্বজ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহা হইতেই ঘোষ-বংশের উৎপত্তি। এই সূর্য্য ঘোষের বংশে সোম ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। এই সোমঘোষ হইতেছেন উত্তর রাঢ়ীয় সৌকালিন ঘোষ বংশের বীজপুরুষ। এই সোম ঘোষ অযোধ্যা হইতে রাঢ় দেশে আগমন করেন। মহারাজ আদিশূরের সভায় তিনি সম্মানিত ও বিস্তৃত জনপদের সামন্তরাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

সোম ঘোষের জ্যেষ্ঠ পৌত্র মহানন্দ; তাঁহার অনুজ মকরন্দ। মকরন্দ সপ্তগ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনি রঘুবংশে কন্যাদান করেন ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে সম্মানিত হন। তাঁহা হইতেই আকনা ও বালী সমাজের উৎপত্তি। তাঁহারই বংশ আবার বঙ্গীয় সমাজে মিলিত হইয়াছে। মহানন্দের দুই পুত্র—চল ও চিন্তামণি। চিন্তামণি জয়যানের অধিপতি ছিলেন।

তিনি কটূক্তি করায় চল দত্তগ্রাম ছাড়িয়া উত্তর দিকে পাতণ্ডায় গিয়া নিজ পৌরুষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র অচল ও সচল। সচলের পুত্র কেদার রায় নিজ বাহুবলে বহু যশঃ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কেদার রায় বা তাঁহার ভ্রাতৃবংশের নিকট হইতে রাণা মদনের বংশধরগণ রাজ্য-সম্পদ্ কাড়িয়া লইয়া স্ব স্ব অধিকার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

মহানন্দের পুত্র চিন্তামণি পৈত্রিক রাজধানী জয়যানে প্রতিষ্ঠিত থাকায় "কুলীন" বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বাণেশ্বর তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার পুত্র রুদ্র ঘোষ, তৎপুত্র মহেশ্বর,

মহেশ্বরের পুত্র বলভদ্র। বলভদ্রের পুত্র উদয়াদিত্য; তাঁহার তিন পুত্র (১) দামোদর (২) কামদেব (৩) নারায়ণ। কামদেবের বংশ নাই। কনিষ্ঠ নারায়ণ ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করেন। তাঁহার নয়টি প্রসিদ্ধ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র "ষাটি" বা ষাটিঘোষ 'রায় সামন্ত' উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছিলেন। শিবপূজা করিয়া নারায়ণের নয় পুত্র হইয়াছিল বলিয়া তিনি "নারায়ণ" নামে প্রসিদ্ধ হন, তাঁহার ষষ্ঠ পুত্র জনার্দ্দনের বংশই সমাজে ধনে মানে কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। জনার্দ্দনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাসুদেব ও অচ্যুত বালটিতে ও গরুডরুহা গ্রামে গিয়া বাস করেন। কনিষ্ঠ শ্রীনিবাস পিতৃভূমি জয়যানেই অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র বামন নিরাপদ হইবার আশায় হিলোড়ায় গমন করেন। শ্রীনিবাসের কনিষ্ঠ পুত্র ত্রিবিক্রম অসাধারণ বুদ্ধিমান ও তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুসলমান সরকারে উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনিই প্রথমে পাঁচথুপীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া "রাজা" বলিয়া গণ্য হন। ত্রিবিক্রমের আট পুত্র "অষ্ট ভায়া" নামে খ্যাত। রাজা ত্রিবিক্রম ঘোষের চতুর্থ পুত্র রাজা নরপতি পাঁচথুপী গ্রামে বাস করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রয়াগ ঘোষ নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন এবং "মল্লিক" উপাধি লাভ করেন। রাজা নরপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রয়াগ মল্লিকের প্রথমা পত্নীর গর্ভে রাজা রঘুপতি মল্লিক জন্মগ্রহণ করেন। এই রঘুপতির কনিষ্ঠ পুত্র ভবানন্দ হইতে মল্লিক-বংশের ধারা চলিয়া আসিতেছে। ভবানন্দও নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া পিতৃ-উপাধি পাইয়াছিলেন।

মল্লিক ভবানন্দ ঘোষের পৌত্র সিদ্ধানন্দের দুই পুত্র—রাজারাম ও রামরাম। তন্মধ্যে রামরামের বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। রামরামের তিন পুত্র —গোপাল, শ্যামসুন্দর ও রাধাকৃষ্ণ।

রামরামের কনিষ্ঠ পুত্র রাধাকৃষ্ণ ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গাধর

হট্টু নামে পরিচিত ছিলেন। এই গঙ্গাধরের বংশধরগণই সম্প্রতি পাঁচথুপীর মল্লিক বাড়ীতে বাস করিতেছেন। গঙ্গাধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বল্লভীকান্ত হইতে বড় তরফ, রামকানাই হইতে মধ্যম তরফ, নৃসিংহ-দেব হইতে নতরফ এবং গোবিন্দ দেব ছোট তরফ হইয়াছে। এই চারি তরফেই পৃথক পৃথক দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। বল্লভীকান্তের প্রপৌত্র কৃষ্ণগোপাল কান্দীর রাজা শ্রীনারায়ণ সিংহের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়া জমিদারী পাইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শিবকৃষ্ণ। এই শিবকৃষ্ণের সহিত লালাবাবুর পবিত্র রক্তের সম্পর্ক দেখা যায়। শিবকৃষ্ণের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ সরোজকৃষ্ণ বি-এ ও কনিষ্ঠ সুশীলকৃষ্ণ। সরোজকৃষ্ণ প্রাতঃস্মরণীয় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুরের দৌহিত্রীকে বিবাহ করেন; তাঁহার দুই পুত্র—অমিয়কৃষ্ণ ও রাধাকৃষ্ণ। সুবোধ, প্রণব ও নির্ম্মল—এই তিন পুত্র রাখিয়া সুশীলকৃষ্ণ অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহাদের কুলদেবতা গোপীনাথজীউ; কান্দীর রাধাবল্লভীর অনুকরণে তাঁহার ভোগরাগ ও অতিথি-সৎকার হইয়া থাকে। তারাদাসের কনিষ্ঠ পুত্র অশীতিপর বৃদ্ধ মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ত্তমানে বড়তরফের প্রধান ও সর্ব্বদা দেবার্চ্চনায় রত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্রকৃষ্ণ অকালে পরলোকগমন করেন। কনিষ্ঠ রায় সাহেব অমরেন্দ্র-কৃষ্ণ গবর্ণমেণ্ট-ডাক্তার। এই বংশের বিশেষত্ব এই—কৃষ্ণগোপালের ধারা পরম বৈষ্ণব এবং মহেন্দ্রনারায়ণের ধারা মহাশাক্ত। হরিশচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্র। শিবচন্দ্রের পুত্র শরচ্চন্দ্র কান্দীর রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় ও চতুষ্পাঠী পাঁচথুপীবাসীর মহৎ উপকার সাধন করিতেছে। ইনি যেমন মিষ্টভাষী ও তেমনি বিনয়ী ছিলেন; চরিত্রগুণেও তিনি অনেকের আদর্শ ছিলেন। ইঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা; পুত্রের নাম অনারেবল লেফ্‌টন্যাণ্ট শ্রীযুত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মল্লিক। ইনি ১৮৯৬

খৃষ্টাব্দের জুন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায়, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আই-এস্-সি, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজ হইতে বি-এস্-সি (গণিতশাস্ত্রে অনার্স লইয়া) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইনি ইউনিভার্সিটী কলেজ হইতে এম্-এস্-সি ও ১৯২২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯২৬—২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ১৯৩০ হইতে আজ পর্য্যন্ত তিনি কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের সদস্য। ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত মনোরঞ্জন সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার এক পুত্র শ্রীযুত সুবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক। ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের জয়েণ্ট-সেক্রেটারী এবং উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ-হিতকরী সভার বিশিষ্ট সদস্য। ইনি বার্ষিক ১২০৲ টাকা উক্ত সভায় দান করিয়া থাকেন। ইনি কায়স্থ সমাজের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি এবং কায়স্থ সভার ভূতপূর্ব্ব সহঃ সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন।

সত্যেন্দ্রচন্দ্র ও দিনাজপুরের মহারাজ শ্রীযুত জগদীশনাথ রায় মিলিটারী বিভাগে অনারারি কার্য্য করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা "লেফটন্যাণ্ট সুবাদার" উপাধি ও পদ পাইয়াছিলেন। তিনি A. I R. Oএর লেফটেন্যাণ্ট-পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং Boy Scoutএর ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার। সত্যেন্দ্রচন্দ্র পিতার ন্যায় বিনয় এবং সকল প্রকার সদ্গুণে অলঙ্কৃত হইয়াছেন। স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য যথেষ্ট ত্যাগ ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন। নিজ গ্রামে বালক ও বালিকাদিগের জন্য ২টি ফ্রী প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের উইল অনুসারে সত্যেন্দ্র তাঁহার সম্পত্তির চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

স্বর্গীয় ক্ষিতীশচন্দ্র রায়

ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের উকীল-সমাজের অন্যতম অগ্রণী ক্ষিতীশচন্দ্র রায় মহাশয় জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত উলপুরের সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গজ কায়স্থ জমিদারকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ও তাঁহার সময়ে ময়মনসিংহের উকীল-সম্প্রদায়ের অধিনায়ক ছিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র।

পূর্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়; ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ উকীল। দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও 'ডক্টর অফ ল' ছিলেন; অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আইন-ব্যবসায়ে উচ্চ স্থান অধিকার করেন। দুঃখের বিষয়, তিনি অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। কনিষ্ঠ পুত্র—স্বর্গীয় পৃথ্বীশচন্দ্র রায় সুবিখ্যাত পত্রিকা-সম্পাদক এবং কয়েকখানি প্রসিদ্ধ অর্থনীতিক ও রাজনীতিক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত মাসিক ও সাপ্তাহিক "ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড" পত্র এক সময়ে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তিনি ইংরাজীতে সুলেখক ছিলেন।

সুতরাং একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে, ক্ষিতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বাঙ্গালার এক সুশিক্ষিত এবং মনীষা-সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বংশের মর্য্যাদা তিনি অক্ষুন্ন রাখিয়া গিয়াছেন।

উকীল-হিসাবে ক্ষিতীশচন্দ্রের খ্যাতি কেবল ময়মনসিংহে নিবদ্ধ ছিল না। তিনি ৩০ বৎসরকাল ময়মনসিংহে ওকালতী

করিয়াছিলেন ; কিন্তু ঢাকা, পাবনা ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী জেলায় প্রায়ই তাঁহার ডাক হইত। ইহার কারণ ব্যবহার-শাস্ত্রে তাঁহার বিপুল অধিকার ছিল এবং তিনি ছিলেন শক্তিশালী বক্তা ; বক্তৃতার বলে ও যুক্তি-প্রয়োগের নৈপুণ্যে অপরকে তিনি স্বমতে আনিতে পারিতেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারদিগকে মধ্যে মধ্যে ময়মনসিংহে মামলা পরিচালনা করিতে যাইতে হইত। সে সময়ে মামলা-সম্পর্কে ক্ষিতীশচন্দ্রের সংস্পর্শে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা ক্ষিতীশ-চন্দ্রের প্রভূত আইন-জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইতেন এবং বলিতেন,— আপনার মত প্রতিভাবান্ ব্যবহারাজীবের কর্ম্মক্ষেত্র ময়মনসিংহ নহে— কলিকাতা হাইকোর্টে চলুন, সেখানে কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত প্রশস্ত ক্ষেত্র আপনি পাইবেন। কিন্তু ক্ষিতীশচন্দ্র তাঁহাদের উপদেশ পালন করেন নাই ; তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার পিতৃদেবের কর্ম্মক্ষেত্রেই অবস্থান করিয়াছিলেন।

ওকালতীতে ক্ষিতীশচন্দ্রের এরূপ পর্য্যাপ্ত উপার্জ্জন হইত যে, মফঃস্বলের আদালতে দুই চারিজন খ্যাতনামা উকীল ব্যতীত অপরে সেরূপ উপার্জ্জন কল্পনায়ও আনিতে পারিতেন না। কিন্তু উপার্জ্জিত প্রচুর অর্থ তিনি কেবল নিজের ও নিজের আত্মীয়-স্বজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় করিতেন না ; এই অর্থের অধিকাংশই তিনি অপরাপর ব্যক্তির অভাব-মোচনের জন্য দান করিতেন। বহু বিপন্না বিধবা, অসমর্থ ছাত্র, অভাবগ্রস্ত পরিবার তাঁহার নিকট মাসিক সাহায্য পাইত। তাঁহার দান এরূপ সাত্ত্বিক ছিল যে, এক হস্ত দান করিলে অপর হস্ত তাহা জানিতে পারিত না। তাঁহার শিষ্টাচার, বিনম্র ব্যবহার, অমায়িক স্বভাব, দরিদ্রের প্রতি দয়া, মিষ্টভাষিতা এবং মেধা-মনীষা সকলের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করিত। তাই তাঁহার মৃত্যুতে লোকে প্রিয়জন-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিয়াছিল।

বিগত ১৯২৯ সালের ২১শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার ৬টার সময়ে ক্ষিতীশচন্দ্র পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি চিকিৎসার জন্য অক্টোবর মাসের শেষা-শেষি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি কর্সিয়ংয়ে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন; এমন সময়ে হঠাৎ রোগ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ক্ষিতীশচন্দ্রের চারি পুত্র ও সাত কন্যা। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুধীশচন্দ্র রায় এম-এ, পি-এইচ-ডি কলিকাতা হাইকোর্টের উদীয়মান লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার; দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত দ্যুতীশচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল ময়মনসিংহের উদীয়মান এডভোকেট; তৃতীয় শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র রায় এম-এ, এম-এস-সি এবং চতুর্থ শ্রীযুক্ত কীর্ত্তীশচন্দ্র রায়।

স্বর্গীয় নীলরত্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঠক চক্রবর্ত্তীর বংশের রাধাবল্লভ কেচুনীগ্রামে টোল রাখিতেন। রাধাবল্লভের পুত্র নীলরত্ন শৈশবে পিতৃবিয়োগের পর ডাঁইহাটে মাতুলালয় হইতে বহু অসুবিধার মধ্যে অধ্যয়ন করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে ফার্ষ্ট-ক্লাস এম-এ ডিগ্রী পান। অতঃপর তিনি বর্দ্ধমানে দুই বৎসর (১৮৭৪-৭৫) ওকালতি করেন। ইহার পর তিনি রাঁচিতে আগমন করেন এবং সেইখানেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি তখন রাঁচির প্রধান ব্যবহারাজীব ছিলেন। স্বাধীন ব্যবসায় ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহার পাঁচ পুত্রই ব্যবহারাজীব হন। তাঁহার পঞ্চাশবৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম দুই পুত্র উকিল হইলে তিনি অবসর গ্রহণ করেন ও অবশিষ্ট জীবন পূজাপাঠে অতিবাহিত করেন। তিনি ১৯১৩ সালের জানুয়ারী মাসে দেহরক্ষা করেন।

নীলরত্নের প্রথম পুত্র বসন্তকুমার রাঁচির একজন বিশিষ্ট এডভোকেট। তাঁহার তিন পুত্র—কালীকুমার, শক্তিকুমার ও জ্যোতিকুমার। জ্যেষ্ঠ কালীকুমার রাঁচিতে ৪ বৎসর ওকালতি করিয়া এখন পাটনা হাইকোর্টে ব্যবসায় করিতেছেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ টেনিস খেলোয়াড় এবং ১৯৩৩ সনে তিনি বিহার-উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

দ্বিতীয় পুত্র ধনপতি বহুদিন পুরীতে ব্যবহারাজীব ছিলেন। তিনি এখন রাঁচিতেই আছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অঙ্কশাস্ত্রে এম-এ ডিগ্রী পান। তাঁহার চারি পুত্র—বিভূতিভূষণ, ময়ূখ-

ভূষণ, খদ্যোতভূষণ ও পর্জ্জন্যভূষণ। তাঁহার মধ্যম পুত্র ময়ূখভূষণ এখন রাঁচিতে ওকালতি করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ জামাতা ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, পি-আর-এস, পি-এচ-ডি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক।

তৃতীয় পুত্র শরৎকুমার সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ও এম-এ উপাধিধারী এবং গীতার টীকাকার। তিনিও রাঁচির একজন প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব। তাঁহার পাঁচ পুত্র—কৃষ্ণকুমার, পরিতোষ, পরাগ, প্রদ্যোত ও পীযূষ। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকুমার ১৯৩৪ সাল হইতে ওকালতি করিতেছেন।

চতুর্থ পুত্র সন্তোষকুমার ১৯২৮ সালে দেহরক্ষা করেন। তিনিও রাঁচির একজন বড় উকিল ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—বটকৃষ্ণ ও ও অজিতকুমার।

কনিষ্ঠ পুত্র প্রফুল্লকুমার। তিনি ভূতত্ত্বে এম-এ ডিগ্রী পান। কিন্তু পরে পিতার অনুরোধে ব্যবহারাজীব হয়েন। তিনি একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর রাঁচি মিউনিসিপালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন ও মাঝে মাঝে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানেরও কার্য্যভার বহন করিয়াছেন। তিনি ১৯৩১ সালে রাঁচিতে খেলাধূলার জন্য একটী এসোসিয়েসন সৃষ্টি করেন এবং তিনি এখন এথেলেটিক এসোসিয়েসনের অবৈতনিক সেক্রেটারী। তিনি ১৯৩৪ সালে "রায় বাহাদুর" উপাধি পান। তাঁহার দুই পুত্র—অমিয়কুমার ও জ্যোতির্ম্ময়।

কৌলুঞ্চ গ্রাম (কান্যকুব্জ প্রদেশে)

শাণ্ডিল্য কশ্চিৎ
|
কলিব্যাস
|
বামদেব

বামদেব
মহাদেব
ক্ষিতীশ (আগতো গৌড়রাজ্যাৰে)
দামোদর
শৌরি
বিশ্বম্ভর
শঙ্কর
ভট্টনারায়ণ
বঙ্গদেশে
ভট্টনারায়ণ ১
আদিবরাহ ২ (বন্দঘুটি প্রাচীন কুলীন)
বৈনতেয় ৩
সুবুদ্ধি ৪
সুভিক্ষক ৫
ভয়াবাহ ৬
ধবল ৭
মহাদেব ৮
মকরন্দ ৯
দাস ১০ (কণ্টকদ্বীপ নিবাসিড়াৎ কাঁটাদিয়া)
বনমালী ১১
ভীম ১২
মাধব ১৩
আদিত্য ১৪
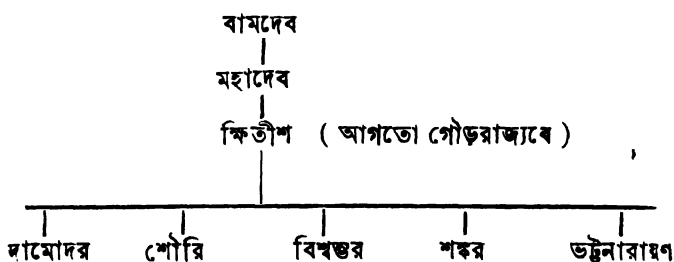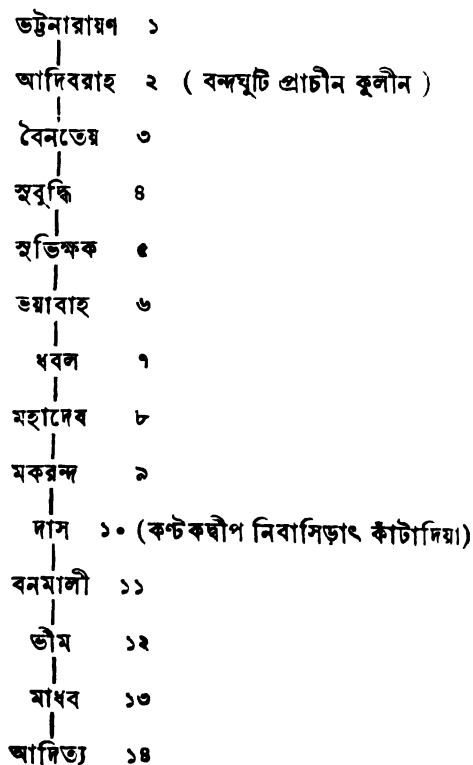
আদিত্য
|
পীতাম্বর ১৫
|
চতুর্ভুজ ১৬
|
লোহাই ১৭
|
শ্রীনাথ ১৮
|
যদুনাথ ১৯ (পাঠক চক্রবর্ত্তী)
|
গোপাল ২০
|
চন্দ্রশেখর ২১
|
প্রাণবল্লভ ২২
|
শিবদেব ২৩
|
দুলাল ২৪
|
শতঞ্জীব ২৫ (অস্যভঙ্গ
|
রামমোহন ২৬
|
রাধাবল্লভ ২৭
|
নীলরত্ন ২৮

নীলরত্ন ২৮
২৯ বসন্তকুমার
২৯ ধনপতি
২৯ শরৎকুমার
২৯ সন্তোষকুমার
২৯ প্রফুল্লকুমার
৩০ কালীকুমার
শক্তিকুমার
জ্যোতিকুমার
৩০ বটকৃষ্ণ
অজিত
৩০ বিভূতিভূষণ
ময়ূখভূষণ
খদ্যোতভূষণ
পর্জন্যভূষণ
৩০ অমিয়কুমার
জ্যোতির্ময়
৩০ কৃষ্ণকুমার
পরিতোষ
পরাগ
প্রদ্যোত
পীযূষ
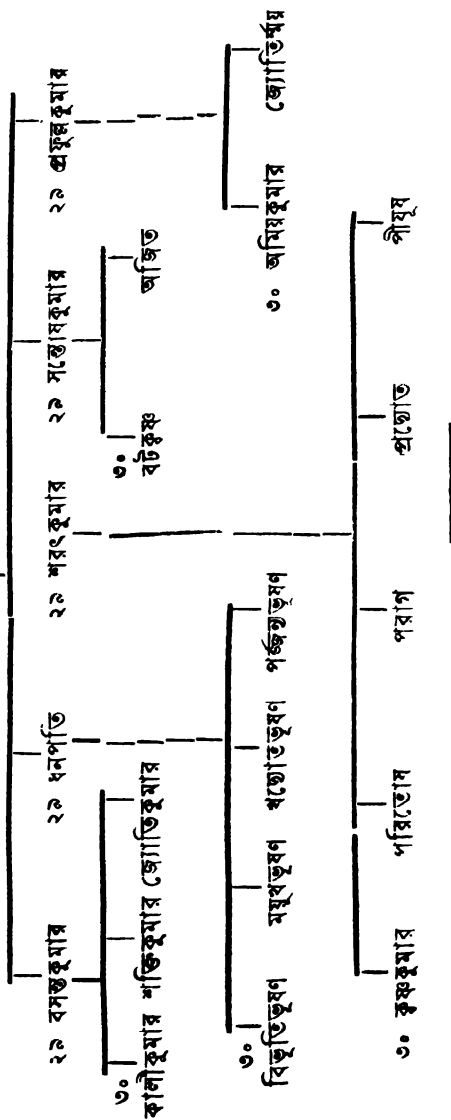
রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী বাহাদুর

রায় মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী বাহাদুর

রায় মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী বাহাদুর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর রবিবার হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে একটী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রপিতামহ রামসুন্দর লাহিড়ী শ্রীরামপুরের লাহিড়ীপাড়ায় যে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন, সেই অট্টালিকায় আজিও তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন। রামসুন্দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকিশোর ধার্ম্মিক, সদালাপী এবং নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত মামলা-মোকর্দ্দমায় তাঁহার সম্পত্তি ও অর্থাদি নষ্ট করেন। রাজকিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদাস লাহিড়ী—রায় বাহাদুরের পিতা ছিলেন। রামদাস ইংরেজী শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি কলিকাতা হিন্দু কলেজ হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি হাইকোর্টের আদিম বিভাগের হেড এসিস্‌টেণ্ট নিযুক্ত হন। তখন হাইকোর্টের নাম সুপ্রীম কোর্ট ছিল। তৎপর তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু তিনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় উক্ত পদে যোগদান করিতে পারেন নাই। তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার চিকিৎসা করেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রামদাসবাবুর বয়স মৃত্যুকালে মাত্র ৩৪ বৎসর হইয়াছিল।

রামদাস লাহিড়ী দুই পুত্র রাখিয়া যান (১) হেমচন্দ্র ও (২) মহেন্দ্রচন্দ্র। ইঁহাদের পিতামহ রাজকিশোরবাবু ইঁহাদিগকে প্রতিপালন করেন। পুত্রের মৃত্যুর অনেক পরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

হেমচন্দ্র হাইকোর্টে একটি উচ্চপদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি এখন

মৃত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুঞ্জলাল ঐ আদালতেই চাকুরী করেন। হাইকোর্টে উক্ত পদ তিন পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা অধিকার করিয়া আসিতেছেন।

কনিষ্ঠ পুত্র ললিতমোহন একজন গ্রাজুয়েট এবং চাকুরী না করিয়া স্বাধীনভাবে কণ্ট্রাক্টরের কাজ করিয়া থাকেন।

রায় মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী বাহাদুর শ্রীরামপুর কলেজে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া মেট্রোপলিটান কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। এক্ষণে ঐ কলেজের নাম বিদ্যাসাগর কলেজ। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ মজুমদার ও মিঃ পি-কে লাহিড়ী তখন উক্ত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং তাঁহাদের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িবার সুযোগ মহেন্দ্রচন্দ্রের হইয়াছিল। এফ্-এ পরীক্ষা দিবার পর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। তখন শ্রীরামপুরে ম্যালেরিয়া ভীষণভাবে বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। এ ম্যালেরিয়া জ্বরে তিনি দুই বৎসর কাল ভুগিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি কলিকাতায় থাকিয়া লাইসেন্স বিভাগের ডেপুটী কলেক্টর স্বর্গীয় প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পড়িতে থাকেন। সুরেন্দ্রনাথ মহেন্দ্রচন্দ্রের পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীতে বাস করিতেন। যুবক সুরেন্দ্রনাথ বি-এ ও এম-এ শ্রেণীতে প্রেসিডেন্সি কলেজে পঠদ্দশায় তাহাকে বি-এ ও এম-এ কোর্সের ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রচন্দ্র ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করেন এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্লীডারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক বৎসরের মধ্যেই কৃতবিদ্য উকিল বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী দিবার প্রস্তাব হয়। তাঁহার ভ্রাতার বিশেষ পৃষ্ঠপোষক স্যর হেন্‌রী কানিংহামের অনুরোধে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারী স্যর জন ওয়েব

এড্‌গার ঐ প্রস্তাব করেন। কিন্তু ওকালতীতে তিনি তখন বিশেষ অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন বলিয়া সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি শ্রীরামপুরের গভর্ণমেণ্ট উকিল নিযুক্ত হন।

রায় বাহাদুর জীবনের শেষ দশায় পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ীর মৃত্যুতে বিশেষ শোক পান। বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। এই পুত্রশোক সত্ত্বেও তিনি রাজা ও দেশের সেবায় বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। এ বিষয়ে দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার আদর্শস্থানীয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পুত্র গুরুপ্রসাদ এখন তাঁহার শোকের একমাত্র সান্ত্বনা-স্থল।

তিনি ওকালতীতে ব্যস্ত থাকিলেও নাগরিকগণের উন্নতি ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের জন্য তাঁহার আগ্রহ ও চেষ্টা চিরকালই সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। আজীবন তিনি জনসাধারণের সেবা করিবার জন্য নিজের অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিয়া আসিতেছেন। এইটিই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব। কি শ্রীরামপুর সহরে, কি শ্রীরামপুরের বাহিরে—যেখানেই তাঁহার ন্যায় প্রবীণ, বিচক্ষণ ব্যক্তির পরামর্শ-গ্রহণ প্রয়োজন হয়, সেখানেই তিনি তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি দেশের নানা সদনুষ্ঠানে লিপ্ত আছেন তাঁহার বদান্যতা এইরূপ যে, তাঁহার বাম হস্ত জানিতে পারে না দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে। নিম্নে তাঁহার অসংখ্য অবৈতনিক ও নিঃস্বার্থ কার্য্যের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হইল :—

(১) শ্রীরামপুর উকিল সমিতির সভাপতি (২) ৩৯ বৎসরকাল শ্রীরামপুরে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা লইয়া অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটী করিতেছিলেন; এক্ষণে অবসর লইয়াছেন কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্মান জন্য ঐ পদ ও ক্ষমতা সমভাবে রাখিয়াছেন।

(৩) ৪৬ বৎসরকাল একাদিক্রমে শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটীর

কমিশনার, (৪) দশ বৎসর যাবৎ মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যান।

(৫) তিন বৎসরকাল মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান।

(৬) শ্রীরামপুর জেলের বে-সরকারী পরিদর্শক।

(৭) শ্রীরামপুর কিংস্ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাবধি উহার সদস্য; এক্ষণে উক্ত হাসপাতালের নাম "কলিকাতা মেডিকেল ইনষ্টিটিউট"।

(৮) শ্রীরামপুর ওয়াল্স্ হাসপাতালের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য।

(৯) শ্রীরামপুর ক্লাবের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট।

(১০) শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইন্ষ্টিটিউসনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি।

(১১) সভাপতি, শ্রীরামপুর এম্-ই স্কুল।

(১২) শ্রীরামপুর বালিকা-বিদ্যালয়ের (এক্ষণে মহাকালী পাঠশালার) ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক।

(১৩) শ্রীরামপুর ব্যাঙ্কিং ও ট্রেডিং কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান।

(১৪) শ্রীরামপুর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি।

(১৫) শ্রীরামপুর চাতরা ভক্তাশ্রমের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি।

(১৬) শ্রীরামপুর চাতরা সাধারণ পাঠাগার ও লাইব্রেরীর সভাপতি।

(১৭) গত যুদ্ধের সময়ে স্বর্গীয় ডাঃ এস্ কে মল্লিক-প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী সৈন্য সরবরাহ কমিটির (Bengali Regiment Recruitment Committee) সদস্য ছিলেন।

(১৮) বিদেশে শিল্পবিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য ছাত্র-প্রেরণ কমিটির সদস্য।

(১৯) ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কার্য্যনির্ব্বাহক সভারসদস্য।

(২০) স্বর্গীয় হেমচন্দ্র গোস্বামী দাতব্য অনুষ্ঠানের জন্য যে এষ্টেট্ রাখিয়া গিয়াছেন উহার একজিকিউটর ও ট্রাষ্টি।

(২১) শ্রীরামপুরের ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকিল।

(২২) শ্রীরামপুর সুগার ওয়ার্কস্ লিমিটেডের বোর্ড অব ডাই-রেক্‌টর্সের সভাপতি।

(২৩) গভর্ণমেণ্ট-নিয়োজিত Vigilance Commiteeর সভাপতি।

(২৪) নিখিল ভারত ন্যাশন্যাল লিবারেল মহাসভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্য।

রায় বাহাদুরকে এই সমস্ত জনহিতকর কার্য্যের জন্য বাঙ্গালার ছোটলাট স্যর জন বোর্ডিলন, স্যর এণ্ড্রু ফেজার ও স্যর উইলিয়ম ডিউক সম্মানজনক সার্টিফিকেট দেন। স্যর উইলিয়ম ডিউকের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ও বন্ধুত্ব ছিল। ১৯১৪ সালের ১লা জানুয়ারি তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। 'রায় বাহাদুর' উপাধি পাইবার পর শ্রীরামপুরে তাঁহার সম্মানার্থ মহাসমারোহে উদ্যান-ভোজ (Garden Party) দেওয়া হইয়াছিল। উদ্যান-ভোজে কলিকাতার বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং দেশবাসীর মুখপাত্রস্বরূপ স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরকার-পক্ষে হুগলীর জেলা-জজ মিঃ বি সি মিত্র তাঁহার নিঃস্বার্থ দেশসেবার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রায় বাহাদুর যেমন সুবক্তা তেমনি সুলেখক। স্যর সুরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং অনেক সভা-সমিতিতে তাঁহার সহিত বক্তৃতাও করিতেন। স্যর সুরেন্দ্রনাথের আদর্শের অনুকরণই তাঁহার জীবনের কৃতকার্য্যের মূল কারণ। যে কোন সমাজ-হিতকর অনুষ্ঠান হউক, তাহাতে তিনি ক্ষিপ্রতার সহিত যোগদান করিয়া থাকেন। তিনি সরকারী, বে সরকারী সকলের নিকটই সমভাবে আদৃত ও

সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। ইউরোপীয়ান ও দেশীয়, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই তাঁহাকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করেন।

তাঁহাকে তাঁহার প্রবীণতা ও পদমর্য্যাদার জন্য দেশী বিদেশী সর্ব্বশ্রেণীর লোক "শ্রীরামপুরের অতি বৃদ্ধ লোক" (Grand Old man of Serampore) বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামপুর

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরের পার্শ্ববর্ত্তী চাতরা গ্রামে প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত নৈকষ্য কুলীন-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টায় বৈদ্যবাটী মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হয় এবং তিনি প্রায় ২০ বৎসর ঐ মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যান ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি শ্রীরামপুর আদালতেরও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি একজন ধার্ম্মিক, পরোপকারী ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন ; কারণ, যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় তখন তিনি পোষ্ট্যাল একাউণ্টস্ ডিপার্টমেণ্টে ৫০৲ টাকা বেতন পাইতেন অথচ সংসারটী বড় ছিল। দেবেন্দ্রনাথ নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে পাটের ব্যবসায় করিয়া সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন। দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার স্বর্গীয় পরম পূজনীয় পিতার পদ অনুসরণ করিয়া উক্ত বৈদ্যবাটী মিউনিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়াম্যান নিযুক্ত হইয়া বহুকাল যাবৎ সম্মান ও সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন। তিনিও বৈদ্যবাটী এবং শ্রীরামপুরের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট। শ্রীরামপুর, চাতরা, বৈদ্যবাটী প্রভৃতি স্থলের প্রায় সমস্ত দেশহিতকর কার্য্যের সহিত তিনি সংলিপ্ত। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদের কোনও আড়ম্বর নাই। তিনি সাধারণ হিন্দুর খাদ্য, ভোজন ও পরিচ্ছদ পরিধান করেন। তিনি নিষ্ঠাবান ও নিরামিষভোজী ; যদিও গত ১০।১২ বৎসর হইতে তিনি রুগ্ন হইয়াছেন, তথাপি পরের উপকার করিতে তিনি সকল সময়েই প্রস্তুত। এমন কি, অনেক সময়ে

নিজের বহু ক্ষতি ও বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও অপরকে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। দোল-দুর্গোৎসবাদি নিত্যক্রিয়াদি ইঁহার বাটীতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইঁহার অনেক দান আছে। প্রার্থী কখন বিমুখ হয় না।

স্বভাবকুলীন ৺রামেশ্বর ঠাকুরের সন্তান, ফুলে মেল—(মুখুটী)

৺কৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়
|
জগৎরাম
|
১১৯২ সালে বিবাহসূত্রে চাতরায়; কৃষ্ণচন্দ্র (মণিরামপুর—২৪পঃ)
|
রামরতন, রামপ্রসাদ, কাশীনাথ, হরিনারায়ণ

কাশীনাথ
|
রামকানাই, চন্দ্রনাথ

রামকানাই
|
কেশবচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, ভোলানাথ

কেশবচন্দ্র
|
হারাণচন্দ্র

ভোলানাথ
|
অমৃতলাল (উকিল, মিরাট)

গোবিন্দচন্দ্র
|
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ, ৺মন্মথ, ৺হরিচরণ, ৺বিজয়কৃষ্ণ

৺হরিচরণ
|
প্রবোধ

৺বিজয়কৃষ্ণ
|
তিনকড়ি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ
|
শ্রীঅনিল, শ্রীসুনীল, শ্রীসুশীল, শ্রীসুধীর

শ্রীসুনীল
|
শিশুপুত্র

শ্রীঅনিল
|
শ্রীআমোদ, শ্রীকার্ত্তিক, অপর দুইটী শিশু

রায় বাহাদুর কালিকাদাস দত্ত, সি-আই-ই

যে সকল বাঙ্গালী কর্ম্মবীর তীক্ষ্ণধীশক্তি ও কর্ম্মকুশলতার বলে ভারতের কয়েকটী স্বাধীন রাজ্যে প্রতিষ্ঠার সহিত কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর অন্যতম। এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালীর নামোল্লেখ করিতেছি,—বরোদা রাজ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত, জয়পুর রাজ্যে হরিমোহন সেন, কাশ্মীররাজ্যে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, কোচিন ও অধুনা কাশ্মীর রাজ্যে স্যর আলবিয়ন রাজকুমার ব্যানার্জ্জি এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় উমাকান্ত দাস। কালিকাদাস দত্ত মহাশয় প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল কোচবিহার রাজ্যে দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া উক্ত মনীষিগণের ন্যায় যশঃ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

পাঠ্যাবস্থা

কালিকাদাস ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা জুলাই তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। বর্দ্ধমান জিলার মিরাল গ্রামে ইঁহাদের পৈত্রিক বাসস্থান। কালিকাদাসের পিতা গোলোকনাথ দত্ত মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ছিলেন। গোলোকনাথ দানশীল ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। শৈশবে কালিকাদাসের মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার মাতুলানী তাঁহাকে লালনপালন করিতেন। স্বগ্রামে থাকিয়া প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া ইংরেজী পড়িবার জন্য তিনি কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হইলেন। তাঁহার মাতুল বিধুভূষণ ঘোষ কৃষ্ণনগরে মোক্তারী করিতেন। কালিকাদাস মাতুলের নিকট থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কালিকাদাস কৃষ্ণনগর হইতে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। তখন

কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ নূতন স্থাপিত হইয়াছে। কালিকাদাস প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতে আইসেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পাশ করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মিঃ সাটক্লিফ ও অধ্যাপক মিঃ কাওয়েল কালিকাদাসকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কালিকাদাসের সহপাঠীদিগের মধ্যে এই নাম কয়টী বিশেষ উল্লেখযোগ্য —জষ্টিস রমেশচন্দ্র মিত্র, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও ভাগলপুরের রায় সূর্য্যনারায়ণ সিংহ বাহাদুর।

সরকারী চাকুরী

প্রফেসর কাওয়েল সাহেবের সহায়তায় কালিকাদাস মাসিক ৬০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। কিন্তু এই কর্ম্মে পিতার অনুমোদন না থাকায় কালিকাদাস অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিয়া আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং ১০৬১ খ্রীষ্টাব্দে আইন পাশ করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে (অধুনা হাইকোর্ট) ওকালতি আরম্ভ করেন। কিন্তু কালিকাদাস অচিরে এই বৃত্তিও ত্যাগ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে আসিয়া কালিকাদাসের চিত্ত ধর্ম্মপ্রবণ হইয়া উঠে, সুতরাং আইন-ব্যবসায় তাঁহার আর মনঃপূত হইল না। তৎপরে তিনি মুন্সেফ-পদের জন্য প্রার্থী হইলে সরকার তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। তিনি মুন্সেফ হইয়া শ্রীরামপুরের বিচারাসনে উপবেশন করেন কিন্তু আইন-ব্যবসায়ের ন্যায় আইনের বিচারও তাঁহার ভাল লাগিল না। কিছুদিন পরে কালিকাদাস প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হয়েন। ডেপুটী ম্যাজি-

ষ্ট্রেটের পদে ক্রমান্বয়ে ঢাকা, জামালপুর, জাহানাবাদ ও কাটোয়ায় কার্য্য করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি কাটোয়ার ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট সেই সময় কোচবিহার রাজ্য হইতে দেওয়ানের পদের জন্য তিনি আহ্বান পাইলেন। কোচবিহার রাজ্যে কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়া তিনি প্রভূত যশঃ ও সম্মান অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

কোচবিহারে দেওয়ানী

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কালিকাদাস কোচবিহার রাজ্যের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন এবং পর বৎসরেই তিনি দেওয়ানের পদে পাকা হন। এই সময়ে মহারাজা স্যর নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর নাবালক ছিলেন। তৎকালে রাজ্যের বাৎসরিক রাজস্ব আট লক্ষ টাকা ছিল।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ সাবালক হইয়া রাজ্য-পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। রাজশাসনের সৌকর্য্য-বিধানার্থ এই সময়ে একটী মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। কালিকাদাস এই মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য হইলেন। রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে যে দরবার হইয়াছিল তাহাতে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোট লাট স্যার রিভার্স টমসন বক্তৃতা প্রসঙ্গে কালিকাদাস রাজ্যের দেওয়ান-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজ্যের যে সকল অর্থ-নৈতিক ও রাজস্ব-বিষয়ক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করেন। কালিকাদাসের চেষ্টায় সমগ্র রাজ্যে ভূমি জরিপ করা হয় এবং রাজ্যের শাসন-বিভাগে বহু সংস্কার সাধিত হয়। জরিপ ও রাজস্বের পরিদর্শনের ফলে রাজ্যের আয় বাৎসরিক আট লক্ষ হইতে বাইশ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। তাঁহারই উদ্যমের ফলে খাজনার হার নির্ণীত হয়, মামলা-মকদ্দমা অনেক কমিয়া যায় এবং প্রজাস্বত্ব কায়েমী হয়। মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ১৯১১খৃষ্টাব্দে ১লা মে তারিখে বিলাত হইতে কালিকাদাসকে যে পত্র লিখেন তাহাতে তিনি দেওয়ানের

কার্য্যকুশলতার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার আমলে রাজ্যে যে সকল উন্নতি-সাধন হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

পারিবারিক জীবন

প্রায় দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ দেওয়ানের পদে কার্য্য করিবার পর কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর ১৯১১ অব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ অব্দের ৮ই নভেম্বর তারিখে মহারাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের রাজ্যাভিষেক-উপলক্ষে বাঙ্গালার ছোট লাট স্যর উইলিয়ম ডিউক যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি দেওয়ান কালিকাদাসের কার্য্যাবলীর বিশেষ উল্লেখ করেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতায় প্রীত হইয়া বাঙ্গালা সরকার ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী কালিকাদাসকে রায় বাহাদুর উপাধি দেন এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী সি-আই-ই উপাধি দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করেন।

কালিকাদাস সদাশয়, উদার ও করুণচিত্ত ছিলেন। অমায়িকতা ও সরস আলাপে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অনেকে কর্ম্মজীবনে ব্যাপৃত হইয়া বাল্যকালের বন্ধুদিগকে বিস্মৃত হইয়া যান, কিন্তু কালিকাদাসের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি বাল্যকালের বন্ধুদিগকে কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই। মধুর প্রকৃতি ও ভগবদ্ভক্তি তাঁহার চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল। কালিকাদাস বর্দ্ধমান জিলার রায়না গ্রামের অধিবাসী হীরালাল বসু মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে মিঃ চারুচন্দ্র দত্ত সিভিলিয়ান; বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে তাঁহার কার্য্যস্থল ছিল; এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র মিঃ অতুলচন্দ্র দত্ত কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল।

মৃত্যু

শেষজীবনে কালিকাদাসের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়ে। যদিও তিনি

শেষকালে দার্জ্জিলিঙ্গে বাস করিতেছিলেন তথাচ তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্যের উন্নতি হইল না। বহুদিন রোগ ভোগ করিয়া তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল। যশঃ, প্রতিষ্ঠা, সম্মান কোনওটিরই তাঁহার অভাব ঘটে নাই।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র জানা, এম-এস-সি, বি-এল

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এডভোকেট শ্রীযুত শরৎচন্দ্র জানা এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মাহিষ্য-বংশের বংশধর। এই বংশের আদিবাস ছিল পুরীধামে। প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহাদের কোনও পূর্ব্বপুরুষ পুরী হইতে মেদিনীপুর জেলায় আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। তদবধি ইঁহারা এই জেলায় বাস করিতেছেন।

এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে বীরেশ্বর দেব মহাশয় উড়িষ্যায় অন্তর্গত পুরীরাজের নিকট-আত্মীয় ছিলেন। তথা হইতে তিনি সপরিবারে ভুবনেশ্বরে আগমন করেন এবং এখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। এখান হইতে তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত খণ্ডরুই নামক স্থানে চলিয়া আসেন। এই স্থানটি এক মাহিষ্য রাজার অধীন ছিল। সেই সময়ে মেদিনীপুর জেলায় বহু মাহিষ্য নৃপতি ছিলেন। তাঁহাদের শাসিত রাজ্যগুলির নাম—তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক), ময়না, জলামুঠা, মাজনামুঠা, তুর্কিগড় এবং খণ্ডরুইগড়। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণের শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রভূত খ্যাতি ছিল; সুতরাং তাঁহাদের প্রায় সকলেই এইসকল রাজ্যের সমর-বিভাগের উচ্চপদগুলিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বীরেশ্বর দেবের বংশধরগণ তমলুক রাজ্যের সমর-বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত হন। তমলুক-রাজ তাঁহাদিগকে তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণপ্রান্ত-রক্ষায় নিয়োজিত করেন। তমলুক-রাজ তাঁহাদের কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া এই অঞ্চলে তাঁহাদিগকে কয়েকটী গ্রাম দান করেন।

এই বংশ এক্ষণে যে বিরুলিয়া গ্রামে বাস করেন তাহার নাম

হইয়াছে এই বংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ বিরূপাক্ষের নামানুসারে। এক বার তমলুক রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে এক ঘোর যুদ্ধ হয়। শত্রুপক্ষের অধিনায়ক তাঁহার অধীন সেনাদলে পরিবেষ্টিত ছিলেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিরূপাক্ষ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক তথা হইতে তুলিয়া লইয়া আসেন। শত্রুসৈন্য বিরূপাক্ষের এই বিপুল শক্তি দেখিয়া ভীত হইয়া রণে ভঙ্গ দেয় ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। পলাইবার সময়ে তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে—"বীরু লে লিয়া" অর্থাৎ বিরূপাক্ষ আমাদের নায়ককে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই ক্রমে গ্রামের নাম হইয়াছে বিরুলিয়া।

বিরূপাক্ষ "জানা" উপাধি ধারণ করেন। "জানা"র অর্থ রাজা। তৎকর্ত্তৃক ব্যবহৃত কতকগুলি প্রাচীন অস্ত্র পূর্ব্বপুরুষের নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার বংশধরেরা যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জানা-বংশের বাসভবনে আগুন লাগে। তাহার ফলে সেইসকল প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র এবং বহু পুরাতন পঁথি ও অন্যান্য মূল্যবান পুস্তক-সমন্বিত পাঠাগার ভস্মীভূত হইয়া যায়।

শরচৎন্দ্রের পিতা ৺কালীপ্রসাদ জানা মহাশয়ের সংস্কৃতশাস্ত্রে বিপুল অধিকার ছিল। তিনি বহু অর্থ ব্যয় ও বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া অনেক প্রাচীন পঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যৌবনে তিনি জনসাধারণের কল্যাণকর বহু আন্দোলন-পরিচালনে সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার জরীপ ও সেট্‌লমেণ্ট হয়; উহার ফলে গভর্ণমেণ্ট রাজস্বের হার বৃদ্ধি করিতে চান। রায়তেরা রাজস্ব-বৃদ্ধির এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এইজন্য যে আন্দোলন হয় কালী-প্রসাদ জানা মহাশয় তাহার অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের যে সংশোধন হয়, তাহার অব্যবহিত পরেই

মেদিনীপুরে যে রাজস্ব-সংক্রান্ত মামলা উপস্থিত হয় তাহা ব্যবহারাজীবগণের অবিদিত নাই।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র জানা ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫খ্রীষ্টাব্দে তিনি ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বিজ্ঞানে বি-এস-সি পরীক্ষা দেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজ্ঞানে এম্‌-এস-সি পরীক্ষা দেন এবং এই পরীক্ষাতেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হন। ১৯১২-১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিন বৎসর তিনি গভর্ণমেণ্টের রিসার্চ্চ স্কলার-রূপে রসায়নশাস্ত্রে গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। এই সময়ে তাঁহার বহু মৌলিক প্রবন্ধ তদানীন্তন আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটীর জর্ণাল ও ইংলণ্ডের কেমিক্যাল সোসাইটির জর্ণালে প্রকাশিত হয়।

ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে গবেষণা-কার্য্য ত্যাগ করিতে হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি উকিল হন। এক্ষণে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম কৃতী এডভোকেট। ইতিমধ্যে তাঁহার সুযশঃ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ মেদিনীপুরের নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভোট পাইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন; এই নির্ব্বাচন-যুদ্ধে ১৬ জন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র জানা কেবল যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই রত্ন তাহা নহেন, তিনি মেদিনীপুর জেলারও উজ্জ্বল অলঙ্কারস্বরূপ।
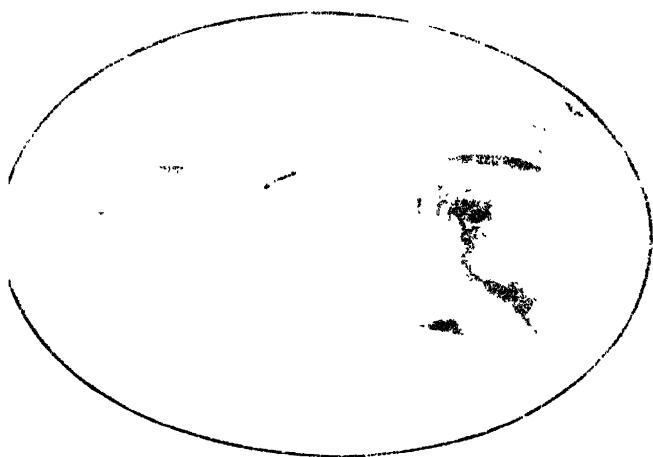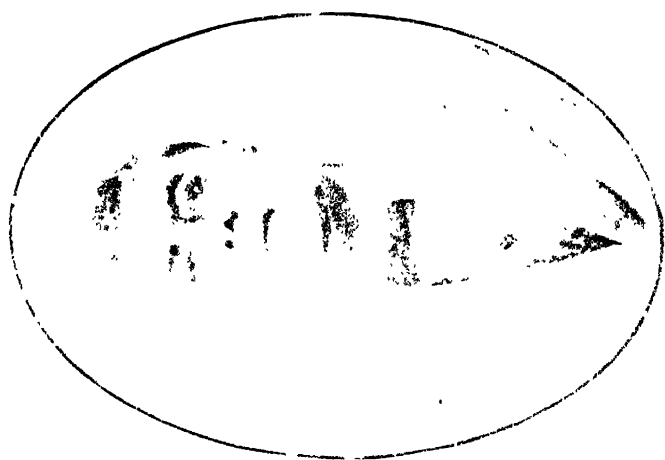
রায় ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়

বাহাদুর

শিক্ষা

রায় শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ১২৮১ সালে ২৮শে শ্রাবণ হুগলী জেলাস্থ চন্দননগর গোস্বামীঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা, হরিদাস ভাগবতভূষণ মহাশয় প্রসিদ্ধ পৌরাণিক এবং একজন শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠক ছিলেন। ইঁহার মাতামহ ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। বংশবাটীতে তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল এবং কিছুকাল তিনি বৰ্দ্ধমান মহারাজার চতুষ্পাঠীতে ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন। ননীগোপাল চন্দননগর সেণ্ট মেরি ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে ১৮৯০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৭ম স্থান প্রাপ্ত হন। ঐ বিদ্যালয় হইতে ১৮৯২ সালে F. A. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া [illegible]শ স্থান প্রাপ্ত এবং বিজ্ঞান বিভাগের মধ্যে ১ম হন। ১৮৯৪ সালে Presidency College হইতে B. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বিজ্ঞানে Honours পান। ১৮৯৫ সালে ঐ College হইতে বিজ্ঞানে M. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রথম বিভাগে ৩য় স্থান পান। ১৮৯৬ সালে প্রায় এক বৎসর উত্তরপাড়া কলেজে বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকতা করেন। ১৮৯৭ সালে Ripon College হইতে B. L. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রথম বিভাগে ৬ষ্ঠ স্থান পান। ১৮৯৮ সালে ৬ মাস কাল সেণ্ট মেরি ইন্‌ষ্টিটিউসনে বিজ্ঞান ও গণিতের অধ্যাপক থাকেন। ১৮৯৮

সালের আগষ্ট মাসে হুগলীর আদালতে উকীল হন। ঐ সালেই পূজার ছুটির পর বাঁকীপুর আদালতে উকীল হন এবং ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত ঐ স্থানে ওকালতী করেন। ১৯০২ সালের প্রারম্ভে প্লেগের প্রকোপে অসুস্থ হওয়ায় বাঁকীপুর পরিত্যাগ করিয়া ৩।৪ মাস কলিকাতা ছোট আদালতে ওকালতী করেন।

চাকরী

২০শে এপ্রিল, ১৯০২ সালে বরিশাল জেলায় পটুয়াখালিতে তিনি মুন্সেফের কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৯২০ সালে ২রা জানুয়ারিতে ঢাকায় সব-জজ হন। ১৯২৬ সালে সহকারী সেসন্‌স জজের ক্ষমতা পান। ১৯২৭ সালে মেদিনীপুরে অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্‌স জজ নিযুক্ত হন। ১৯২৮—১৯২৯ সালের ৩।৪ মাস পর্য্যন্ত নোয়াখালির অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্‌স জজ এবং তাহার পর আসাম-উপত্যকার জেলা ও সেসন্‌স জজ হন। ইহার পূর্ব্বে আর কোনও ভারতীয় সিভিলিয়ান পর্য্যন্ত—ঐ সব জেলায় জজ হন নাই। ১৯৩০ সালে পাবনা-বগুড়ার প্রথম অতিরিক্ত জজ হন এবং জুলাই মাস হইতে ঐ দুই জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্‌স জজ হন। ঐ সালের পূজার ছুটীর পর আলিপুরে অতিরিক্ত জজ-স্বরূপ বদলী হন। ১৯৩১ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

উপাধি

১৯৩২ সালে নববর্ষ উপলক্ষে সরকার তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দেন।

পুত্রগণ

১ম। শ্রীমান্ সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় M.A., B.L. কলিকাতা হাইকোর্টের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ এডভোকেট।

২য়।—ডাক্তার শ্রীমান্ রাধাকান্ত মুখোপাধ্যায় M. B. রাসবিহারী এভেনিউস্থ ৩২৮ নং বাটী হইতে ডাক্তারী করেন এবং ৩ বৎসরের মধ্যে চিকিৎসা-সম্বন্ধে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

৩য়।—শ্রীমান্ নীলরতন মুখোপাধ্যায় B.E. C.E. M.R. San. I. (London) Consulting Engineer। ৩ বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং ব্যবসায়ে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার "Metropolitan Engineering Co." নামক firmএর প্রতিষ্ঠাতা।

৪র্থ।—শ্রীমান্ বিজয়রত্ন মুখোপাধ্যায়, B.L., Advocate, High Court আলিপুরে ২ বৎসর ওকালতী করিতেছেন এবং ইতিমধ্যেই কয়েকটী মকদ্দমা কৃতিত্বের সহিত করায় সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

বংশ-লতা

মেধাতিথি (শ্রীহরি)
|
শ্রীহর্ষ
|
শ্রীগর্ভ

শ্রীগর্ভ
|
শ্রীনিবাস
|
আরব
|
ত্রিবিক্রম
|
কাকুৎস্থ
|
সাধু
|
জলাশয়
|
বাণেশ্বর
|
গুহ
|
মাধব
|
কোলাহল
|
উৎসাহ
|
মহাদেব
|
বিশ্বেশ্বর
|
ভব
|
পশুপতি
|
কৃষ্ণ
|
মহেশ্বর
|
হরি (ওঝা)

হরি
দিগম্বর
মুকুন্দ
ত্রিবিক্রম
কমলাপতি
জানকীনাথ
পূর্ণানন্দ
জ্ঞানানন্দ
নয়নানন্দ
বংশী
কুমুদ
স্বরানন্দ
রাঘব
বামভদ্র
শিবরাম
গোপীবল্লভ
কৃষ্ণবল্লভ
বামনারায়ণ
রঘুনন্দন
মধুসূদন
রাজীব
হরমোহন
রামচন্দ্র
গঙ্গাধর

- গঙ্গাধর
  - সন্তোষ
    - জগন্নাথ
      - কাশীনাথ
        - রাজবল্লভ
          - যাদবেন্দু
            - আনন্দচন্দ্র
              - হরকালী
                - শশাঙ্কশেখর
        - পার্ব্বতীচরণ
          - শ্রীরাম
            - শ্রীহরি
            - শ্রীহর্ষ*
            - শ্রীপতি
            - শ্রীকান্ত
  - রামজীবন
    - রামশরণ
      - রামসুন্দর
        - আনন্দিরাম - চিত্রা (স্ত্রী)
          - (ভঙ্গ) শম্ভুচন্দ্র (দিগম্বরী স্ত্রী)
            - দুর্গাদাস (স্ত্রী নবীনকালী)
            - গুরুদাস
              - অবিনাশ
            - যাদব
            - ক্ষেত্রমোহন (স্ত্রী প্রসন্নময়ী, রত্নমণি ও মনোমোহিনী)
            - কালীপ্রসন্ন
              - অক্ষয় (স্ত্রী সিন্ধুবালা)
                - হরেন্দ্র
            - রজনীকান্ত
          - জয়শঙ্কর
          - জগচ্চন্দ্র
            - শিবচন্দ্র
            - দীননাথ
  - রূপনারায়ণ

* এক্ষণে বর্দ্ধমান-নিবাসী

ক্ষেত্রমোহন
হরিদাস
(স্ত্রী সঙ্কটা ও পৌর্ণমাসী)
ননীগোপাল
(স্ত্রী মৃণালিনী)
সিদ্ধেশ্বর
(স্ত্রী ভগবতী)
সুধাংশু
(স্ত্রী শ্রদ্ধা।
রাধাকান্ত
(স্ত্রী লীলা)
নীলরতন
স্ত্রী কৃষ্ণা)
বিজয়েশ
শৈলজা
ভক্তি
প্রীতি
স্বামী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
কিশোরপ্রসাদ অম্বাপ্রসাদ গুরুপ্রসাদ
রাধাকিশোর
স্ত্রী সোমলতা
দেবপ্রসাদ
ত্র্যম্বকপ্রসাদ
অর্পণা স্বামী
মোহিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
মায়া
শোভনা

মিত্র-বংশের তালিকা

পর্য্যায়

রাজেন্দ্র মিত্র (১৮)

ভাইয়া অনন্তরাম মিত্র (১৯) সাং বন্দীপুর।

- মহাদেব মিত্র (২০)
  - দুর্গাচরণ মিত্র (২১)
    - ভবানীচরণ মিত্র (২২)
      - শিবচন্দ্র মিত্র সাং কোন্নগর) (২৩)
    - ঠাকুরদাস মিত্র
  - চণ্ডীচরণ মিত্র
    - বলরাম মিত্র (২২)
      - হীরলাল মিত্র (২৩)
    - রামকৃষ্ণ মিত্র
- রামশঙ্কর মিত্র
  - (সাং বৈদ্যবাটী) কালীচরণ মিত্র (১)
    - তারিণীচরণ মিত্র (২২)
      - রামকিশোর মিত্র ২৩)
      - গয়ারাম মিত্র
        - দুর্গাদাস মিত্র (২৪) (নি সন্তান)
      - গঙ্গাগোবিন্দ মিত্র
  - রামচরণ মিত্র

রামকিশোর মিত্র

লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র (২৪)   গৌরীশঙ্কর মিত্র (২৪)

(রাজেন্দ্র মিত্র)(২৫) নিঃ সন্তান   উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র   সুরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র   (২৫) যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (রায় বাহাদুর)   নরেন্দ্রনাথ মিত্র   ব্রজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

(২৬) মণীন্দ্রনাথ মিত্র   জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র   কালীপদ মিত্র   (২৬) কাশীশঙ্কর মিত্র

(২৭) প্রশান্তশঙ্কর মিত্র

(২৭) ফণিশঙ্কর মিত্র   অমরশঙ্কর মিত্র   ভবশঙ্কর মিত্র

(২৭) অশোকশঙ্কর মিত্র

(২৬) কালীশঙ্কর মিত্র   দেবশঙ্কর মিত্র

(২৭) লীলাবতী   ইলাবতী

(২৭) সুধীরশঙ্কর মিত্র   বিমলশঙ্কর মিত্র   নির্মলশঙ্কর মিত্র   মনোজশঙ্কর মিত্র   হিমাংশুশঙ্কর মিত্র   বিভাংশুশঙ্কর মিত্র

(১৯শ পর্য্যায়) ভাইয়া অনন্তরাম মিত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এক দিনের জন্য বঙ্গের নবাবের সিংহাসনে অনন্তরামকে বসাইয়াছিলেন।

(২৪শ পর্য্যায়) কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনতিকাল পরেই দ্বিতীয় দলে তিনজন ডাক্তার ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে পাশ করেন, :— দোয়ারী গুপ্ত (ডিঃ গুপ্ত), গৌরীশঙ্কর মিত্র এবং অপর একজন।

(২৪শে পর্য্যায়) গৌরীশঙ্কর মিত্র হাটখোলার ঈশানচন্দ্র দত্তের একমাত্র কন্যা কালীকুমারীকে বিবাহ করেন।

(২৫শ পর্য্যায়) যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মজিলপুরের গোপালদাস দত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা গড়পার-নিবাসী জগন্নাথ দত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র হীরালাল ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন।

(২৬শ পর্য্যায়) কালীশঙ্কর মিত্র মেজর বসন্তকুমার বসুর (আই-এম্-এস্) কন্যাকে বিবাহ করেন। দেবশঙ্কর মিত্র আড়বেলা-নিবাসী ভূপেন্দ্রনাথ নাগের কন্যাকে বিবাহ করেন। কাশীশঙ্কর মিত্র লেপ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল্ সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারীর কন্যাকে বিবাহ করেন।

(২৭শ পর্য্যায়) সুধীরশঙ্কর মিত্র কলিকাতা-নিবাসী ডাক্তার সুধীরকুমার বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন।

— —

স্বর্গীয় বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী

রাঢ়দেশে উগ্রক্ষত্রিয় নামে যে প্রাচীন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি আছে তাঁহারা কখন প্রথমে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত। অনেকে মনে করেন যে, তাঁহারা আগ্রা অঞ্চল হইতে রাজা মানসিংহের সঙ্গে বঙ্গদেশে আসেন এবং সেইজন্য তাহাদিগকে চলিত কথায় আগরি বলে। জৈন ঋষি জয়মল্ল ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে পরদেশী রাজাকা চোপাই নামক গ্রন্থ লিখেন। ঐ পুস্তকের ৬৮ শ্লোকে দেখিতে পাই—

ভোগ উগ্রক্ষত্রকুল উপনাজী, ইক্ষাগ্‌ বংশী আর।
সজি আভরণ চড়া নিজ বাহনে জী,
টৌলেমিল মিল আর।

১৯২১ সালের সেনসাস্‌ রিপোর্টের (Vol. V. Part I) ৩৫০ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই—The Aguries appear to have been the dominant race round Burdwan right up to the Mogul times !

এই জাতির স্বত-শ্রেণীর মধ্যে আট ঘর কুলীন আছে এবং তাঁহারা সকলেই চৌধুরী আখ্যা দ্বারা অভিহিত হন।

ইন্দু আখ্যাধারীগণের নাম ঐ আট ঘরের মধ্যে প্রথম স্থান পাইয়াছে। বর্দ্ধমান শক্তিগড়ের নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুরের চৌধুরী বংশ ইন্দু-বংশজাত বিশেষ সম্ভ্রান্ত কুলীন ঘর। তাহার একটী শাখা প্রথমে ঐ জেলার পেশলা গ্রামে আসে এবং এক্ষণে পুটশুরীতে বসবাস করিতেছে। প্রবন্ধের নায়ক ৺বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী এই বংশের একটী উজ্জ্বলতম রত্ন।

পোশলা-নিবাসী দেবীপ্রসাদ চৌধুরী পুটসুরীর লক্ষ্মণচন্দ্র গোঁ মহাশয়ের কন্যা কৃপাময়ীকে বিবাহ করেন। লক্ষ্মণচন্দ্র অপুত্রক থাকাতে তাঁহার সম্পত্তি কৃপাময়ী ও তাঁহার অন্যান্য কন্যাগণ প্রাপ্ত হন এবং এই কারণে দেবীপ্রসাদ নিজ গ্রাম পোশলাতে বেশী সময় কাটাইতে পারেন নাই। ১২০৮ সালে কার্ত্তিক মাসে দেবীপ্রসাদের পুত্র অম্বিকা-চরণ জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মের দুই তিন দিন মধ্যেই দেবীপ্রসাদ ও কৃপাময়ী পরলোক গমন করেন। অম্বিকাচরণ তাঁহার মাসী প্যারীমণি কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। প্যারীমণির সন্তান না থাকায়, অম্বিকা-চরণের প্রতি তাঁহার সমস্ত স্নেহ বর্ষিত হইয়াছিল। অম্বিকাচরণের মাতামহীর দানসাগর শ্রাদ্ধ বিশেষ সমারোহ-সহকারে সম্পন্ন হয়। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজন-ব্যবস্থার জন্য গ্রামের সায়র নামক দীর্ঘিকার দক্ষিণ দিকে ৭।৮ বিঘা ভূমি সমতল করা হইয়াছিল।

অম্বিকাচরণ নানা গুণে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরাও মুগ্ধ ছিল এবং তাঁহাকে "বড় চৌধুরী" বলিয়া সম্বোধন করিত। এখন পর্য্যন্ত তাঁহার বংশ ঐ অঞ্চলে বড় চৌধুরীর বংশ বলিয়া পরিচিত। পরিণত বয়সে তিনি ভক্ত বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ধর্ম্মে ছিল। চৈতন্য-দেবের পার্ষদ গোপালদাস বাবাজী পুটসুরীতে গোপীনাথ জীউএর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং অম্বিকাচরণ ঐ মন্দিরে যাইয়া সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্ত বৈষ্ণবগণের সঙ্গে আলাপ করিতে ভালবাসিতেন। পুটসুরীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম দেনুড়ে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বাস করিতেন এবং এখনও চৈতন্যদেবের হস্তলিপি ঐ গ্রামে রক্ষিত আছে। বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের অমূল্য বৈষ্ণব গ্রন্থ 'চৈতন্যভাগবতে'র একটী বহু প্রাচীন

হস্তলিখিত পুঁথি অম্বিকাচরণের গৃহে বহুদিন হইতে সযত্নে রক্ষিত ছিল। অম্বিকাচরণ ঐ পুঁথি প্রত্যহ পূজা করিতেন। সম্প্রতি ঐ পুঁথিখানি পানিহাটি বৈষ্ণব-সম্মিলনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ মহাগ্রন্থের যতগুলি প্রাচীন পুঁথি বা তাহাদের মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে সে সমস্তই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চরিত্র-বর্ণনে শেষ হইয়াছে। চৌধুরী-বাড়ীতে প্রাপ্ত প্রাচীন পুঁথিখানিতে অরও তিনটী অতিরিক্ত অধ্যায় সন্নিবিষ্ট আছে এবং এই আবিষ্কারের ফলে বৈষ্ণব-সমাজে একটি আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে।

অম্বিকাচরণের পাঁচ পুত্র,—কৈলাশ, ভুবনমোহন, কপিলেশ্বর, রামদাস ও কেশবচন্দ্র এবং এক কন্যা নিস্তারিণী, তাঁহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ কেশবচন্দ্র অকালে পরলোক গমন করাতে তিনি মাছ মাংস, এমন কি, তামাক পর্য্যন্ত ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতিথিসৎকার ও দেব-দ্বিজে ভক্তি তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। ধর্ম্মপরায়ণ অম্বিকাচরণ কখনও আদালতে সাক্ষ্য দেন নাই, যদিও ইহার ফলে অনেক সময়ে তাঁহার অর্থদণ্ড ও সম্পত্তি নষ্ট হইবার [illegible] ছিল—সাক্ষ্য দিতে গেলে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, মিথ্যা কথা বলিতে হয়। তাঁহার অমায়িক স্বভাব ও সত্যনিষ্ঠার জন্য ঐ অঞ্চলের সকল লোকেই তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৈলাশচন্দ্র তিনটী শিশু পুত্র (মানগোবিন্দ, দোল-গোবিন্দ ও বিজয়গোবিন্দ) এবং একটী কন্যা—ব্রজেন্দ্রমোহিনীকে রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রকৃত সাধকের ন্যায় তিনি এই পুত্রশোক সহ্য করিয়া পিতৃহীন পৌত্রদিগের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেন। পুটস্থরী গ্রাম বর্দ্ধমান জেলা হইতে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত। নিকটবর্ত্তী স্থানে ইংরাজী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকাতে তিনি অবস্থার

অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াও বর্দ্ধমান ও বহরমপুরে তাহাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অম্বিকাচরণের দ্বিতীয় পুত্র ভুবনমোহন পুলিশের সব-ইনস্পেকটর হন এবং তাঁহার কর্ম্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরীর জন্য নির্ব্বাচন করেন কিন্তু নিয়োগপত্র পাইবার পূর্ব্বেই একটী সম্ভ্রান্ত মুসলমান আসামী তাঁহার হেফাজতে থাকিবার সময়ে পূর্ব্বস্থলীতে গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। ইহার জন্য তাঁহার উন্নতির পথে বাধা পড়ে। ভুবনমোহনের বংশধর জঙ্গ বাহাদুর চৌধুরী এক্ষণে মাহাচন্দা গ্রামে বাস করিতেছেন। অম্বিকাচরণের তৃতীয় পুত্র কপিলেশ্বর এফ-এপাশ করিবার পর নব-প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করিয়া সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন কিন্তু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কৃতী পুত্রের মৃত্যুতে তিনি যেভাবে আত্মসংবরণ করিয়াছিলেন তাহাতে গ্রামের সকল লোকেই বিস্মিত হইয়াছিল। অম্বিকাচরণের চতুর্থ পুত্র রামদাস রেলে চাকরী করিতেন এবং তিনটী কন্যা রাখিয়া তিনি মারা যান। প্রথমা কন্যার পুত্রদ্বয়—নৃত্যগোপাল ও বিদুর-চন্দ্র বাহিরি গ্রামে বাস করিতেছেন। দ্বিতীয়া কন্যা বিধবা ও নিঃসন্তান অবস্থায় বৃন্দাবনে দেহলীলা অবসান করেন। উনটিলা গ্রামের রাধিকা-প্রসাদ চৌধুরীর সঙ্গে কনিষ্ঠা কন্যা দীনতারিণীর বিবাহ হইয়াছিল। রাধিকাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভূতিভূষণ কলিকাতার হ্যারিসন রোড-স্থিত প্রসিদ্ধ "দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে"র প্রতিষ্ঠাতা। কৈলাশের জ্যেষ্ঠপুত্র মান-গোবিন্দ বড় হইয়া সংসার দেখাশুনার ভার লওয়াতে অম্বিকাচরণ ধর্ম্ম-চর্চ্চায় জীবন কাটাইবেন স্থির করেন, কিন্তু ২৪ বৎসর বয়সে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন, ঐ সময়ে মান-গোবিন্দের একটী ফাঁড়া আছে। সেই জন্য অম্বিকাচরণ তাঁহার বিবাহ দেন নাই। অম্বিকাচরণ কিন্তু আর সংসারে লিপ্ত হইলেন না; তাঁহার

এক শ্যালক-পুত্রের উপর সমস্ত দেখা শুনার ভার দিয়া নিজে হরিনামে বিভোর হইলেন।

কৈলাশের দ্বিতীয় পুত্র দোলগোবিন্দ প্রথমে বহরমপুরে শিক্ষকতা করিয়া জেল-বিভাগে ৩৫ বৎসর চাকরী করেন ও ঢাকার জেলর-রূপে ১৯১০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার সততা ও যোগ্যতার পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দেওয়া হয়। দোলগোবিন্দ যখন পুরীতে জেলর ছিলেন সেই সময় অম্বিকাচরণ ১২৯৩ সালের ২রা বৈশাখ তারিখে হরিনাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। দোলগোবিন্দ তিন বৎসর পেনসন ভোগ করিয়া পূর্ব্বস্থলীতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়-গোবিন্দের বাড়ীতে গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার পুত্র কৃপাসিন্ধু এক্ষণে নবদ্বীপে ব্যবসায় করিতেছেন।

কৈলাশচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র বিজয়গোবিন্দ ১২৬৪ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই পিতৃহীন হইয়া পিতা-মহের আদরে ও যত্নে পালিত হন। পিতামহের উৎসাহে তিনি আজিমগঞ্জ স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং নিজ গুণে শিক্ষকগণের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠেন। তিনি পরীক্ষায় বরাবর উচ্চস্থান অধিকার করিতেন এবং পুরস্কার ও স্কলারসিপ পাইতেন। মনীষী ভূদেববাবু তখন ঐ অঞ্চলের ইন্‌স্‌পেক্টর অফ স্কুলস্ ছিলেন। আজিমগঞ্জ স্কুল হইতে ১৮৭৪ সালে মাইনর পরীক্ষায় স্কলারসিপ লইয়া পাশ করিলে ভূদেববাবু বিজয়-গোবিন্দকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য উপদেশ দেন এবং তাঁহার স্কলারসিপ-সার্টিফিকেটে নিজ হস্তে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের কথা লিখিয়া দেন। কিন্তু তাঁহার খুল্ল-তাত কপিলেশ্বর নব-প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ হইবার অব্যবহিত পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ঐ সময়ে ডাক্তারী শিক্ষার

প্রতি বাড়ীর সকলেই অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। তাঁহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বিজয়গোবিন্দ ভূদেববাবুকে সব কথা বলেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া খাগরা স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৭৬ সালে যোগ্যতার সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বিজয়গোবিন্দ এণ্ট্রান্স পাশ করার পরে এফ-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সরকারের অধীনে জেল বিভাগে কাজ পাওয়ায় আর বেশী পড়া-শুনা করিতে পারেন নাই। কিছুদিন ডেপুটি জেলারের পদে চাকরি করেন। কিন্তু ঐ কাজ তাহার রুচি-অনুযায়ী না হওয়ায় তিনি রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে সব-রেজিষ্ট্রারের কার্য্য গ্রহণ করেন। সরকারী কার্য্য-ব্যপদেশে তিনি বাঙ্গলা ও বিহারের বহু স্থানে বদলি হইয়াছিলেন। দার্জ্জিলিং, বক্সার, খুলনা, প্রভৃতি স্থানে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। খুলনা, বর্দ্ধমান, কাটোয়া ও অন্যান্য স্থানে তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি মহেশ্বর গ্রামের কুঞ্জবিহারী রায়ের কন্যা অভিলাষিণী দেবীকে বিবাহ করেন। কুঞ্জবিহারী রায় ও তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রসন্নকুমার রায়ের মৃত্যুর পরে তাঁহাদের সম্পত্তি বিজয়গোবিন্দের পুত্র শিবেশ্বর ও গোপেশ্বর পান। মহেশ্বরের সম্পত্তি দেখা-শুনা করিবার জন্য বিজয়গোবিন্দ নিজ ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে বাধা হইবে জানিয়াও বেশী দিন সদর সব-রেজিষ্ট্রারের কার্য্য করেন নাই। তিনি কাটোয়া ও পূর্ব্বস্থলীতে ইচ্ছা করিয়া বদলী হইয়া আসেন এবং শেষজীবন মহেশ্বরে চাকরী করিয়া ১৯১৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

অল্পবয়সে চাকরী গ্রহণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া কলেজে বেশীদূর শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু চাকরী-জীবনে তাঁহার অধিকাংশ সময় সাহিত্য-সেবা ও শাস্ত্র-চর্চ্চায় কাটিত। তিনি অতিশয় সরল,

সুদর্শন, সদালাপী ও নিষ্ঠাবান্ লোক ছিলেন। যে কোন ব্যক্তি অল্প সময়ের জন্যও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ সুখী হইতেন। জীবনে কখনও তিনি মিথ্যা কথা বলেন নাই এবং মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে হইলে অজ্ঞাতসারে পাছে মিথ্যা উক্তি হয়—এই ভয়ে তিনি তাঁহার পিতামহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কখনও কোর্টে সাক্ষ্য দেন নাই। ইহার জন্য অনেক সময়ে তাঁহাকে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মপ্রবণ নিষ্ঠাবান্ বিজয়গোবিন্দ কখনও অর্থের কাঙ্গাল ছিলেন না। যাহা ভাল মনে করিতেন তাহার জন্য তিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার পিতামহ অম্বিকাচরণের মৃত্যুর পর সকলেই বলেন যে, এরূপ মহাপ্রাণ লোকের আদ্যশ্রাদ্ধ সমারোহ-সহকারে সম্পন্ন হওয়া উচিত এবং দানসাগর শ্রাদ্ধ হওয়া উচিত; কিন্তু হাতে বিশেষ কিছু না থাকাতে সকলেই ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। বিজয়গোবিন্দ তখন দার্জ্জিলিংয়ে কাজ করিতেন এবং তাহার চরিত্র মাধুর্য্যে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার জনৈক বন্ধু অর্থাভাবে এরূপ একটী সদনুষ্ঠান করিতে পারিতেছেন না শুনিয়া বিজয়গোবিন্দকে অল্প সুদে প্রয়োজনমত টাকা ধার দেন। ঐ সাহায্য পাইয়া বিজয়গোবিন্দ অম্বিকাচরণের দানসাগর শ্রাদ্ধ করেন। শুনা যায়, শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে এত কুটুম্ব-সমাগম হইয়াছিল যে, পুটিয়ারী গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থকে একাধিক ঘর নানাস্থান হইতে আগত কুটুম্বগণের বাসের জন্য ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। পরিণত বয়সে তাঁহার পুত্রদের শিক্ষার জন্য ব্যয়-সম্বন্ধে তিনি কোনও দিনই কার্পণ্য করেন নাই।

তাঁহার তিন কন্যা ও তিনটি পুত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যা সিদ্ধেশ্বরী বিধবা হইয়া নিঃসন্তান অবস্থায় অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

জামাতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি মূর্চ্ছা যান এবং তাহার পরে মাসাবধি কাল প্রায়ই মূর্চ্ছা যাইতেন। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা শিবদাসী বৈদ্যনাথ নামে একটী পুত্র রাখিয়া ১৯১৩ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা উদ্ধারিণীর সহিত পুতুণ্ডা-নিবাসী ক্ষেত্রনাথ চৌধুরীর বিবাহ হয়। ক্ষেত্রনাথ বর্দ্ধমানে ওকালতী করিতেন এবং এক্ষণে তিনি রেঙ্গুনে ব্যবসায় করিতেছেন। ক্ষেত্রনাথের দুই কন্যা সুনীতিবালা ও মলিনপ্রভা উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিত হইয়াছে।

বিজয়গোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র মদনমোহন অল্পবয়সেই ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদ্ধেশ্বর ১৩০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইংরাজিতে ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স লইয়া সুখ্যাতির সহিত বি-এ পাশ করেন এবং ১২০০৲ টাকার দ্বারকানাথ বৃত্তি পান। এম-এ পরীক্ষায়ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। পরে তিনি আইন-পরীক্ষাও কৃতিত্বের সহিত পাশ করেন। সিদ্ধেশ্বরবাবু বর্দ্ধমান স্কুলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্‌-রূপে কিছুদিন কাজ করেন। পরে তিনি কলিকাতা স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক-রূপে কিছুদিন কাজ করেন। ইহার পরে তিনি সরকারের অধীনে একসাইজ ডিপার্টমেন্টে প্রবেশ করেন এবং এক্ষণে সিনিয়র বেঙ্গল একসাইজ সার্ভিসে একসাইজ-প্রসিকিউটর-রূপে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিখ্যাত মীনা পেশোয়ারীর দলের বিরুদ্ধে কয়েকটী কঠিন মামলা চালাইবার জন্য দিল্লীতে লইয়া যান। সেখানে তিনি বেশ খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৩২—১৯৩৩ সালে সিদ্ধেশ্বরবাবু বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের একজন বিশেষবিৎ (Expert) সদস্য ছিলেন। তাঁহার তিন কন্যা—রাজলক্ষ্মী, স্বর্ণলতা ও মণিকা। পুটসুরীর নিকটবর্ত্তী

দেহুর-নিবাসী ভোলানাথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে।

বিজয়গোবিন্দের দ্বিতীয় পুত্র গোপেশ্বর ১৩০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বি-এ পর্য্যন্ত পড়িবার পর দেশে থাকিতেন। এক্ষণে তিনি কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসায় করিতেছেন। তাঁহার তিন পুত্র—প্রবরকৃষ্ণ, বিপুলানন্দ ও দেবকুমার। তাহারা পড়াশুনা করিতেছে।

বিজয়গোবিন্দ অবসর গ্রহণ করিয়া কিছুদিন পুটস্বরীতে ছিলেন। তিনি স্থানীয় হাই স্কুল কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। পরে তীর্থভ্রমণে বাহির হন। হরিদ্বার হইতে পুরী পর্য্যন্ত সকল তীর্থস্থানে তিনি সস্ত্রীক গিয়াছিলেন। তিনি ১৩৪০ সালে ২০শে কার্ত্তিক তাঁহার পুত্র সিদ্ধেশ্বরের কলিকাতা বাস-ভবনে হৃদ্‌রোগে হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নী অভিলাষিণী দেবী জীবিত আছেন।

ডাঃ তারকনাথ মজুমদার

ডাঃ তারকনাথ মজুমদার সম্ভ্রান্ত বৈদ্য বংশ-সম্ভূত। ইঁহাদের আদি নিবাস জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত গরিফা। এই অঞ্চল বহু প্রসিদ্ধ বৈদ্য-পরিবারের আদিবাসভূমি। গরিফা হইতে ডাঃ তারকনাথের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ দারিয়াপুরে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন।

কবিরাজ গোপীমোহন

ডাঃ তারকনাথের পিতামহ গোপীমোহন মজুমদার খ্যাতনামা কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্য যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নলডাঙ্গার রাজ-পরিবার তাঁহাকে পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করেন এবং কবিরাজ মহাশয়ের বসবাসের জন্য যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার অধীন নান্দোয়ালী গ্রাম দান করেন। এই স্থানেই গোপীমোহনের পুত্র প্যারীমোহনের জন্ম হয়। প্যারীমোহনের বয়স যখন দশ বৎসর সেই সময় তাঁহার পিতৃদেব গোপীমোহন লোকান্তরিত হন।

কবিরাজ প্যারীমোহন

ষোল বৎসর বয়সের সময় প্যারীমোহন তাঁহার গ্রামবাসী তিন জন যুবকের সহিত পদব্রজে মুর্শিদাবাদে গমন করেন। সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাধরের বাড়ী ছিল মুর্শিদাবাদে। তিনি তথায় গিয়া গঙ্গাধরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কবিরাজ গঙ্গাধরের নিকট ৫ বৎসর কাল কবিরাজী শিক্ষা করেন এবং তদনন্তর তাঁহার স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। প্যারীমোহনও নলডাঙ্গা-রাজপরিবারের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি বহুকাল অবস্থান করেন। এই সময়ে কলিকাতা পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের ভগিনীর চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হয়।

ডাক্তার তারক নাথ মজুমদার

স্বর্গীয় কবিরাজ প্যারীমোহন মজুমদার

প্যারীমোহনের চিকিৎসা দ্বারা রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের ভগিনী আরোগ্য লাভ করেন। অতঃপর রাজা তাঁহাকে মাসিক ৪০০৲ বেতনে তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসক-পদে নিযুক্ত করেন। প্যারীমোহন প্রায় ৯ মাস কাল পাইকপাড়া-রাজবাড়ীর পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। তার পর ৫০নং লোয়ার চিৎপুর রোডে আসিয়া স্বাধীন ভাবে কবিরাজী চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। প্রায় [illegible] হইতে ৩৭নং লোয়ার চিৎপুর রোডে বাসস্থান পরিবর্তন করেন। ২২ বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় তিনি স্বাধীনভাবে কবিরাজী ব্যবসায় করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ১৩ই অক্টোবর তিনি স্বর্গারোহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি প্রায় ৫০ বৎসর কবিরাজী চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

কবিরাজ গোপীমোহনের তিন পুত্র—জগমোহন, প্যারীমোহন এবং বিজয়গোপাল। জগমোহন মোক্তার ছিলেন। প্যারীমোহনের দুই পুত্র—তারকনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ।

জগমোহনের চারি পুত্র দেবেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, পঞ্চানন ও পূর্ণচন্দ্র।

ডাঃ তারকনাথ মজুমদার

ডাঃ তারকনাথ প্যারীমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর তারকনাথের জন্ম হয়। তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এলবার্ট কলোজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেন ও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষা দেন ও উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি [illegible] মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে [illegible] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম-বি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ হইতে তিনি কৃতিত্বের সহিত এল এম-এস পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হন। তিনি Comparative Anatomy, Zoology, Medical Jurisprudence বিষয়গুলিতে প্রথম শ্রেণীর এবং Materia Medica and Therapeuticsএ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। তিনি যতদিন মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ততদিন জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-পি-এইচ পরীক্ষায় বিশিষ্ট সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং ইউনিভার্সিটী স্বর্ণ পদক লাভ করেন। সিণ্ডিকেটের মিনিট-বুকে ২রা জুন, ১৯১১ সালের কার্য্যবিবরণ-প্রসঙ্গে (৮৮৬ পৃষ্ঠায় ডি-পি-এইচ পরীক্ষা-বোর্ডের সদস্যগণ) জে টি ক্যালভার্ট, জে-ডব্লিউ মেগ, টি ফ্রেডারিক পিয়ার্স, পল ব্রুল এই মর্ম্মে লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, সমগ্র পরীক্ষার ফল দেখিয়া আমরা এই অভিমত প্রকাশ করিতেছি, এই পরীক্ষায় তারকনাথ মজুমদার এরূপ গুণবত্তার পরিচয় দিয়াছেন যে, আমরা তাঁহাকে স্বর্ণ পদক পাইবার যোগ্য মনে করি। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন ও হাইজিনের ডি টি-এম পরীক্ষায় উত্তী হন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ তারকনাথ প্রথমে ফুড-ইনস্পেক্টর ও পরে এসিষ্ট্যাণ্ট এন্যালিষ্ট বা সহকারী বিশ্লেষকরূপে কলিকাতা স্বাস্থ্যবিভাগে প্রবেশ করেন। অত্যন্ত অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার কর্ম্মনৈপুণ্য ও প্রতিভার বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। ইহার পর কর্ত্তৃপক্ষ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসারের পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করেন। এক বৎসরের পরেই তিনি এই পদে পাকা হন। তৎপরে তাঁহাকে গত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্যবিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তার (Health Officer) পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়। অবশেষে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাস হইতে তাঁহাকে উক্ত পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত

করা হইয়াছে। এই পদের তিনি যে সর্ব্বাংশে যোগ্য ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ডাঃ মজুমদারের পূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসীর ভাগ্যে এই উচ্চপদলাভ ঘটে নাই। তাঁহার যোগ্যতার সম্বন্ধে কেবল যে কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মিঃ জে-সি মুখার্জ্জী, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব হেল্‌থ অফিসার-দ্বয় ডাঃ পিয়ার্স, এম-ডি, ডি-পি-এইচ এবং ডাঃ এইচ-এম ক্রেম, এম-ডি, ডি-পি-এইচ উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন তাহা নহে, শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ডক্টর পি ব্রুল, স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডিরেক্টর লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল মেগও এবং স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের হাইজিনের অধ্যাপক লেপ্টেন্যাণ্ট-কর্ণেল ষ্টুয়ার্টও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন।

ডাঃ তারকনাথের আমলে কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে বহুসংখ্যক প্রসূতি-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে; বহু প্রসূতি-চিকিৎসালয় (Maternity Hospitals) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রতি বৎসর কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নিযুক্ত ধাত্রীগণ প্রায় ১০ হাজার সন্তান প্রসব করাইতেছেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মৃত্যুর হার ছিল হাজারকরা ৩৪·৭ এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর হার কমিয়া হাজারকরা ২৫ হইয়াছে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে শিশু-মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ৩৮৭; ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উহা হ্রাস পাইয়া প্রতি হাজারে ২৪৬এ দাড়াইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যবিভাগের অধীন রাসায়নিক পরীক্ষাগারের (Laboratory) আয়তন বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং অনেকগুলি সহকারী বিশ্লেষণকারী (Assistant Analyst) ও সহকারী জীবাণুতত্ত্ববিৎকে (Assistant Bacteriologist) নিযুক্ত করা হইয়াছে।

খাদ্য-পরিদর্শক-(Food Inspector) গণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এক্ষণে স্বাস্থ্যবিভাগে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিস্তৃতভাবে খাদ্যসামগ্রী ও ঔষধ খাঁটি কি ভেজাল তাহার পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ডাঃ তারকনাথ শিশুগণের রোগ-প্রতিবিধায়ক যে ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা সুফলপ্রদ হইয়াছে। তিনি কলিকাতা সহরে ওলা-উঠার টীকা ও টাইফয়েডের টীকা লইবার আগ্রহ জন-সাধারণের মধ্যে বৃদ্ধি করিয়াছেন। ওলাউঠার ও বসন্ত রোগের সংক্রামকতা ও মারাত্মকতা তাঁহার ব্যবস্থায় ও চেষ্টায় প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। তিনি সংক্রামক ব্যাধিগুলির প্রতিবিধানের জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকেন; এইজন্য উহাদের প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে।

ডাঃ তারকনাথ 'ক্যালকাটা বেবী উইক' ও 'বেঙ্গল বেবী উইক' (Calcutta Baby Week and Bengal Baby Week) নামক শিশু-কল্যাণ অনুষ্ঠানের সহিত সদস্য-হিসাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের স্যানিটারী বোর্ডের, হজ কমিটির, খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু ... বোর্ডের, এবং স্বাস্থ্যমঙ্গল-কর্ম্মীগণের বঙ্গীয় শিক্ষালয়ের কর্ম্মপরিষদের (Executive Committee of the Bengal Training School) সদস্য।

ডাক্তার তারকনাথ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এডিনবরার রয়াল সোসাইটীর সদস্য নিযুক্ত হন। তিনি লণ্ডন কেমিকেল সোসাইটীর সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রফেসর নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৯...৩ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-বি পরীক্ষায় "Hygiene" বা স্বাস্থ্যরক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে D. P. H. পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

তিনি Society of Medical Officers of Health of Great Britain and Irelandএর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি Institute of Public Health of Londonএর সদস্য।

কলিকাতা ফৌজদারী বালাখানা অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ স্বর্গীয় বিনোদলাল সেন মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় কবিরাজ আশুতোষ সেনের কন্যাকে ডাঃ তারকনাথ বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার চারি পুত্র জ্যেষ্ঠ কালিদাস গ্রাজুয়েট, মধ্যম তারাদাস, তৃতীয় শিবদাস এবং কনিষ্ঠ কমলাপদ।

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

তারকনাথের ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি পান। তিনি বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া পাশ করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রথম হইতে এম-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন সেজন্য "শাস্ত্রী" উপাধি পান। ঐ উপাধি পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ পাইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীমহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা ইউনিভারসিটীর Post Graduate Departmentএর Ancient Indian Historyর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি অধ্যাপক ডাঃ ভাণ্ডারকরের সহকারী ছিলেন এবং পালি, Ancient Indian Geography, Asoke's Inscriptions ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের Lecturer ছিলেন। সাতবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্ম করিয়া atna University Assistant Reader [illegible] বেতনে গ্রহণ করেন। তিনি বিহার ও উড়িষ্যার Superintendent of anskrit Studies-পদে নিযুক্ত হয়েন। তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

তিনি ডাঃ কানিংহামের "Ancient Geography of India" নামক পুস্তকের সংশোধিত সংস্করণ বাহির করেন। Ptolemy's Ancient Geography of India পুস্তকের Mcrindleএর অনুবাদের সংশোধিত-সংস্করণ বাহির করেন। পাটনায় বিস্থচিকা রোগে ৪১ বৎসর বয়সে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ৩০শে জুলাই তারিখে তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বংশ-লতা

শ্যামসুন্দর
রঘুনাথ মজুমদার
গোপীমোহন মজুমদার
জগমোহন
প্যারীমোহন
বিজয়গোপাল
দেবেন্দ্রনাথ
শরৎচন্দ্র
পঞ্চানন
পূর্ণচন্দ্র
তারকনাথ
সুরেন্দ্রনাথ
কালিদাস
তারাদাস
শিবদাস
কমলাপদ
দুর্গাদাস
দেবীদাস
অমরনাথ
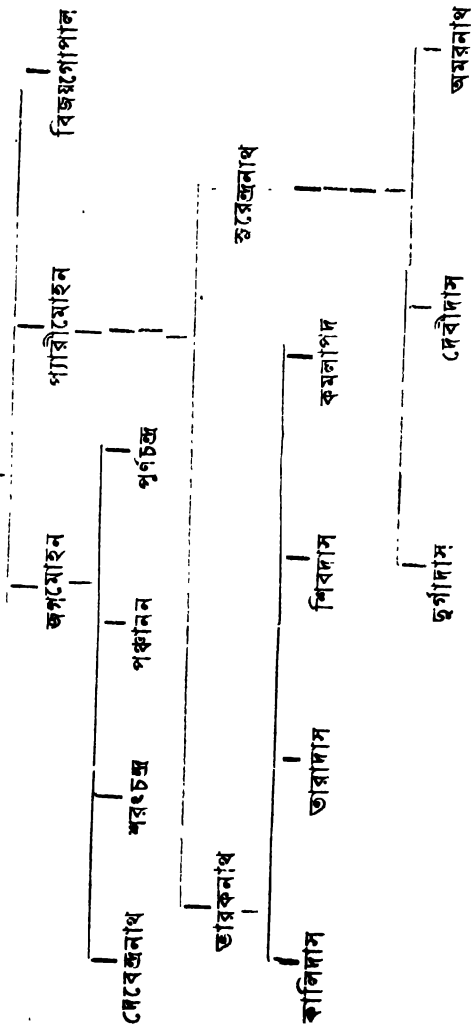
পণ্ডিত প্যারীমোহন

ভারতসাম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বপ্রারম্ভে, অনুমান ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে, যখন ইংলণ্ডে অবাধ বাণিজ্যের মহা আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, যখন বিবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ায় প্রতীচ্য জগৎ স্তব্ধ ও চমৎকৃত, যখন এসিয়া মহাদেশের বক্ষোপরি লোলরসনা রুষিয়ার শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপে ভারতীয় প্রজাবৃন্দের মনে গুরুতর আতঙ্কের সঞ্চার হইতেছিল, যখন ভুবনবিজয়ী ইংরাজবাহিনীর বিজয়-বৈজয়ন্ত' গজনী, কাবুল ও কান্দাহারের অলজ্ঘ্য গিরিশৃঙ্গে দ্বিতীয়বার উড্ডীন হইতেছিল, যখন সিংহবিক্রম রণজিতের মৃত্যুর পর পঞ্চনদ-প্রদেশে তদীয়-সেনানায়কগণ গৃহ-কলহে আত্মচরিতার্থতা লাভ করিতে-ছিলেন, বঙ্গদেশে যখন রাজপ্রতিনিধি মহানুভব বেণ্টিক ও মেট্‌কাফ্ প্রদত্ত মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রভাবে দেশের ও দশের নয়নোন্মেষ-লক্ষণ লক্ষিত হইতেছিল, সেই সময় ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী, কলিকাতা হইতে ৯ মাইল দূরবর্ত্তী, রাজপুরগ্রামে প্রথিত-নামা ধন্বন্তরি-গোত্রোদ্ভব বৈদ্যব্রাহ্মণ-বংশে প্যারীমোহনের জন্ম হয়। তখন বঙ্গের সাহিত্যগুরু বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার এবং প্রখ্যাতযশা কৌতুক-কবি ঈশ্বর গুপ্ত যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন. কবিগুরু মাইকেল, বঙ্গভূষণ ভূদেব ও তেজস্বী রঙ্গলাল কৈশোর অতিক্রম করিয়াছেন বা করিতেছেন; ভাবী সাহিত্যকর্ণধার বঙ্কিম নববর্ম্মধাতা ব্রহ্মানন্দ কেশবসেন ও দশপাল-চালক কৃষ্ণদাস চলচ্ছক্তিমাত্র লাভ করিয়া শিশুজনসুলভ অপার আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। তখন মহাকবি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ভবিষ্যৎ-কালগর্ভে। বঙ্গসাহিত্যে তখনও কবিতার প্রাধান্য—কবিতাপ্রিয়

বাঙ্গালী কাব্যামোদে ভরপূর। 'কবি'র লড়াই, তরজা ও যাত্রা তখন বঙ্গের গ্রামে গ্রামে। তখন দেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ এবং জনপদগুলি সমৃদ্ধ ছিল। বঙ্গশিশুর সে বড় সুখের দিন। শস্যশ্যামলা জন্মভূমির সুখশীতল অঙ্কে পল্লীবাসিনী জননীর স্নেহময় বক্ষে পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাদির স্নেহ-কোমল শাসনে বঙ্গশিশুর সেই একদিন গিয়াছে যাহা এই রোগবিষ-দারিদ্র্য জর্জ্জরিত প্রপীড়িত অকালমৃত্যুগ্রস্ত দগ্ধ বঙ্গসংসারে এক্ষণে স্বপ্নবৎ অলীক বলিয়া বোধ হয়।

প্যারীমোহনের পূর্ব্বপুরুষেরা চারি-পুরুষ যাবৎ রাজপুরে বাস করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা কলিকাতাস্থ সিমলা ও পটলডাঙ্গা নামক স্থানে বহুকালাবধি বাস করিয়াছিলেন। প্যারীমোহনের বৃদ্ধ প্রপিতামহ কৃপারাম সেন তখন একজন যশস্বী কবিরাজ ছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামাভয়ে যখন কলিকাতার লোকে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে-ছিল, তখন কবিরাজ কৃপারাম নামমাত্র মূল্যে কলিকাতাস্থ বসতি-গৃহাদি বিক্রয়পূর্ব্বক বারুইপুরস্থ জমিদারদিগের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় রাজপুরে গিয়া বাস করিতে থাকেন। বারুইপুরের জমিদারদিগের তখন প্রবল প্রতাপ। তাঁহারা বিপুল ভূমিসম্পত্তি প্রদান করিয়া কবিরাজ কৃপারামের সেস্থলে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

তখন রাজপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ বহু খ্যাতনামা বৈদিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত ছিল। দেশে সংস্কৃতবিদ্যার বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল। টোল, বিদ্যালয় অথবা পাঠশালা পণ্ডিতগণের গৃহ লোকশিক্ষার বিধান করিত। কথকতা, শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া ও উচ্চ আদর্শের সান্নিধ্যপ্রভাবে আপামর সর্ব্বসাধারণের চরিত্র অতি সুন্দর-ভাবে গঠিত হইত। গৃহস্থেরা উন্নতচরিত্র, ধর্ম্মভীরু, স্বল্পবিত্তসন্তুষ্ট ছিলেন। সে সময়ে দেশের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, প্রতি গ্রামে অশীতি বা

শত বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন এরূপ প্রাচীন লোক প্রায় দেখা যাইত। যুবকেরা বলবান্, কর্ম্মঠ ও শ্রমসহিষ্ণু ছিল। সে সময়ে পথপর্য্যটনের নানারূপ প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও প্যারীমোহনের পিতামহ কালীচরণ সেন গবর্ণর-জেনারলের ছাপাখানার তত্ত্বাবধানের জন্য প্রত্যহ পদব্রজে যাতায়াত করিতেন। মাসিক ৩০৲ বেতনে তাঁহার সংসার বেশ স্বচ্ছন্দে চলিত, কোনও অভাব-অনাটন হইত না। সকলেই নীরোগ, বলশালী ও ভূরিভোজনক্ষম ছিলেন; দ্রব্যাদিও স্বল্পমূল্য ছিল। কবিরাজ-বাড়ীর সকলেই দীর্ঘজীবী ছিলেন। ডিসপেপ্‌সিয়া বা ম্যালেরিয়ায় কেহ ভুগিতেন বলিয়া শুনা যায় না।

কালীচরণের ছয় পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে হলধর তৃতীয়। হলধর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে হালিসহরের পণ্ডিত চন্দ্রমোহন গুপ্তের ভগিনীকে বিবাহ করেন। হলধর সংস্কৃত-সাহিত্যে বিচক্ষণ পণ্ডিত ও চিকিৎসাকার্য্যে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি বলিয়া বিদিত ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—প্যারীমোহন ও কিশোরীমোহন এবং এক কন্যা রাইমণি; উঁহারা শৈশবে মাতৃহীন হইলেও হলধর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি পুত্র দুইটীকে লইয়া কলিকাতায় বাটী ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পুত্রেরা যাহাতে শ্রমসহিষ্ণু, আত্মনির্ভরক্ষম ও কর্ম্মঠ হয়, তাহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষাদান করিতেন ও সেইভাবে পালন করিতেন। তাহাদের জন্য 'চীনা বাড়ী'র জুতা কিনিয়া দেওয়া তাঁহার একটি বিশেষ সখ ছিল; কিন্তু পাচক ব্রাহ্মণের অনুপস্থিতিতে কেহ স্বহস্তে রন্ধনপরাঙ্মুখ হইলে অসন্তুষ্ট হইতেন। হলধর চিকিৎসা দ্বারা কলিকাতায় যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী কুমার কৃষ্ণনাথ এবং কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যুর পর দেওয়ান রাজীবলোচন, উভয়েই হলধরের গুণগ্রাহী ছিলেন। কলিকাতায় বাসকালে জ্যেষ্ঠপুত্র সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত

হয়, কামনা করিয়া, তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করাইয়া দেন। কনিষ্ঠ কিশোরী ইংরাজী স্কুলে পড়িতে থাকেন। উভয় ভ্রাতাই যশের সহিত প্রতিবৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিতেন এবং উভয়েই পঠদ্দশায় বরাবর উচ্চবৃত্তিধারী ছিলেন। প্যারীমোহন বাল্যাবস্থাতেই অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় দেওয়াতে তাহার খুল্লতাত রাজকৃষ্ণ তাঁহাকে অতি আদর করিতেন। রাজকৃষ্ণ সে সময়ে ইংরাজি ও সংস্কৃতে বিদ্বান্ বলিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি প্রথমে শিশু-কবির প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কখন কখন 'কবিভূষণ' বলিয়া আহ্বান করিতেন। সেইজন্যই যখন সংস্কৃত কলেজ হইতে গ্রন্থকারকে ১৮৭১ অব্দে উপাধি দিবার প্রস্তাব হয়, তখন তিনি অন্যতম উপাধি "কবিভূষণ"ই গ্রহণ করেন।

১৮৫০ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৫ বৎসর কাল ইনি সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, দর্শন ও বেদবিভাগে অধ্যয়ন করেন। সমকালীন ছাত্রবৃন্দের নিকট সুরসিক, সুকবি, সদ্বন্ধু ও সুপুরুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। প্রথিতনামা পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় ও পণ্ডিত ৺নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল্ প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়ীরা সকলেই প্যারীমোহনকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং অনেকেই "প্যারী দাদা" বলিয়া তাঁহাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃকল্প জ্ঞান করিতেন। সে বড় আনন্দের দিন ছিল। অবসর পাইলেই কলেজের দক্ষিণদিকস্থিত গোলদীঘিতে বৃক্ষতলে বসিয়া নানা আমোদ ও সৎবাক্যালাপে সময় অতিবাহিত করিতেন। মুখে মুখে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনা করিয়া পরস্পরকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিতেন, অথবা রহস্যচ্ছলে পরস্পরকে বিদ্রূপ করিয়াও কত কি বলিতেন।

তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কবিত্ব ও প্রতিভা-দর্শনে সংস্কৃত কলেজের তদা-

নীস্তন আচার্য্যগণ অতীব প্রীত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতবর ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় প্যারীমোহনের সরলতা ও দৃঢ়তা, ধর্ম্মভীরুত্ব ও তেজস্বিতা, কবিত্ব ও প্রগাঢ় বিদ্যার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁহার নূতন নূতন পুস্তক মুদ্রিত হইলেই প্যারীমোহনকে এক একখানি উপহার দিতেন। তাঁহার হাতের বাঙ্গালা লেখা এত সুন্দর ছিল যে, বিশেষ কার্য্যের জন্য লেখা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা কিছু লিখিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্যারীমোহনের অনুসন্ধান পড়িয়া যাইত।

ঐ ছাত্রাবস্থাতেই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বালক প্যারীমোহন কবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' নামক সমগ্র গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া ফেলেন। 'কুমারসম্ভবে'র মধুর ভাষা ও ছন্দ সকলেরই মনোহরণ করিয়াছিল। তিন বৎসর পরে শিক্ষক ও সহাধ্যায়ীগণের উৎসাহে এবং ৺পণ্ডিত জগমোহন তর্কালঙ্কার ও ৺মথুরানাথ তর্করত্ন মহাশয়ের সাহায্যে ১৮৬১ সালে উহার প্রথম মুদ্রণ সমাপ্ত হয়। মুদ্রিত পুস্তক অল্পকালেই দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ হইয়া গেল। তাঁহার বন্ধুগণ দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বালক গ্রন্থকার পুনর্মুদ্রণকালে উহার কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তন করিবেন অভিলাষ করিয়া কিছু বিলম্ব করিতে লাগিলেন। শেষে অবস্থাবৈগুণ্যে এমনই হইয়া দাঁড়াইল যে, জীবিতকালের মধ্যে উহার দ্বিতীয় মুদ্রণ আর ঘটিয়া উঠিল না।

'কুমারসম্ভবে'র পদবিন্যাস কোমলতা ও মধুরতাময়, ভাববিকাশে মূল সংস্কৃতগ্রন্থ উহাতে পূর্ণ প্রতিবিম্বিত, ভাষা সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত। যখন বঙ্গে "কবিগণে"র আদিরসাত্মক কবিতা প্রহেলিকা ও গীতাবলী বহুপ্রচারিত ও সমাদৃত, যখন ঈশ্বরগুপ্ত 'ব্যক্ত চরাচর', যখন নব্যবঙ্গে বাগ্‌দেবীর প্রথম অস্ফুট শিশুবাণী সবেমাত্র স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছে এবং

রঙ্গলালের স্বাধীনতা ভেরী* কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নিনাদিত হইয়াছে মাত্র, যখন মাইকেল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের স্বদেশানুরাগ-বিজড়িত বীররস কেহ আস্বাদনও করে নাই তখন এই নূতন মহাকাব্যখানি দীনা বঙ্গভাষার মস্তকমণি "অমূল্য কোহিনুর" বলিয়া সাহিত্যিকগণ প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'কুমারসম্ভব' কাব্য এতই মনোরম হইয়াছিল যে, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় সে দিবসও (প্রথম মুদ্রণের প্রায় ৫২ বৎসর পরে) উহার পুনর্মুদ্রণ হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন।† ১৮৬০ হইতে ১৮৬৫ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর তিনি উক্ত কলেজে সিনিয়র স্কলার বা উচ্চবৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন। সে সময় মহানুভব মেকলে সাহেবের নির্দ্দেশমত সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত রাজভাষা শিক্ষা করিবার পদ্ধতি প্রচলিত হয়। প্যারীমোহন অল্পকাল মধ্যেই ইংরাজীতে অতিশয় ব্যুৎপন্ন হন, এবং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দ্বাদশ মুদ্রা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসরেই বৈশাখ মাসে বড়িশা-নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কন্যার মাতা লিখিতে পড়িতে জানিতেন এবং কন্যাকেও সযত্নে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ সহোদর কিশোরীমোহন তখন মেডিকেল কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র। তিনি জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা চারি বৎসরের ছোট হইলেও তাঁহার বিবাহও ঐ মাসেই সম্পন্ন হয়।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্যারীমোহন যখন এফ,এ পরীক্ষা দিতেছেন, তখন পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে তাঁহার পিতা হলধর কলিকাতাস্থ বাসাবাটীতে

* পদ্মিনী উপাখ্যান। বিশেষতঃ—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়?" দ্রষ্টব্য। রঙ্গলালের "কুমারসম্ভব" অনুবাদ বহুপরবর্ত্তী।

† মূলগ্রন্থের অভাবে মুদ্রণ অসম্ভব হইয়াছিল। আজ দুই বৎসর হইল, একখানি পাওয়া গিয়াছে।

হঠাৎ বিসূচিকা-রোগে প্রাণত্যাগ করেন। এদিকে পিতৃবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনপ্রকৃতিক কিশোরীমোহন কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবের সহিত বিবাদ করিয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দেন। তখন তাঁহাদের সংসারের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া দাঁড়াইল। বৎসরেককাল পরে কিশোরী আবার কলেজে ভর্ত্তি হইয়া পাঠ সমাপ্ত করেন কিন্তু ঐ সময় তাঁহারা ছুটি ভ্রাতা, বালিকা বধূ ও নবজাত পুত্রকন্যা লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিসে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন ও কনিষ্ঠের বিদ্যাসমাপন হয়, সেই চিন্তাই প্যারীমোহনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাঁহার পঠদ্দশায় পিতৃবিয়োগরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনা না ঘটিলে আজ আমরা তীক্ষ্ণধী ও উদ্যোগী প্যারীমোহনের জীবনচরিত অন্যরূপ লিখিতে বাধ্য হইতাম। যাহা হউক, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের যত্নে এবং প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেববাবুর উদ্যোগে শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন কর্ত্তা ১৮৬৫ সালে তাঁহাকে যশোহর বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর-পদে নিযুক্ত করিলেন। তখন হইতে দেশের দুরবস্থা ও অভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের কষ্ট নিবারণ জন্য দরিদ্র স্বদেশবাসীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারই যে প্রধান সাধন, তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন। ছাত্রাবস্থায় অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জ্জন যেমন তাঁহার মূলমন্ত্র রহিল,—কর্ম্মক্ষেত্রেও অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞান-বিস্তার তাঁহার মূলমন্ত্র রহিল। কায়মনোবাক্যে কর্ত্তব্যপালনে রত থাকিয়া তিনি তৎকালিক ইন্স্পেক্টর মহানুভব ভূদেববাবুর প্রিয় হয়েন। আট বৎসরকাল তাঁহার কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিয়া ভূদেববাবু তাঁহাকে সংস্কৃত সাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, উন্নতহৃদয়, কর্ত্তব্যনিরত ও সুবিবেচক বলিয়া প্রশংসা করিতেন। সি-বি ক্লার্ক মহোদয়ও তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন। ছোটলাট ক্যাম্বেল সাহেবের শাসনকালে ১৮৭০

খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিভাগ, অন্যান্য বিভাগের ন্যায়, শাসনবিভাগের অংশ-স্বরূপে পরিণত ও জেলার কর্তৃপক্ষগণের অধীনে স্থাপিত হইল। (Bengal under the Lieutenant-Governors—Page 533) বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারকল্পে প্রস্তাবিত শিক্ষা-পদ্ধতি ভারত গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন না করায় নবস্থাপিত অনেকগুলি পাঠশালার শিক্ষকদিগের বেতন-সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হইল। এতদুপলক্ষে তিনি দরিদ্র শিক্ষকদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া উপরিতন কর্ম্মচারী-দিগের বিরাগভাজন হন। অতঃপর কতিপয় বিষয়ে মতদ্বৈধবশতঃ সাড়ে নয় বৎসর সুখ্যাতির সহিত রাজসেবা করিয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

পরিদর্শন-কালে শিক্ষক ও ছাত্রগণের গুণাগুণ-বিচারে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা দৃষ্ট হইত। এক্ষণে প্রথিতনামা ডেপুটী কলেক্টর বাবু চন্দ্রশেখর কর প্রভৃতি তখন অতি নিম্নশ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, ছোট ছোট বালকদিগের মধ্যেও ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের লক্ষণ তিনি লক্ষ্য করিতেন এবং ছাত্র ও শিক্ষক সকলকেই যথাযোগ্য উৎসাহিত করিতেন। ক্লেশবহুল পরিদর্শনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি সাহিত্যা-লোচনা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং এই সময়ে বঙ্গভাষার তাৎকালিক অবস্থা পর্য্যালোচনে "বঙ্গালঙ্কার" নামক গ্রন্থের কিয়দ্দূর রচনা করেন, কিন্তু নানাকারণে উহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

দেশের দরিদ্রদিগের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া জাতীয় ধনাগমচিন্তা সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল। ব্রাহ্মণোচিত বিদ্যা, ক্ষত্রি-য়োচিত উদ্যমশীলতা ও বৈশ্যোচিত বিষয়-ব্যবসায়বুদ্ধির একত্র সমাবেশ যাহাতে জাতীয় অভ্যুদয়ের দৃঢ়ভিত্তি নির্ম্মাণ করে, তাহাই তিনি সতত চিন্তা করিতেন। ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরবে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস

ছিল, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল রাজদ্বেষী ব্যক্তি দেখিলেই তাঁহার সহানুভূতি দূরে প্রস্থান করিত। তিনি ইংরাজের সুশাসনের প্রশংসা করিতেন এবং দেশের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা দেশবাসীর শিক্ষা ও সংযমের উপর নির্ভর করে, ইহাই বলিতেন। জ্ঞানার্জ্জনে আলস্য এবং উহার সীমার সঙ্কীর্ণতাই জাতীয় অধঃপতনের হেতু, "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্ নাত্মানমবসাদয়েৎ'। আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।" ইহা তিনি প্রায়ই বলিতেন।

কর্ম্মত্যাগের পর তিনি পাথুরিয়াঘাটার ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার পুত্রদ্বয়ের শিক্ষকপদে বৃত হন। এই সময়ে ১৮৭৫ অব্দে কয়েক বৎসর পূর্ব্বের রচিত 'পাকপ্রণালী' ও ১৮৭৭-৭৮ সালে 'বর্ণপাঠ' প্রথম ভাগ মুদ্রিত হয়। 'পাকপ্রণালী'তে তিনি সাফল্য লাভ করেন নাই কিন্তু তৎপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া অন্যে ঐরূপ গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের একটী অঙ্গ পূর্ণ করেন। যাহা হউক, কয়েক বৎসর ঠাকুর-বাড়ীর শিক্ষকতা করিয়া আর্থিক উন্নতি ও বাণিজ্য-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি আসাম গমন করেন। ধনকুবের লছমীপৎ ধনপৎ সিংহের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহানুভব মদনমোহন ভট্ট এই বাণিজ্য-প্রয়াসে তাঁহাকে প্রভূত উৎসাহ ও সাহায্য দান করেন। কিন্তু অজ্ঞাতশীল জনৈক অধস্তন কর্ম্মচারীর উপর অতিমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করায়, অচিরপ্রত্যাশিত লাভের পরিবর্ত্তে ব্যবসায়ে তাঁহার ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

কয়েক মাস ধুবড়ি, গৌহাটী, চন্দ্রপাহাড প্রভৃতি স্থানে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া প্যারীমোহন অদম্য উৎসাহে নষ্ট অর্থ ও গৌরবের উদ্ধারচেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বহু যত্নেও সফলকাম হইলেন না। এই সময়ে "আসাম-বর্ণন" কাব্য রচিত হয়। ঐ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানি কালীকৃষ্ণবাবুর জামাতা শরৎবাবুর নিকট কিছুদিন ছিল। শরৎ বাবুর অকালমৃত্যুর পর পুস্তকখানি হারাইয়া যায়।

ব্যবসায়ে ব্যর্থমনোরথ এবং অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ১৮৮৩ অব্দে প্যারীমোহন আসাম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তৎকালে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের পরামর্শে স্বাস্থ্যলাভেচ্ছায় বাঁকিপুরে বাবু বলদেব পালিতের স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধবিক্রেতা লাহিড়ী কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা জগদীশ বাবুর সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য জন্মে। এই সময়েই তিনি 'বিজ্ঞানদর্পণ', 'পতাকা' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখিতেন। "লিঙ্গবোধ" নামক সংস্কৃতগ্রন্থের এই সময়েই সূত্রপাত হয়, এবং ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বন্ স্কুলে শিক্ষকতাকালে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঐ পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানি সংস্কৃত ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। পাণিনীর 'লিঙ্গানুশাসন' শিখিবার পক্ষে উহা অতি সরল ও উপাদেয় ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ।

প্যারীমোহনের দৈনিক জীবন বিনা আড়ম্বরে ও জ্ঞানানুশীলনে অতিবাহিত হইত। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান, অধ্যয়ন ও গ্রন্থরচনা তাঁহার শেষ জীবনাবধি চির অভ্যস্ত ছিল। যশোদানন্দনবাবুর 'সমাজদর্পণ', তদানীন্তন 'ধন্বন্তরি' * ও 'দৈনিকবার্ত্তা' প্রভৃতি পত্রে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। এক সময়ে তিনি বি এ বিদ্যাসাগরের ভার বহন করিয়া ত্রিশ টাকায় ' উত্তররামচরিতে"র টীকা প্রণয়ন করিয়া দেন। 'আর্য্যধর্ম্মসার' (দুই ভাগ), শিশু রামায়ণ, কবিকুলকণ্ঠহার এবং মহিম্নস্তবের ব্যাখ্যা এই সময়ে প্রণীত হয়।

তাঁহার ব্যক্তিগত লোকহিতৈষণার পরিচয় পদে পদে পাওয়া যাইত। লোকসেবা ও দেশহিতকর অনুষ্ঠানে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়

* বর্ত্তমান 'ধন্বন্তরি' পত্রের প্রথম অনুষ্ঠান।

ছিল। সামাজিক বিষয়ে মতদ্বৈধবশতঃ প্রতিকূলস্রোতে অনেককে অনেকরূপ কষ্ট পাইতে হয়। অর্থাভাব জন্য এই কষ্ট তাঁহাকে কিছু অধিকপরিমাণে ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তিনি সর্ব্বদা অবিচলিত থাকিতেন। বিলাত ও আমেরিকা-প্রত্যাগত ভাগিনেয় অমৃতলাল (পরে 'হোপ্' 'লাহোর ট্রিবিউন্' প্রভৃতির সম্পাদক) সম্বন্ধে আন্দোলনে বৈদ্যসমাজসংরক্ষণী সভাতে বহু শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তিনি উপস্থিত থাকিতে বিরত হইতেন না। তিনি বিপ্লবজনক, বলকৃত বা রাজাজ্ঞামূলক সমাজসংস্কারের বিরোধী ছিলেন। স্বদেশপ্রীতি এবং রাজভক্তি, সহিষ্ণুতা এবং ন্যায়পরতা তাঁহার চরিত্র ভূষিত করিয়াছিল। বিরুদ্ধমতাবলম্বী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার কোনও রূপ দ্বেষ বা ঘৃণা ছিল না। তিনি সর্ব্বসাধারণের সহিত ব্যবহারে নিয়ত বিনীত ও শিষ্টাচার, পুত্র কন্যাগণের প্রতি অগাধ স্নেহবান্ এবং স্বীয় অর্থাভাবসত্ত্বেও আত্মপরনির্ব্বিশেষে দারিদ্র-প্রপীড়িতদিগের সেবা ও উপকার করিতেন। সাধারণ্যে ধর্ম্মবিষয়ে তিনি প্রায়শঃ নির্ব্বাক্ থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের দৃঢ় ধারণা স্থানবিশেষে (আর্য্যধর্ম্মসারে) প্রকটিত হইয়াছে। মহিম্নস্তব ও অর্জ্জুনের বিশ্বরূপস্তব তাঁহার অতি প্রিয় ছিল।

জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত "বৈদ্যবর্ণবিনির্ণয়" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি যন্ত্রস্থ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। এই পুস্তক পঞ্চশতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; ইহা অগাধ পাণ্ডিত্যের অবিনশ্বর ফল। বঙ্গবাসীকে, বিশেষতঃ বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজকে ঐ গ্রন্থখানি উপহার দিবার জন্য তিনি কত বৎসর ধরিয়া দিবারাত্র প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া উহা সমাপ্ত করেন, এবং গ্রন্থখানি সমাপ্তির অল্প কয়দিন পরেই ১৩০২ সালে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ফাল্গুন, বুধবার কয়েকদিবস মাত্র রোগ ভোগ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

প্যারীমোহন নিজের কীর্ত্তিস্তম্ভ নিজে নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। সেই অবিনশ্বর কীর্ত্তি সহজে লোপ পাইবার নহে। যুক্তিপূর্ণ বিচার, নানা শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, মর্ম্মভেদী শ্লেষ এবং সরল অথচ ওজস্বিতা-পূর্ণ বাঙ্গালা গদ্যের ইহা আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুঃখের বিষয়, এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক পাঠের রুচি ও যোগ্যতা অল্প লোকেরই আছে। সুতরাং বাঞ্ছনীয় হইলেও পুস্তকখানি বহুল প্রচার লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

অধ্যাপক ও কবি প্যারীমোহনের জীবনচরিত্র সংক্ষেপে শেষ করিলাম। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে (১) কুমারসম্ভব (২) পাক-প্রণালী (৩) বর্ণপাঠ (৪) লিঙ্গবোধ ও (৫) বৈদ্যবর্ণবিনির্ণয়, এই পাঁচ-খানি মুদ্রিত হইয়াছিল। কুমারসম্ভবের এক খণ্ড পুরাতন কপি দুই বৎসর হইল আমরা বহু অনুসন্ধানে পুরাতন পুস্তকালয়ের এক নিভৃত কোণে প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে তাহার দ্বিতীয় সংস্করণের আয়োজন হইতেছে। 'বৈদ্যবর্ণবিনির্ণয়' নামক গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট "সমাজসংস্থান" অধ্যায়টি নূতন করিয়া পৃথকভাবে মুদ্রিত হইতেছে। সংস্কৃত গ্রন্থ 'লিঙ্গ-বোধে'র দ্বিতীয় মুদ্রণ এবং 'কবিকুলকণ্ঠহারে'র প্রথম মুদ্রণের আশাও সুদূরপরাহত। আধুনিক বঙ্গে অভিনব সংস্কৃত গ্রন্থের পাঠকাভাবই ইহার কারণ।

নিম্নে আমরা সেনভূমিভূষা শ্রীহর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ২২ পুরুষ পর্য্যন্ত প্যারীমোহনের বংশতালিকা দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম। বাণভট্টের কনৌজের হর্ষবর্দ্ধন (৬০৮) হইতে ২২ পুরুষ ৭ শত বৎসর হয়, তাহা হইলে কুলায় না; সুতরাং ইনি অপর শ্রীহর্ষ।*

---

* 'ধন্বন্তরি' (৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২২)

বংশ-লতা

(১) শ্রীহর্ষ সেনভূমির রাজা

(২) বিমল

(৩) বিনায়ক

(৪) কাপত্তি

(৫) বাদলি (সেনাপতি ও চিকিৎসক)

(৬) বামন

(৭) কোণাক

(৮) বিদ্যাপতি

(৯) লক্ষ্মীপতি

(১০) মুরারি

(১১) দামোদর

(১২) কাশীনাথ

(১৩) শ্রীগর্ভ

(১৪) নিত্যানন্দ

(১৫) রামচন্দ্র

(১৬) রামরুদ্র

(১৭) কৃপারাম

(১৮) রামজয়

(৮) রামজয়
(১৯) কালীচরণ
(২০) হলধর
(২১) প্যারীমোহন
শরৎচন্দ্র সেনগুপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।
যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত এল্, এম্, এস্
সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত C. L. M. S.
সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এল্, এম্, এস্,
হরিপদ সেনগুপ্ত শাস্ত্রী এম্, এ,
বিজয়কৃষ্ণ সেনগুপ্ত কবিভূষণ
গোপাল M. B.
রাখাল Motor Engr.
অমিয় বিনয় প্রফুল্ল
পাঁচু ফুটু
গোরা
কুচু
খুচু ও নিতাই

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কনট্রাক্টর, মালদহ।
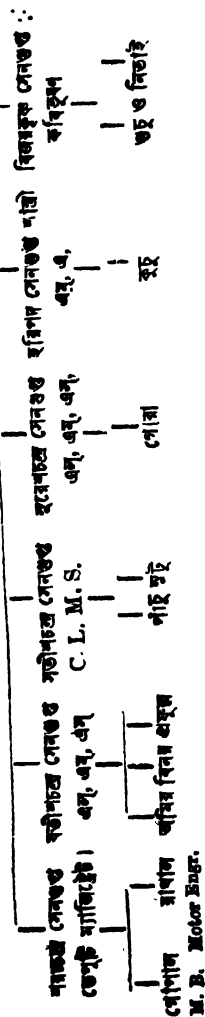
৺রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় মুর্শিদাবাদ জেলার সাইকুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁহার পিতামাতার অর্থাভাব হয়; সেইজন্য তাঁহারা শ্রীশচন্দ্রের মাতামহের স্বগ্রাম শ্রীপুর ওরফে জুজখোলা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে শ্রীশচন্দ্রের মাতামহের সম্পত্তি তাঁহারা পান। রামচন্দ্রের উপনয়ন-কালে তাঁহার বংশের জ্ঞাতি কেহ নিকটে না থাকায় রামচন্দ্রের মাতামহ রামচন্দ্রকে ঋগ্‌বেদ হইতে সামবেদী প্রথানুসারে উপনয়ন দেন। তদবধি শ্রীপুর গ্রামের বংশ-ধরগণ সামবেদী হইয়াছেন।

এই বংশের শ্রীযুক্ত দীননাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সামান্য কিছু পিতৃ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হন এবং স্বীয় অধ্যবসায়-বলে যথেষ্ট সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। ইনি শ্রীশ্রী৺শারদীয়া দুর্গাপূজা আরম্ভ করেন, অদ্যাবধি মহামায়ার চরণে বিল্বপত্র দিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের বাটীতে শ্রীশ্রী৺গোপীনাথজীউ কুলদেবতা আছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে শ্রীপুরের সকল লোকই শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে সতীশচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিবার পর সতীসাধ্বী স্বামী ও পুত্রদ্বয়কে শোকসাগরে ভাসাইয়া স্বর্গগতা হন। তাঁহার মৃত্যুর পর বিদ্যাভূষণ মহাশয় দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে হরিপদ ও নারায়ণচন্দ্র নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হরিপদ বাবুর বয়স এক্ষণে ২৬ বৎসর হইবে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বয়ং এবং গ্রামবাসীর সাহায্যে নিজ গ্রামে সনাতন নামক এম-ই স্কুল স্থাপন করেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীশচন্দ্র প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সমাপ্ত করিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আই-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। কোনও কারণে পরে তাঁহাকে অধ্যয়ন হইতে বিরত হইতে হয়।

কর্ম্মজীবন

তিনি অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া স্থানীয় এম্-ই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। কিছুদিন যশের সহিত ঐ কার্য্য করিয়া উচ্চ আশা হৃদয়ে বলবতী হইলে তিনি ঐ কার্য্য স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া ৪৷৷৶০ আনা মাত্র সম্বল লইয়া রংপুরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সতীশ-বাবুর নিকট গমন করেন। সতীশবাবু রংপুরে কণ্ট্রাক্টরী করেন। শ্রীশ বাবু তথায় কিছুদিন থাকিবার পর জজের সেরেস্তায় কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং অবসরমত গৃহ-শিক্ষকতার কার্য্য করেন, শ্রীশ বাবু বরাবর সঞ্চয়শীল; কিসে দশজনের মধ্যে একজন হইতে পারিবেন এই চিন্তা সততই তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইত। তিনি উপার্জ্জনের টাকা হইতে অর্দ্ধেক পিতাকে পাঠাইয়া দিতেন এবং বাকি টাকা সেভিংস্ ব্যাঙ্কে রাখিয়া দিতেন। গৃহশিক্ষকতার গুণে যে ২টী ছাত্রকে পড়াইতেন তাহারা পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল—ইহা দেখিয়া ছাত্রদ্বয়ের পিতা নিজ বাটীতে শ্রীশবাবুর আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

এইভাবে কিছুদিন কার্য্য রবার পর জজের সেরেস্তার কার্য্যে পদোন্নতি হইল এবং তাঁহাকে তথা হইতে বদ্‌লি করার হুকুম হইল; কিন্তু শ্রীশবাবুর তাহা মনোমত না হওয়ায় তিনমাসের ছুটী লইয়া এক মাড়োয়ারীর নিকট ১০০৲ শত টাকা মাহিনায় কার্য্য গ্রহণ করিলেন

এবং ১০০৲ শত টাকা মাহিনা বাদ কারবারে যাহা লাভ হইবে তাহার এক চতুর্থাংশ পাইবেন—এই সর্ত্ত হইল। এইভাবে এক বৎসর কার্য্য করিবার পর সেই ব্যবসায়ে দশহাজার টাকা লাভ হইল। ইহা দেখিয়া মাড়োয়ারী বলিল, বাবু তোমাকে যাহা মাহিনা দিয়াছি ইহা ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারিব না। এই কথা শুনিয়া শ্রীশবাবু সেই কার্য্য ত্যাগ করিয়া নিজে ধীরে ধীরে কণ্ট্রাক্টরী কার্য্য আরম্ভ করেন। ঐ কার্য্যে তাঁহার বেশ সুনাম হইল। ক্রমে এই কথা গভর্ণমেণ্টের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট পৌঁছিল। তাঁহারা শ্রীশবাবুকে ডাকিয়া কার্য্য দিলেন। শ্রীশবাবু প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে সুচারুরূপে সে কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ক্রমে বড় বড় কার্য্য পাইতে লাগিলেন, এব তাঁহার যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। শ্রীশবাবুর অসীম অধ্যবসায় এবং সততার গুণে লক্ষ্মী আগমন করিলেন। এক্ষণে ইনি মালদহে ৪খানি বড় ইষ্টকালয় এবং আরও ২খানি বাটী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন ও অনেক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। ইনি যাহা মনে করিয়াছিলেন ভগবান ইঁহার সে আশা পূর্ণ করিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক; সর্ব্বদা হাস্য-বদন এবং আতিথ্য-পরায়ণ, প্রার্থী কখন ইঁহার নিকট বিমুখ হয় না। যে সমস্ত সদ্‌গুণ থাকিলে মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করে ইঁহাতে সেইসমস্ত গুণই বর্ত্তমান আছে। শ্রীশবাবুর কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺গোপী-নাথ জীউর স্থায়ী দেবোত্তর সম্পত্তি করিবার বাসনা হৃদয়ে বলবতী হইয়াছে। ভগবৎ-কৃপায় তাহা সত্বরই সম্পূর্ণ হইবে। শ্রীশবাবু তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুষমা দেবীর শুভ বিবাহ প্রায় ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে কলিকাতা শ্যামবাজার ২নং কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বাগ্‌চীর পুত্র শ্রীমান্ প্রভাতকুমার বাগ্‌চীর সহিত সুসম্পন্ন

করিয়াছেন। ইঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিপদ চক্রবর্ত্তীকে পাবনা সহরে কণ্ট্রাক্টরী কার্য্য করিয়া দিয়াছেন। আশা করা যায়, ইনিও জ্যেষ্ঠের ন্যায় কার্য্যদক্ষ হইবেন।

বাল্যকালে শ্রীশবাবুর মাতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁহার পিতৃস্বসা মোক্ষদাসুন্দরী তাঁহাকে মাতার ন্যায় লালন-পালন করেন এবং কার্য্যোপলক্ষে শ্রীশবাবু যখন যেখানে থাকেন তিনিও মাতার ন্যায় তথায় অবস্থান করেন। বর্ত্তমানে শ্রীশবাবুর মালদহস্থ বাটীতে তিনি আছেন। তাঁহার শক্তি অপরিসীম। তিনি অন্নপূর্ণার ন্যায় অন্নদানে কখন কাতরা হন না। তাঁহার অধিক বয়স হইলেও তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া অতিথি-অভ্যাগতের সেবা করেন।

অতি অল্প বয়সে শ্রীশবাবুর বিবাহ হইয়াছিল। শ্রীশবাবুর জীবনে 'স্ত্রীভাগ্যে ধন' এই প্রবাদ-বাক্যের যথার্থতার সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীশবাবু লক্ষ্মীস্বরূপিণী স্ত্রীকে লাভ করিয়া তাঁহার জীবনে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। পাবনা জিলাস্থিত গোপালনগর গ্রামের ৺হৃদয়নাথ মজুমদারের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীকে তিনি বিবাহ করেন।

পাবনা জেলাস্থিত শ্রীপুর ওরফে জুজখোলা গ্রামের প্রসিদ্ধ বারেন্দ্র শ্রেণী ময়ুর ভট্ট বংশের রামচন্দ্রের অধস্তন পুরুষগণের বংশ-লতা
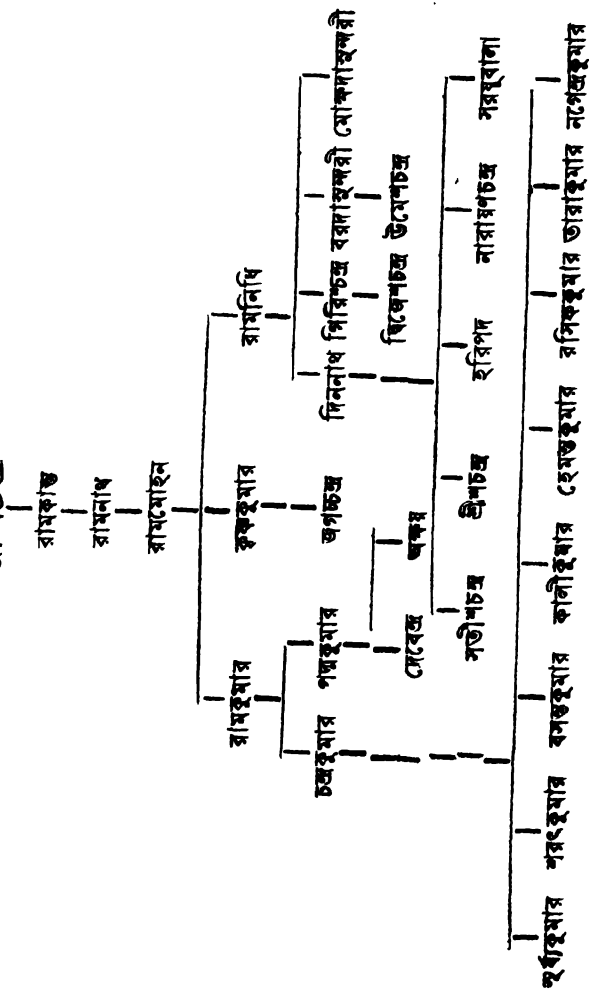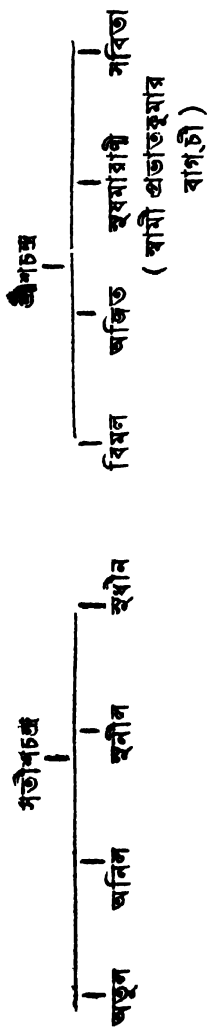
শ্রীশচন্দ্র
বিমল
অজিত
সুষমারাণী
(স্বামী প্রভাতকুমার বাগচী)
সবিতা
সতীশচন্দ্র
অতুল
অনিল
সুনীল
সুধীন

ঢাকা—রোয়াইলের বৈশ্য সাহা-বংশ

ঢাকা জিলার অন্তর্গত রোয়াইল গ্রামে ইঁহারা বহু শতাব্দী হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন। ৺মাণিকচন্দ্র সাহা মহাশয় ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা বিশেষ উন্নতি করিয়া যান। তাঁহার পুত্র ৺ভগবানচন্দ্র সাহাও ব্যবসায় করিতেন। ৺ভগবানবাবুর দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ শ্রীজনার্দ্দন সাহা পিতৃপুরুষের ব্যবসায়-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীহীরালাল সাহা, এম-এ মহাশয় বর্ত্তমানে মালদহের পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

বেলেঘাটার নস্কর-বংশ

বেলিয়াঘাটার নস্কর বংশ একটী বিখ্যাত পরিবার। ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে ইহাদের নাম জানেন না বা শুনেন নাই, এরূপ লোক অতি অল্পসংখ্যকই দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ২৪ পরগণা কেন, খুল্না, যশোহর, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলারও অধিকাংশ অধিবাসীই এই প্রসিদ্ধ পরিবারের বিষয় অবগত আছেন। পশ্চিম বঙ্গের জমিদার-দিগের মধ্যে ইঁহারা একটী লব্ধপ্রতিষ্ঠ জমিদার বংশ; কিন্তু জমিদারীর আয়তনের তুলনায় ইঁহাদের সুনাম খুব বেশী। তাঁহাদের জমিদারী সমস্তই ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদিও ২৪ পরগণা জেলার বাহিরে ইঁহাদের জমিদারী নাই, তাহা হইলেও তাঁহাদের নাম বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত সদর মহাকুমার এলেকাধীন সোনারপুর থানার অন্তর্ভুক্ত ক্ষেয়াদহ গ্রামে ইঁহাদের আদি বাসস্থান। এই স্থানটী কলিকাতা হইতে বহুদূরে নহে। উক্ত গ্রামে যদিও এখন ইঁহাদের কেহ সকল সময়ে বাস করেন না, তথাপি সেখানে তাঁহাদের বাসোপযোগী সুবৃহৎ অট্টালিকা ও সুদৃশ্য ঠাকুরদালান এখনও অতিযত্নে সংরক্ষিত হইতেছে। সেখানে প্রতি বৎসর ৺শারদীয়া পূজা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরই উক্ত গ্রামের এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ বহুগ্রামের অসংখ্য দীনদরিদ্র ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে এবং বহুবিধ সাহায্য লাভ করিয়া থাকে। উক্ত গ্রামে ইঁহাদের বংশের কে কোন্ সময়ে যে প্রথম

বসতি স্থাপন করেন, তাহার সঠিক সন্ধান কিছু পাওয়া যায় না। অনুসন্ধানে ইঁহাদের ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত পরিচয় পাওয়া যায়। বন্দেলের প্রসিদ্ধ জমিদার রায়বাবুদের সহিত ইঁহাদের চতুর্দ্দশপুরুষ প্রভেদ। এই দুই জমিদার পরিবার একই বংশ-সমুদ্ভূত। বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহারা সোনারপুর থানার অন্তর্গত 'দেয়াড়া' গ্রামে একসঙ্গে বাস করিতেন। পরে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা কেয়াদহে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। উক্ত দেয়াড়া গ্রামে এখনও রায় বাবুদের বাড়ী আছে। বর্ত্তমানে রায় বাবুরাও খুব প্রতাপশালী জমিদার বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুত শ্রীধরচন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম খুবই বিখ্যাত। তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুত অতুলচন্দ্র রায় টালীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ও আলিপুর লোক্যাল বোর্ডের মেম্বর।

নস্কর বাবুরা যেমন প্রতাপশালী, তেমনই বদান্য ও সদাশয় জমিদার। প্রজাগণ ইঁহাদিগকে যেমন ভয় করিয়া থাকে, তেমনই আবার ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া থাকে। ইঁহারা প্রজাদের নিকট হইতে কেবল কর আদায় করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন না, প্রজাদের সুবিধা ও অসুবিধার দিকে ইঁহারা সতত সমধিক দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন এবং তাহাদের কোনরূপ অসুবিধা উপস্থিত হইলে, ইঁহারা সযত্নে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করেন। প্রকৃতিপুঞ্জের শিক্ষোন্নতির নিমিত্ত ইঁহারা কেয়াদহ, বেঁওতা প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছেন ও তাহার যাবতীয় ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করিয়া থাকেন। প্রজাদের মধ্যে কোন প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে, ইঁহারা নিজেরাই উভয় পক্ষের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া, এমন সুন্দর সুবিচার দ্বারা তাহার মীমাংসা করিয়া দেন যে, কোন পক্ষেরই তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবার কারণ থাকে না। সেইজন্য

কোনরূপ বিবাদের সূত্রপাত হইলে, সকল শ্রেণীর প্রজাগণ আদালতে যাইবার পূর্ব্বে ইঁহাদের নিকটে প্রথমে বিচারপ্রার্থী হইয়া থাকে। ইঁহাদের মধ্যস্থতার পর অতি অল্প সংখ্যক মামলাই আদালতের এ[illegible]য় প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়।

৺ রামকৃষ্ণ নস্কর

এই বংশের মধ্যে স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ নস্কর মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অবস্থা বরাবর এরূপ উন্নত ছিল না। তাঁহারা ক্ষেয়াদহ গ্রামে সাধারণ গৃহস্থের স্থায় বসবাস করিতেন। স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ নস্কর মহাশয়ের প্রপিতামহ ৺ রাজবল্লভ নস্কর মহাশয়ের সময় হইতে ইঁহাদের উন্নতির সূত্রপাত হয়। কিন্তু প্রকৃত উন্নতির যুগ আরম্ভ হয় স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ নস্কর মহাশয়ের চেষ্টায় ও যত্নে। ৺রামকৃষ্ণ নস্কর মহাশয়ের পিতামহ ৺বাসুদেব নস্কর মহাশয় তাঁহার একমাত্র পুত্র ফতুচন্দ্র নস্কর মহাশয়কে নাবালক অবস্থায় রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। ফতুচন্দ্রকে শৈশবে এরূপ অভিভাবক-হীন পাইয়া, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ নানাপ্রকারে ফাঁকি দিয়া, তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি হস্তগত করিতে লাগিলেন। এইরূপে ফতুবাবু জ্ঞাতিগণের কুচক্রে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া, বড়ই দুরবস্থায় পতিত হইলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি বিশেষ বিচলিত হইলেন না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, তিনি স্বীয় পুরুষকারের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রমে তাঁহার পূর্ব্বসম্পদ উদ্ধারের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

ফতুচন্দ্র যখন তাঁহার অদৃষ্টের সহিত এইরূপ কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত তখন রামকৃষ্ণ নস্কর মহাশয় তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ইঁহার পিতা সাংসারিক সচ্ছলতা অনুভব করিতে লাগিলেন। এইজন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা-ভগ্নীগণ যখন শিশু ছিলেন, তখন তাঁহার পিতার অবস্থা এমন কিছু উন্নত ছিল না।

তবে তাঁহার পিতা নিজ চেষ্টায় স্থানীয় কিছু বিষয়সম্পত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ নস্কর মহাশয় প্রাপ্তবয়স্ক হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়-কর্ম্মাদিতে পিতার সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইঁহাকে সহায় পাইয়া তাঁহার পিতা যেন হৃদয়ে নবীন উদ্যম অনুভব করিতে লাগিলেন; এবং এরূপ একজন সাহসী, তেজস্বী, বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ পুত্রকে কর্ম্মক্ষেত্রে আপন পার্শ্বে পাইয়া, তিনি চতুর্গুণ উৎসাহ সহকারে বিষয়সম্পত্তির সংস্কার ও সম্বর্দ্ধনে আত্মনিয়োগ করিলেন।

রামকৃষ্ণ প্রথম যৌবনেই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, পৈতৃক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ উন্নতিও তাঁহাকে তৃপ্তিদান করিতে পারে নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উচ্চতর আশা ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পিতার সহিত বিষয়কর্ম্মে ও ব্যবসাদিতে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, তিনি যেন তৃপ্ত হইতে পারিলেন না এবং ঐ কার্য্যের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ রাখিতে পারিলেন না। পিতার নিকট যেন তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিবার পূর্ণ অবসর পাইতেছিলেন না। তাঁহার বিরাট সঙ্কল্প ও কর্ম্মঠ জীবনকে তিনি নিজ ইচ্ছাক্রমে অবাধে কর্ম্মে নিয়োগ করিতে না পারিলে যেন কিছুতেই তৃপ্তি পাইতেছিলেন না। সেই জন্য তিনি নিজদায়িত্বে কোন নূতন কার্য্য আরম্ভ ও পরিচালনের জন্য সর্ব্বদাই সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ একটু উপযুক্ত হইলেই তিনি তাঁহাদিগকে পিতার কার্য্যে সহায়রূপে রাখিয়া, স্বগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে আসিয়া, কোন ব্যবসায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তিনি যখন বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে প্রথমে আসেন, তখন তথাকার অবস্থা এখনকার মত উন্নত ছিল না। এখন বেলিয়াঘাটা পল্লী কলিকাতা

মহানগরীর একাংশ বিশেষ এবং সহরের সকল সমৃদ্ধিতে পূর্ণ। কিন্তু সে সময়ে খাস কলিকাতার বুকেও বিংশ শতাব্দীর ঐশ্বর্য্যময়ী শোভা এরূপভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। বেলিয়াঘাটা তখন একটা নিকৃষ্ট পল্লীরূপেই গণ্য ছিল; তখন এতদঞ্চলের অধিকাংশই জঙ্গলাকীর্ণ ও জনশূন্য অবস্থায় পতিত থাকিত। প্রধান রাস্তাটির দুই পার্শ্বে কেবল কতকগুলি লোকের ফাঁকা ফাঁকা বসতি ছিল। তদ্ভিন্ন ভিতর দিকে লোকের বসতি আদৌ ছিল না বলিলেই হয়। দিবাভাগেও শিবা, বন্য কুক্কুট ও শাখামৃগের কলেবর দৃষ্টিগোচর এবং তাহাদের কলরব শ্রুতিগোচর হইত। সেই সময়ে রামকৃষ্ণ নস্কর মহাশয় বেলিয়াঘাটার প্রায় শেষ প্রান্তে সদর রাস্তার উপরে একটী ছোট বাড়ী ভাড়া লইয়া, তথায় বাস করিতে লাগিলেন এবং ব্যবসায়াদির চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তিনি অসাধারণ পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি একাই সমস্ত ব্যবসায়াদি পরিদর্শন ও স্বহস্তে সমস্ত কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেন। তিনি এত পরিশ্রমী ছিলেন যে, একই সময়ে একাধিক কারবার তিনি একত্রে পরিচালনা করিতেন। ধান্য, চাউল, কাষ্ঠ প্রভৃতি নানাবিধ কারবার তাঁহারই অশ্রান্ত উদ্যম ও তীক্ষ্ণ বস্তুনিষ্ঠ বুদ্ধিবলে গঠিত ও সুপরিচালিত হইতেছিল। এই সকল কারবার উপলক্ষে তাঁহাকে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই কলিকাতাতে বাস করিতে হইত। এই সকল ব্যবসায়াদি কাজকর্ম্মের সুবিধার জন্য এবং নিজ পুত্রকন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রাদির বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে কিছু জমি ক্রয় করিয়া, তদুপরি একখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া, তথায় সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন।

ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নদৃষ্টি নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁহাকে জয়যুক্ত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তিনি কলিকাতার পূর্ব্ববর্ত্তী অঞ্চলের জমিজমা কিছু কিছু করিয়া ক্রয় করিতে লাগিলেন। ওদিকে পৈতৃক সম্পত্তিতে

প্রচুর সমৃদ্ধিসাধন হইতেছিল। তারপর তিনি স্বীয় চেষ্টায় ও অর্থসাহায্যে দুই চারিটী ছোট বড় তালুকও ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তাঁহার পিতার জীবিতাবস্থাতেই রামকৃষ্ণ পৈতৃক সম্পত্তির এরূপ সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা অচিরে ঐ অঞ্চলের একজন প্রভাবশালী জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ ইতোমধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারাই রামকৃষ্ণের নির্দ্দেশ মত পিতার সহিত বিষয়কর্ম্মাদি এতদিন পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। সেই জন্য তিনি তাঁহার কর্ম্মময় জীবনকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকতর সুযোগ পাইয়াছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করা ব্যতীত তিনি পরবর্ত্তী কালে স্বোপার্জ্জিত অর্থে আরও অনেক সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি অপেক্ষা কিছু কম নহে।

প্রথমে তিনি এই সকল ব্যবসায়াদি ও বিষয়কর্ম্মাদি স্বহস্তেই সম্পাদন করিতেন। এই জন্য তাঁহাকে সময় সময় দিবারাত্র সমানভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইত। কিন্তু তাহাতেও তিনি কিঞ্চিন্মাত্র ক্লান্তিবোধ করিতেন না। কার্য্য ছিল যেন তাঁহার হস্তের ক্রীড়নক; পরিশ্রমেই যেন তিনি প্রচুর আনন্দ অনুভব করিতেন। কালক্রমে তাঁহার সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় বিষয়কর্ম্মাদির সাহায্য করিবার জন্য তিনি গগনচন্দ্র সরকার ও অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য নামীয় দুইজন কর্ম্মচারীকে প্রথমে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কর্ম্মচারীদ্বয়ের সহিত তিনি নিজেও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন এবং ৪।৫ জন লোকের কার্য্য তিনি ওই দুইজন মাত্র কর্ম্মচারীর সাহায্যেই সুসম্পন্ন করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে ৺গগনচন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার বিশেষ বিশ্বাসী ও একান্ত স্নেহভাজন ছিলেন। বেলেঘাটার অন্যতম জমিদার শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সরকার ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ উক্ত গগন

চন্দ্র সরকার মহাশয়েরই বংশধর। বর্ত্তমানে ইঁহারাও এতদঞ্চলের বিশেষ সম্মানিত ও ক্ষমতাশালী জমিদার বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। গগনবাবু রামকৃষ্ণ নস্কর মহাশয়ের নিকট চাকুরী করিতে করিতেই কিছু কিছু সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে থাকেন। এই সকল সম্পত্তি-অর্জ্জন বিষয়ে, নস্কর মহাশয় গগন বাবুকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। এই ভাবে গগন বাবুর উন্নতির সূত্রপাত হয় এবং পরে তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া যান।

স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ বাবু বিশেষ বিদ্বান ছিলেন না। তখন ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে বটে, কিন্তু উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। তিনি সামান্য বাংলা লেখাপড়া জানিতেন। মফঃস্বলের জমিদারী ব্যতীত তিনি কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে আরও অনেক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। বেলিয়াঘাটায় তাঁহার প্রথম খরিদা জমিজমা ছাড়া তিনি উক্ত জমির সংলগ্ন আরও কিছু ভূখণ্ড ক্রয় করিয়া, তদুপরি একটী সুবৃহৎ দ্বিতল বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে বসবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময়ে বেলেঘাটার অবস্থা এত উন্নত ছিল না ও অদূর ভবিষ্যতে এই সকল জমির দর বৃদ্ধি পাইবে এরূপ ধারণা ছিল না বলিয়া, তিনি এখানকার সম্পত্তি করা অপেক্ষা মফঃস্বলের জমিদারি বৃদ্ধি করাই বেশী লাভজনক মনে করিতেন। সেইজন্যই বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে বেশী জমিজমা ক্রয় করিবার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। নতুবা তিনি এই অঞ্চলে বিস্তীর্ণ জমিদারির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও মেধাবী ছিলেন। পিতার জীবিতকালেই তিনি পৈতৃক সম্পত্তি ব্যতীত বহুতর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি স্বকৃত চেষ্টায় অর্জ্জন করিয়া

ছিলেন। তাঁহার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকেই সমস্ত সম্পত্তির একজিকিউটর (executor) নিযুক্ত করিয়া যান্। পিতার মৃত্যুর পরও রামকৃষ্ণ বাবু বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমে পৈতৃক সম্পত্তিসমূহের অপ্রত্যাশিত উন্নতি বিধান করিয়া, বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। অনন্ত আত্মবিশ্বাস, অদ্ভুত অধ্যবসায়, উদ্দেশ্যসাধনে অপরূপ নিষ্ঠা ও তৎপরতা ব্যতীত রামকৃষ্ণবাবু অন্যান্য বহু সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন।

মানুষ অপেক্ষাকৃত অসাচ্ছল্যের মধ্য হইতে অল্পদিনের মধ্যে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিলে প্রায়ই অল্পবিস্তর অহঙ্কারী ও সঙ্কীর্ণমনা হইয়া থাকে ; কিন্তু রামকৃষ্ণ বাবু এই নিয়মের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছিলেন। আত্মীয় ও বান্ধবগণের প্রতি তাঁহার ব্যবহার সর্ব্বদা অতি সরল, স্নেহপূর্ণ ও অমায়িক ছিল। দরিদ্র অবস্থার লোক ধনবান আত্মীয়ের সংসর্গে আসিতে কুণ্ঠা-বোধ করেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ নস্কর মহাশয় প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও তাঁহার ব্যবহার এরূপ সৌজন্যপূর্ণ ছিল যে, তাঁহার আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত দীন অবস্থার লোক হইলেও তাঁহার সংসর্গে আসিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেন না, বরং পরম সন্তোষ ও সুখ অনুভব করিতেন। তিনি দানেও মুক্তহস্ত ছিলেন। অনেক নিঃসহায় দীনদরিদ্রকে গোপনে নানাবিধ সাহায্য করিতেন। দরিদ্র আত্মীয়স্বজনের দুঃসময়ে তিনি তাঁহাদিগকে উভয় হস্ত মুক্ত করিয়া দিতেন। স্বগ্রাম ক্ষেয়াদহে তিনি একটী অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে প্রত্যহ বহুদিন পর্য্যন্ত দরিদ্রদিগকে অন্নদান করা হইত।

তিনি একদিকে যেমন অতি বিনয়ী, দয়ালু, সদাশয় ও মহানুভব ছিলেন, অপরদিকে তদ্রূপ তেজস্বী ও দৃঢ়চেতা ছিলেন। যখন যে সঙ্কল্প লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতেন, তাহা যেমন করিয়াই হউক,

সুসিদ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। সহস্র বাধাবিঘ্ন কিছুতেই তাঁহাকে লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না। তিনি যে কিরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প লোক ছিলেন, তাহা একটী মাত্র উদাহরণেই সুস্পষ্ট হইবে।

টাকীর প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার স্বর্গীয় কালীনাথ মুন্সী মহাশয়ের সহিত তাঁহার এক সম্পত্তি লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। অধুনা নস্কর পরিবার প্রতাপশালী জমিদার বটে; কিন্তু তৎকালে তাঁহাদের কেবলমাত্র উন্নতির প্রারম্ভ। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রামকৃষ্ণবাবু কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া, এই পরাক্রান্ত জমিদারের সহিত লড়িতে আরম্ভ করিলেন। এই মোকদ্দমা বহুদিন যাবৎ চলিয়াছিল এবং ক্রমশঃ বিবাদ এরূপ ঘনীভূত হইয়া উঠে যে উভয়পক্ষেরই ভীতির সঞ্চার হয়। অবশেষে ৺ কালীনাথ বাবু বাধ্য হইয়া, তাঁহার সহিত উক্ত মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া লন।

অন্যান্য সদগুণাবলীর সহিত তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও মাতৃপিতৃভক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল; দেবদ্বিজেও তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল তাঁহার পিতামাতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের নামানুসারে শ্রীশ্রী ৺ কুবেরেশ্বর মহাদেব ও শ্রীশ্রী৺ আনন্দময়ী কালীমাতা প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহার বেলেঘাটার বাসভবন-সংলগ্ন ভূমিতে দুইটী সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া যান। সেই জন্য এক্ষণে উক্ত নস্কর-ভবন "জোড়া মন্দির" নামে খ্যাত। উক্ত মন্দিরে নিত্য দুইবেলা ষোড়শোপচারে পূজারতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই দেবসেবার যাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটী না ঘটে, তজ্জন্য তিনি যথোপযুক্ত আয়ের সম্পত্তি উক্ত দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। নিত্য পূজারতি ভিন্ন প্রতি বৎসর ৺ শ্যামাপূজার দিন ও চৈত্রসংক্রান্তিতে মহাসমারোহে উক্ত দেবদেবীর বিশেষভাবে পূজা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার পুত্রের নামে হিন্দুর পুণ্যতীর্থ ৺কাশীধামেও তিনি একটী শিবপ্রতিষ্ঠা

করিয়া, সেখানে একটী মন্দির ও তৎসংলগ্ন একখানি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া যান। সেখানেও দেবতার নিত্যসেবা যথারীতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাঁহার পিতার সময়েও উক্ত কাশীধামে"সোনারপুরা"নামক স্থানে তাঁহাদের একটী বাড়ী ছিল। তিনি স্বগ্রাম ক্ষেয়াদহেও গৃহদেবতার একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া যান। এইরূপে বিভিন্ন স্থানে দেবপূজা ও সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টার উচ্চ নিনাদে প্রত্যহ এই কীর্ত্তিমান নিষ্ঠাবান হিন্দুর পুণ্যগাথা উচ্চরবে নিত্য প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে।

ইহাছাড়া তিনি স্বজাতির উন্নতিকল্পেও যথেষ্ট চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহার সমসাময়িক ২৪ পরগণা জেলার রঙ্গিলাবাদ গ্রাম-নিবাসী স্বর্গীয় বেণীমাধব হালদার মহাশয় যখন স্বজাতীয়ের আত্মমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা ও সমাজনৈতিক উন্নতিকল্পে প্রথম আন্দোলন উত্থাপন করেন, তখন ৺রামকৃষ্ণবাবু তাঁহাকে বহুপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। উক্ত বেণীমাধব হালদার মহাশয় বহুপরিশ্রমে ও শাস্ত্রানুসন্ধানে "জাতিবিবেক" নামে একখানি প্রমাণ্য জাতীয় ইতিহাস প্রণয়ন করেন। কিন্তু তাঁহার আর্থিক অবস্থা বিশেষ উন্নত না থাকায় তিনি উক্ত পুস্তকের মুদ্রনব্যয় বহন করিতে অপারগ হইয়া, রামকৃষ্ণ বাবুর শরণাপন্ন হন এবং রামকৃষ্ণবাবু উক্ত পুস্তক মুদ্রন ও প্রচারের নিমিত্ত বহুতর অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

তাঁহার সময়েই স্বজাতীয় ছাত্রদিগকে নিজবাড়ীতে বিনাব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়ার যে রীতি প্রচলিত হয়, তাহা অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। উমেশচন্দ্র মণ্ডল নামে একটী ছাত্র তাঁহার সাহায্যেই বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উকিল হইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি ওকালতি করিতে পারেন নাই। Licenseএর দরখাস্ত করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁহার একমাত্র পুত্র ৺ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ ক্লাসে অধ্যয়ন করিতে করিতেই পিতার জীবিতাবস্থাতেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। একমাত্র পুত্রের এইরূপ অকালমৃত্যুতে বার্দ্ধক্যের সন্ধিক্ষণে কর্ম্মী রামকৃষ্ণ নিদারুণ মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন এবং সেই সময় হইতে সংসারের প্রতি তাঁহার ঘোর বৈরাগ্য জন্মে। তিনি দেবস্থানে নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তার প্রয়াসী হইয়া, বিষয়কর্ম্মের যাবতীয় ভার ভ্রাতৃগণের উপর ন্যস্ত করিয়া, ৺কাশীধামে প্রস্থান করেন। সেইখানেই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত হয়।

একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তাঁহার আর উত্তরাধিকারী কেহ ছিল না বলিয়া, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজ তৃতায় ভ্রাতা ৺ দয়ালকৃষ্ণ নস্কর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্রকে ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার দ্বিতীয়পুত্র যোগেন্দ্রনাথকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে একটী উইল করিয়া, তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি ইঁহাদিগকে দান করিয়া যান। কিন্তু দত্তক পুত্রদ্বয় তখন শিশু ছিলেন বলিয়া, ইঁহারা সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত তৃতীয় ভ্রাতা দয়ালকৃষ্ণ নস্কর মহাশয়কেই সমস্ত সম্পত্তির একজিকিউটর (Executor) নিযুক্ত করিয়া যান।

এইরূপে রামকৃষ্ণ সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও দৃঢ়সঙ্কল্পের দ্বারা স্বীয় পরিবার ও স্বজাতির প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া, ও পশ্চাতে অক্ষয় নাম ও অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া, ১৩০৬ সালের ভাদ্রমাসে ৺কাশীধামেই দেহত্যাগ করেন।

———

৺হরেকৃষ্ণ নস্কর

রামকৃষ্ণ বাবুর আরও দুই ভ্রাতা ছিলেন। মধ্যম ভ্রাতা হরেকৃষ্ণ বাবু অল্প বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনিও খুব পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী লোক ছিলেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে চেতলায় একটী ধানের আড়ৎ ও নারিকেলডাঙ্গায় একটী কাঠের গোলা ছিল; এবং তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই দুইটী প্রতিষ্ঠান লুপ্ত হইয়া যায়। ইহার একমাত্র পুত্র পার্ব্বতীচরণ ইহার জীবিতাবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

৺দয়ালকৃষ্ণ নস্কর

তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা দয়ালবাবু জ্যেষ্ঠের সদ্‌গুণসমূহের অধিকারী ছিলেন। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া অতীব বুদ্ধিমত্তার সহিত জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক ন্যস্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কঠোর পরিশ্রমী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার জীবিতাবস্থাতেই তিনি বিষয়কর্ম্মাদিতে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। দয়ালবাবু কিছু নব্যভাবাপন্ন লোক ছিলেন, তিনি বেলিয়াঘাটার বাড়ীর সংস্কার সাধন পূর্ব্বক উহা অতি সুদৃশ্য আকারে পরিণত করেন এবং ক্ষেয়াদহেও অতি মনোরম ঠাকুরদালান সমেত সুবৃহৎ নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তিনি আরও অনেক কার্য্য করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার কর্ম্মজীবন অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। প্রৌঢ়ত্বের তোরণদ্বারে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই কালের করাল আহ্বানে তাঁহাকে সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

১৩১০ সালে ৩০শে শ্রাবণ তারিখে তাঁহার দুই অল্পবয়স্ক পুত্র শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্রকে রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারণবাবু সমস্ত সম্পত্তির এক জিকিউটর নিযুক্ত হন।

৺তারণকৃষ্ণ নস্কর

তারণবাবু ১২৬৭ সালে ৫ই ভাদ্র তারিখে কেয়াদহ গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ও অন্যান্য ভ্রাতৃগণের অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত ছিলেন। ইনি এণ্ট্রান্স (Entrance) অবধি পড়িয়াছিলেন; পরীক্ষায় যদিও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু বাংলা ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষাতে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যশঃ ও সম্মানলাভের দিকে তাঁহার সমধিক লক্ষ্য ছিল এবং সাধু ও সুধীজন-সহবাসে তাঁহার তীব্র আকাঙ্খা ছিল। সেইজন্যই তিনি সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ সামাজিক বৈঠক ও সাধারণ প্রতিষ্ঠানাদিতে যোগদান করিতেন এবং তজ্জন্য সময় সময় প্রচুর অর্থব্যয় করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম সোনারপুর থানা হইতে লোকাল বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত তারণবাবু ক্রমান্বয়ে বার বৎসর ধরিয়া মানিকতলা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারই উদ্যমে 'বেলেঘাটা স্বাস্থ্য সমিতির" প্রতিষ্ঠা হয়।

তিনি স্বজাতির উন্নতিকল্পে একান্ত যত্নশীল ছিলেন। স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা স্বাধীন মনোবৃত্তি ও সভ্যতার অভাব তিনি

মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে অপর কেহ এমনভাবে সমাজের ত্রুটী-বিচ্যুতিসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন নাই এবং দেখিলেও তাহা অপনোদনের নিমিত্ত এরূপ কায়মনোবাক্যে আর কেহ কখনও চেষ্টা করেন নাই। স্বজাতির মধ্যে যে সকল সনাতন দোষ-ত্রুটী আছে, তৎসম্বন্ধে সকলে যাহাতে সজাগ হয় এবং তাহার মূলোচ্ছেদের প্রয়াস পায়, তজ্জন্য তিনি প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সমাজের মধ্যে কিছুকাল যাবৎ এই আন্দোলন বিস্তার ও পরিচালনা করিবার জন্য তিনি একটী জাতীয় সমিতি সংস্থাপন করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হইয়া, সমিতির রক্ষণ ও তাহার উন্নতি-কল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই সর্ব্বপ্রথম পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে জাতীয় জাগরণের সাড়া পাওয়া যায়। এই জাতি এ যাবৎ যতটুকু উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ও প্রধান উদ্যোগী যে তারণকৃষ্ণ ছিলেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বজাতীয় যুবকগণের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য তিনি চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের ত্রুটী করিতেন না। স্বজাতীয় ছাত্রগণের থাকিবার জন্য তিনি কলিকাতা বহুবাজার অঞ্চলে একটী দ্বিতল বাটী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার সময়ে বহু ছাত্র সেখানে থাকিয়া উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছেন। স্বগ্রাম ক্ষেয়াদহেও তিনি একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে। এই বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার অধুনা তাঁহার বংশধরগণ বহন করিয়া থাকেন।

স্বদেশী শিল্পের উন্নতি ও অন্নসমস্যার প্রতিবিধান কল্পেও তিনি স্বগ্রামে একটী অবৈতনিক বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তাহার প্রয়োজনীয় যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামাদি নিজ ব্যয়েই প্রস্তুত করাইয়া দেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় বংশধরগণ এই মূল্যবান সাজ-সরঞ্জামাদি

সমস্তই উক্ত কর্ম্মে পারদর্শী জনৈক স্থানীয় ভদ্রলোককে নিঃস্বার্থভাবে প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়াই গ্রামবাসিগণের বয়নশিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। "বস্ত্রবয়ন শিক্ষা" নামক একখানি বয়ন সংক্রান্ত পুস্তকও তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার তৃতীয় পুত্র ৺কাশীনাথ নস্কর মহাশয় উক্ত পুস্তিকার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি "অপূর্ব্ব, মিলন" নামক একখানি উপন্যাস গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। তিনি শেষজীবনে পুরীধামেই থাকিতে ভালবাসিতেন। সেইজন্য সেখানে সমুদ্রোপকণ্ঠে "নস্কর-ভিলা" নামক একখানি বাসোপযোগী বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সন ১৩২৪ সালের ২৮শে বৈশাখ তারিখে এই প্রতিভাবান কর্ম্মীপুরুষ পুরীধামেই দেহত্যাগ করেন।

৺তারণবাবুর পুত্রগণ

তারণকৃষ্ণ বাবু মৃত্যুর সময় চারিপুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া যান। পুত্রগণের নাম যথাক্রমে নগেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ, কাশীনাথ ও বিশ্বনাথ। সুরেন্দ্রনাথ নামে ইঁহাদের আরও এক ভ্রাতা ছিলেন। তিনিই সকলের জ্যেষ্ঠ; বাল্যেই তাঁহার জীবনলীলা সমাপ্ত হয়। এক্ষণে নগেন্দ্রনাথই ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ নস্কর

ইনি ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রমশীল ও কর্ম্মঠ; ইহার শরীরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত খুব বলিষ্ঠ ছিল। ইনি খুব অমায়িক ও লোকপ্রিয়। জমিদার-পুত্র হইয়াও ইনি বিলাসী কিংবা আরামপ্রিয় নহেন। হার কর্ম্মোৎসাহ এবং সহিষ্ণুতা প্রশংসার যোগ্য। ইনি জমিদারী পরিদর্শনার্থ ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য-ব্যপদেশে প্রায়ই মফঃস্বলের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের অন্যতম জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ৺ সারদাপ্রসাদ নস্কর মহাশয়ের জীবিতাবস্থাতেই ইনি বিষয়-কর্ম্মে তাঁহাকে নানাপ্রকার সাহায্য করিতেন। এক্ষণে সারদাবাবুর মৃত্যুর পর হইতে ইনি জ্যেষ্ঠদিগের অনুমত্যনুসারে ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথের সহিত জমিদারীর যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। ইনি বাল্যকাল হইতে খুব শিকারপ্রিয় এবং এই কার্য্যে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। শিকার-কার্য্যে তিনি অতিশয় স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন ইনি এতাবৎ কাল বহু বন্যবরাহ ও কুম্ভীর শিকার করিয়াছেন। স্বহস্তে গাভীপরিচর্য্যা ও উহাদের সুখসুবিধার তত্ত্বাবধান ইহার নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য। যে সকল স্বজাতীয় ছাত্র ইঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়া অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি ইনি সবিশেষ লক্ষ্য রাখেন। তাঁহাদের ব্যায়াম চর্চ্চার জন্য ইনিই যথোচিত সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইনি স্বয়ং ছাত্রদিগকে ব্যায়ামকৌশল শিক্ষা দিয়া থাকেন ও নিজে ছাত্রদিগের সহিত এরূপ অকপটভাবে মিশিয়া ব্যায়াম-চর্চ্চা করেন যে,

ইঁহাদের আশ্রিত ছাত্রগণ ইঁহাকে তাঁহাদেরই একজন ভাবিয়া থাকেন। এক কথায়, জমিদার-পুত্র বলিয়া গর্ব্ব ও অহঙ্কারের লেশমাত্র ইঁহার মধ্যে আদৌ পরিলক্ষিত হয় না।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ নস্কর

ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৺সারদাবাবুর মৃত্যুর পর হইতে ইনিই জমিদারী-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যাবলী নিজে পারদর্শনাদি করিয়া থাকেন। ইনি এরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি-সহকারে জমিদারীর প্রত্যেক কার্য্য নিখুঁতভাবে পরিদর্শন করেন যে, ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে বড় কিছুই দেখিতে হয় না। ইঁহার উপর সমস্ত ন্যস্ত করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন। ইনি বড় কর্ম্মপ্রিয়, আলস্যে জীবন অতিবাহিত করা তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। এই কারণেই ইঁান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের বর্ত্তমানেও বিষয়সম্পত্তি-পরিচালনের গুরুদায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মভার স্বেচ্ছায় নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া অবধি ইনি নিজের কর্ম্মদক্ষতা ও শাসন-সংরক্ষণশক্তির সুন্দর পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছেন। ইনি পূর্ব্বপুরুষের নাম, যশঃ ও পূর্ব্বপ্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জমিদারীর বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। প্রজারা ইঁহাকে যথেষ্ট ভয় ও ভক্তি করিয়া থাকে। ইনি দুর্ব্বার শাসক-রূপে যেমন দুষ্ট প্রজার মনে ত্রাস উৎপাদন করিয়া থাকেন, তেমনই শিষ্ট প্রজার নিকট ইনি স্নেহ-করুণার প্রতিমূর্ত্তি। ইঁহার অন্তঃকরণ অতি উদার ও সৌজন্যপূর্ণ। প্রজাদের দুঃখ-দারিদ্র্যে তাঁহাদিগকে সাহায্য-প্রদানেও ইনি মুক্তহস্ত।

ইনি কিছু সৌখীন প্রকৃতির লোক। নূতন নূতন আসবাবপত্র,

বহুমূল্য চিত্রাদি সংরক্ষণ ও নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য ফলফুলের বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য ইনি অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন না। গৃহের ভিতর-বাহির যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা ইঁহার তীক্ষ্নদৃষ্টি। ইনি সুধীজনসঙ্গ বড় ভালবাসেন। বর্ত্তমানে তিনি আলিপুর মহকুমার অন্তর্গত ভাঙ্গড় থানা হইতে লোক্যাল বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি অত্যন্ত আত্মসম্মানজ্ঞানী হইলেও সবিশেষ বন্ধুবৎসল ও পরহিত-পরায়ণ। কলিকাতার বহুবাজারে "সেণ্ট্রাল ক্লাব" (Central Club)নামে সাধারণের জন্য একটী পাঠাগার ও ক্রীড়া-বৈঠক প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাতে সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়া থাকে। এই ক্লাবের পরিচালন-কল্পে ও সদস্যগণের অবকাশবিনোদনের জন্য যোগেনবাবু যথেষ্ট শ্রমস্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়া থাকেন।

৺কাশীনাথ নস্কর

ইঁহাদের তৃতীয় ভ্রাতা কাশীনাথ বাবুও বেশ কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমী যুবক ছিলেন। কলাবিদ্যায় ও অভিনয় প্রভৃতিতেও ইনি বেশ পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু ইনি অল্প বয়সেই একটী মাত্র পুত্রসন্তান রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ নস্কর

বিশ্বনাথবাবু সর্ব্বকনিষ্ঠ এবং ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ ও বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইয়া মহামান্য হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি চেম্বার্স (Chambers) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টের এডভোকেট (Advocate) শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ইনিও অত্যন্ত নিরহঙ্কার, শান্তিপ্রিয় ও সামাজিক প্রকৃতির লোক। ভগবান ইঁহার কর্ম্মজীবনকে জয়-মণ্ডিত করিয়া বংশের নাম উজ্জ্বল করুন।

৺ সারদাপ্রসাদ নস্কর

স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ নস্কর মহাশয়ের চতুর্থ ভ্রাতা ৺ উদয়কৃষ্ণ নস্কর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ছিলেন সারদাপ্রসাদ নস্কর। তিনি পরে একজন বিখ্যাত জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি ১২৮৭ সালে ২০শে চৈত্র তারিখে ক্ষেয়াদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও শৈশবেই পিতৃহারা হন। তাঁহার পিতা বিষয়কর্ম্ম-উপলক্ষে প্রায়ই মফঃস্বলে কাটাইতেন। দুর্গাপুরে যে বিস্তীর্ণ জমিদারী ইঁহাদের আছে তাহা উদয়কৃষ্ণবাবুই বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া শাসন-সংরক্ষণ করিতেন। সেই আবাদে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং সেই ভগ্নস্বাস্থ্য তিনি আর পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। তিনি অতি সরলপ্রকৃতি, আড়ম্বরহীন ব্যক্তি ছিলেন। নিজের স্বার্থের দিকে বড় লক্ষ্য করিতেন না। ভ্রাতৃসাধারণের হিতার্থ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া, বিষয়াদির উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

সারদাবাবু বাল্যকালে পিতৃহারা হইয়াও নিজের চেষ্টা-যত্নে ও বুদ্ধিমত্তায় নিজের আর্থিক অবস্থার বহুল উন্নতি সাধন করেন। তিনি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলেও বাঙ্গালা ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি অতীব বুদ্ধিমান ও ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে বিষয়-সংক্রান্ত কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল। জ্যেষ্ঠতাত দয়ালবাবুর বর্ত্তমানাবস্থাতেই তিনি স্বহস্তে

জমিদারীর বহুবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। দয়ালবাবুও তাঁহার প্রখর বিষয়বুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে সযত্নে বিষয়কর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি অল্পদিনেই বিষয়কর্ম্মে সম্পূর্ণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

দয়ালবাবুর পর তারণবাবু জমিদারীর এক্‌জিকিউটর নিযুক্ত থাকিলেও জমিদারী-সংক্রান্ত কার্য্যাদি তিনি প্রায় নিজ হস্তে সম্পন্ন করিতেন। রামকৃষ্ণবাবুর পূর্ব্বপ্রতাপ তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার প্রতাপে সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। তাঁহার প্রকৃতিতে সর্ব্বদা এমন একটা অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিত যে, কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই তাঁহাকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু তাঁহার এই গম্ভীর প্রকৃতির অব্যবহিত নিম্নেই অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত সতত যে সহৃদয়তার স্রোতঃ প্রবাহিত ছিল, তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তাঁহার সহিত অল্পকালের ব্যবহারেই অনুভব করিতে পারিতেন। তাঁহার প্রকৃতিতে বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি যদিও সামান্য কারণে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন, তথাপি পরক্ষণেই এই উত্তেজনার ভাব তিরোহিত হইয়া এমন এক প্রশান্ত ধৈর্য্য ও অতল অনুকম্পার ভাব ফুটিয়া উঠিত যে, লোকে তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। অনেক সময় তিরস্কৃত ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাঁহার হৃদয় বিস্মিত শ্রদ্ধায় আপ্লুত হইয়া পড়িত।

তিনি অতীব প্রতাপশালী ছিলেন বলিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার কদাচিৎ করিতেন। সহজে ক্রোধপরবশ হইয়া পড়িলেও সুযুক্তির নিকট তিনি সর্ব্বদা মাথা নত করিতেন। খুব সামাজিক প্রকৃতির না হইলেও সৌজন্যের তিনি আদর্শ ছিলেন। তাঁহার দাক্ষিণ্যও যথেষ্ট ছিল। তিনি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে বহু দীন-দুঃখীকে সাহায্য করিতেন। স্বজাতীয় ছাত্রগণের শিক্ষোন্নতি-বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ উৎসাহ ছিল।

স্বজাতীয় যুবকগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার সময়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই তাঁহার উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়াছেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের উজ্জ্বল রত্ন শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ মণ্ডল যিনি এই সমাজের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম গ্লাস্‌গো ইউনিভার্সিটী (Glasgow University) হইতে গৌরবের সহিত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (Civil Engineering) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত ইউনিভার্সিটীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তিনিও বিলাতে শিক্ষালাভের জন্য যাত্রার প্রাক্কালে ইঁহার নিকট সাহায্য-লাভে বঞ্চিত হন নাই।

অধুনা স্বর্গীয় সারদাবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ স্বজাতীয় ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে ১০।১১ জন স্বজাতীয় ছাত্র তাঁহাদের বেলেঘাটার বাড়ীতে আহার ও বাসস্থান পাইয়া স্কুল ও কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে। প্রায় প্রতি বৎসরই ৩।৪ জন স্বজাতীয় ছাত্র তাঁহাদের বাড়ী হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়া থাকেন। তাহা ছাড়া তাঁহাদের বাড়ীতে থাকেন না এমন বহু ছাত্র পরীক্ষার পুস্তক প্রভৃতি বাবদ অর্থসাহায্য পাইয়া থাকে। শুধু স্বজাতি ছাড়া স্বজাতীয় ব্রাহ্মণগণের ভরণপোষণ ও শিক্ষার নিমিত্তও তাঁহাদের ধনাগার অকাতরে উন্মুক্ত হয়। সারদাবাবু দুষ্টের নিকট যেমন বজ্রের ন্যায় কঠোর ছিলেন, তেমনই আবার শিষ্টের নিকট কুসুমের ন্যায় কোমল ছিলেন। তিনি আশ্রিতের ভয়ত্রাতা ছিলেন; যাহাকে একবার অভয় প্রদান করিতেন নিজের সমূহ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেন। এই মহৎ গুণের জন্য তাঁহার আশ্রিত বহু ব্যক্তি তাঁহার বড় অনুগত ছিল। এরূপ প্রতাপশালী জমিদারকে পাইয়া পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ যথার্থই গৌরব অনুভব করিত। তিনি ৬ বৎসর যাবৎ সোনারপুর থানা হইতে আলিপুর লোক্যাল বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত ছিলেন।

শেষ দিকে তাঁহার স্বাস্থ্য বড় ভাল ছিল না। সেইজন্য তিনি যৌবনান্তে অধিকাংশ সময়ই পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থান করিতেন। মধুপুরেই তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল থাকিত বলিয়া প্রায়ই তথায় বাস করিতেন। সেখানে বাসের সুবিধার জন্য "নস্কর ভিলা" নামে একখানা বাড়ীও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মধুপুরের নিকটবর্ত্তী ৺ বৈদ্যনাথধামেও একটী বাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া, তাহা সম্পূর্ণ না হইতেই তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন। এইরূপে ৪৪ বৎসর বয়সে ১৩৩১ সালের ১৫ই বৈশাখ তারিখে তাঁহার একমাত্র নাবালক পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ ও দুই কন্যা রাখিয়া সারদাপ্রসাদ সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র নস্কর

সারদাবাবুর মৃত্যুর পর হইতে শরৎবাবুই এক্ষণে জীবিত ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। ইঁহারই নির্দ্দেশানুসারে ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ এক্ষণে বিষয়কর্ম্ম পরিদর্শনাদি করিয়া থাকেন। শরৎবাবু জ্যেষ্ঠের বড় অনুগত ছিলেন। সেইজন্য সারদাবাবুও ইঁহাকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ইনি বড় সদালাপী ও লোকপ্রিয়। ইঁহারই চেষ্টায় নস্কর-চ্যালেঞ্জ শিল্ড (Naskar Challenge Shield) নামে ফুটবল খেলার একটা শিল্ড প্রচলিত রহিয়াছে। ৺সারদাবাবুর স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় তিনি লোক্যাল বোর্ড ছাড়িয়া দিলে শরৎবাবু কয়েক বৎসর যাবৎ সোনারপুর থানা হইতে লোক্যাল বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত ছিলেন। বন্ধুবৎসল ও আশ্রিতরক্ষক বলিয়া শরৎবাবুরও যথেষ্ট খ্যাতি আছে অভিনয়-কলায় ইনি অপূর্ব্ব পারদর্শী। এক সময় ইনি বহু অর্থব্যয়ে একটী সখের সম্প্রদায় গঠন করিয়া, ইহার পরিচালনকল্পে প্রভূত অর্থ-ব্যয় করিয়াছিলেন। ইনি ভ্রমণ-বিলাসীও বটেন। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্যস্থানসমূহ ও বদরিকাশ্রম, দ্বারকা, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি

দূরবর্ত্তী দুর্গম তীর্থক্ষেত্রনিচয় তিনি সবান্ধবে দর্শন করিয়া বেড়াইয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি বর্ত্তমানে এক প্রকার অবসরময় জীবন যাপন করিতেছেন।

শরৎবাবু ভগ্নস্বাস্থ্যবশতঃ লোক্যাল বোর্ড ছাড়িয়া দিলে, অধুনা ইঁহাদের ভাগিনেয় শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল মহাশয় উক্ত সোণারপুর থানা হইতে লোক্যাল বোর্ডের সদস্য ও ২৪ পরগণা জেলা-বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান-পদে নিযুক্ত আছেন। শরৎবাবু স্বজাতির উন্নতিকল্পে বহু চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইনি একজন সদালাপী ও সুবক্তা। অনেক সভা-সমিতিতে যোগদান পূর্ব্বক স্বজাতির উন্নতির সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা করিয়া থাকেন এবং আশাপ্রদ বক্তৃতা দ্বারা সকলকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে ইঁহার তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ উপেন্দ্রনাথ গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটী হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে স্বাধীনভাবে কোন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইনি একজন পাকা ক্রীড়াপটু (Sportsman)। ফুটবল, হকী খেলা ইত্যাদিতে ও শিকারে ইঁহার খুব উৎসাহ। শরৎবাবুর মধ্যম পুত্র নৃপেন্দ্রনাথও একজন বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ যুবক। অভিনয়-কলায় তিনি বেশ পারদর্শী; খেলাধূলায়ও তাঁহার খুব খ্যাতি ও বন্ধুমহলে প্রতিপত্তি আছে

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর

এই বংশের মধ্যে হেমবাবু একজন প্রখ্যাতনামা পুরুষ। ইনি স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ নস্কর মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতা ৺দয়ালকৃষ্ণ নস্কর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ও শরৎবাবুর সহোদর ভ্রাতা। রামকৃষ্ণ নস্কর মহাশয়ের একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় তিনি ইঁহাকে তাঁহার দত্তকপুত্ররূপে

গ্রহণ করেন। সুধীজনসমাজে হেমবাবুর যথেষ্ট খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সম্মান ও সমাদর আছে। ইনি অল্পবয়সে যেরূপ সুনাম ও সুযশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহাকে "স্বনামধন্য" আখ্যা দেওয়া অতিশয়োক্তি অলঙ্কার নহে। ২৪ পরগণা, খুলনা প্রভৃতি জেলার নিভৃত পল্লীর কৃষিজীবী হইতে কলিকাতা সহরের সুশিক্ষিত লোকও ইঁহার নামের সহিত পরিচিত। কেবল তাহাই নহে, সমগ্র বাঙ্গালার অভিজাত ও ভূস্বামী-সমাজে হেমবাবুর নাম না শুনিয়াছেন এমন লোক নাই বলিলেই হয়। নিজের সদ্‌গুণাবলী দ্বারা তিনি দেশের লোকের শ্রদ্ধা-প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং সরকারী ও বে-সরকারী নানাবিধ সম্মানার্হ পদে অভিষিক্ত থাকিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন।

ইনি সাত বৎসর যাবৎ মাণিকতলা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার নিযুক্ত ছিলেন এবং আট বৎসর পূর্ব্বে মাণিকতলা মিউনিসিপ্যালিটী কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নূতন আইন অনুযায়ী তিনি গত ছয় বৎসর যাবৎ কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন। স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রবর্ত্তিত নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেশনের প্রথমবারের নির্ব্বাচনে ইনি কর্পোরেশনের ৫ জন অল্‌ডারম্যানের মধ্যে অন্যতম অল্‌ডারম্যান্ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ইনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভাঙ্গড় থানা হইতে লোকাল বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত ছিলেন। অধুনা তদীয় ভ্রাতা যোগেনবাবুই উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইনি ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের মেম্বর নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন।

এইসকল লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বমূলক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া হেমবাবু সর্ব্বদাই জনসেবার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন এবং ব্যক্তিবিশেষের

বা সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণ দলনীতির (Party Politics) সহিত নিজেকে সংশ্লিষ্ট করেন নাই। হিন্দু মুসলমান সকলেরই অভাব-অভিযোগের প্রতীকারের জন্য ইনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট। ইঁহার লোক-নির্ব্বিশেষে অসাধারণ অমায়িকতা ও সদ্গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া দেশবাসিগণ ইঁহাকে সাদরে তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে আট বৎসর যাবৎ তিনি ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রত্যেক নির্ব্বাচনের সময়ই আলীপুর সদর মহকুমা হইতে ইনি সগৌরবে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ ইনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-পদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি এই পদে যতদিন অভিষিক্ত ছিলেন, ততদিন দেশবাসীর উপকারার্থ বহুবিধ প্রশ্ন উত্থাপন ও প্রস্তাব মঞ্জুর করাইয়া বিশেষ লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন। নিঃস্বার্থভাবে দেশবাসীর উপকারার্থ ইনি এই সভায় যোগদান করেন এবং দেশবাসীর ইঙ্গিত পাইয়াই স্বচ্ছন্দে এই লোভনীয় পদ পরিত্যাগ করেন। ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন সভ্য বহু অর্থ অনাবশ্যকরূপে পাথেয়স্বরূপ গ্রহণ করিতেন; ইঁহারই চেষ্টায় সেই অর্থগ্রহণের বিষয় দেশবাসীর গোচরীভূত হয় এবং অতঃপর সভ্যগণ সাবধান হন।

ইহা ছাড়া ইনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত শিয়ালদহ পুলিশ কোর্টের অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত হইয়া দক্ষতার সহিত বিচারকার্য্য করিয়া আসিতেছেন। বহু জটিল ফৌজদারী মোকদ্দমা ইঁহার এজলাসে বিচারার্থ প্রেরিত হয়। এযাবৎ ইঁহার নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম বিচারের বিরুদ্ধে কোন পক্ষেরই অনুযোগের কারণ ঘটে নাই।

ইনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এবং এইরূপ নানাবিধ সম্মানে

বিভূষিত হইলেও ইঁহার চরিত্রে মাৎসর্য্যের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। ইঁহার অমায়িক, মধুর ও অনাড়ম্বর ব্যবহারে কি ইতর,কি ভদ্র সকলেরই হৃদয় ইঁহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। যে সকল ব্যক্তি ইঁহার সহিত আলাপ করিতে নিতান্ত সঙ্কোচ বোধ করেন, তাঁহাদের সহিতও ইনি এরূপ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেন যে, তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া যায়। এই কারণে সকলে নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকট আসিয়া আপনাদের মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারেন। ইনি নিজ কর্ম্মচারী এবং এমন কি, সামান্য ভৃত্যের প্রতিও এমন সৌহার্দ্দ্য-পূর্ণ আচরণ করিয়া থাকেন যে, সকলেরই হৃদয় আপনা হইতে তাঁহার প্রতি ভক্তিতে নত হইয়া পড়ে। ইনি এরূপ করুণার্দ্রচিত্ত যে, লোকের সামান্য একটু কষ্ট দেখিলেই অধীর হইয়া পড়েন। অপরাধী ও অনিষ্ট-চিন্তাকারিগণের প্রতিও ইনি কখনও রূঢ় হইতে পারেন না; বরং তাঁহাদের প্রতি এরূপ সহৃদয় আচরণ করেন যে, তাঁহারা অনিষ্ট চিন্তা করা দূরে থাকুক, ছুটিয়া আসিয়া ইঁহারই আশ্রয়-লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে। যে সকল ছাত্র ইঁহার অন্নে প্রতি-পালিত হইয়া ইঁহারই গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকেও ইনি পুত্রের ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে হেমবাবু একটী প্রকৃত রত্নস্বরূপ। ইঁহার নামে শুধু নস্কর-বংশ নহে—সমগ্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজই গৌরব অনুভব করিয়া থাকে। ২৪ পরগণা, খুলনা প্রভৃতি জেলার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় আজ একযোগে পরমযত্নে ইঁহাকে এই সমাজের নেতা বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে। সমগ্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি আজ ইঁহার বাক্য যেন বেদবাক্যরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। সুদূর নিভৃত পল্লীর স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ যাঁহারা ইঁহাকে কখনও চক্ষে দেখেন নাই, তাঁহারাও ইঁহার নাম শুনিয়া শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিয়া থাকেন।

স্বজাতির উন্নতিকল্পে ইঁহার চেষ্টা ও যত্নের অন্ত নাই। স্বজাতীয় সভাসমিতির সভাপতিত্ব করিতে আহূত হইলে, ইনি অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও অতি দুর্গম স্থানে পর্য্যন্ত যাইতে পরম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। তথায় সময়োচিত উপদেশ ও বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃ-মণ্ডলীর হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়া থাকেন। স্বজাতির একনিষ্ঠ হিতৈষী পণ্ডিত স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় যে জাতীয় পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে ইনি প্রচুর অর্থসাহায্য করিতেন। সমাজ-সেবায় ইনি স্বর্গীয় মহেন্দ্রবাবুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। ৺ মহেন্দ্রবাবু "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ" ও "A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods" নামে যে দুইখানি বৃহৎ জাতীয় ইতিহাস-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার প্রকাশ ও মুদ্রণের সাহায্যের নিমিত্ত মহেন্দ্রবাবু হেমবাবুর শরণাপন্ন হইলে, ইনি উক্ত পুস্তক প্রকাশের জন্য তাঁহাকে প্রভূত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন স্বজাতির সেবায় ইনি অশেষ প্রকার ক্লেশ স্বীকার ও প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া থাকেন।

হেমবাবুর ব্যবহার যেরূপ অনাড়ম্বর, বেশভূষাও সেইরূপ সাদাসিধা। কর্পোরেশনের কাউন্সিলের সদস্য ও বিল্ডিং কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট-পদে সমাসীন থাকিয়া, ইনি স্বীয় আবাসপল্লী বেলেঘাটার রাস্তাঘাট, জল, আলো ও পৌরজনের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা-বৃদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কোন কোন কাউন্সিলরের গৃহে অল্পপরিচিত বা অপরিচিত করদাতা কোন অভিযোগ লইয়া উপস্থিত হইলে, সকল সময়ে সাদরে গৃহীত হইতে নাও পারেন; কিন্তু হেমবাবুর হৃদয় ও বাসভবনের দ্বার উভয়ই সর্ব্বদা সকলের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত। এজন্য সকাল-সন্ধ্যায় ইঁহার গৃহে অর্থী, প্রার্থী ও

আগন্তুকের ভিড় নিত্যই লাগিয়া আছে। পূর্ণ হতাশা বুকে লইয়া বিশুষ্কবদনে কাহাকেও বড় একটা ফিরিয়া যাইতে হয় না।

হেমবাবুর আর একটী উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি "আনন্দময়ী নাট্যমন্দির।" বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে ইনি ইঁহার বেলিয়াঘাটা-ভবন-সংলগ্ন ভূমিতে উক্ত নামে বিরাট প্রেক্ষাগৃহ ও রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। ইঁহার গৃহে "Naskar Family Library" নামে এক সুসজ্জিত পাঠাগার স্থাপিত ও "নস্কর বান্ধব সম্মিলনী" নামে একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমী, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, সরস্বতী পূজা, শিবরাত্রি, চড়কপূজা প্রভৃতি উপলক্ষে এই সমিতির সভ্যগণ অভিনয় করিয়া থাকেন। এই সকল অভিনয় সখের সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত হইলেও পেশাদারী থিয়েটার অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট হয় না এবং বহু দূর-দূরান্তর হইতে অনাহূতভাবে বহু দর্শক আসিয়া ইঁহাদের অভিনয় দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া যান। হেমবাবু এখনও অপুত্রক। পূর্ব্বে ইঁহার একটী কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া দুই বৎসর বয়সে মারা যায়। কিন্তু পাড়ার সব ছেলেমেয়েই ইঁহার স্নিগ্ধ স্নেহ-বিচ্ছায়ে আসিয়া যেমন অপূর্ব্ব সান্ত্বনা পায়, তেমনিই ইঁহাকে সন্তানাভাব উপলব্ধি করিবার অবসর দেয় না। সেইজন্য ইনি পাড়ার সবুজ সম্প্রদায়ের সাধারণ "কাকাবাবু"। ইঁহার বর্ত্তমান বয়স ৪২ বৎসর। হেমবাবু বর্ত্তমান বর্ষেও কাউন্সিলর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা, ইনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া, এইরূপে দেশ ও দেশের সেবায় নিরবচ্ছিন্নভাবে নিযুক্ত থাকুন।

নস্কর-বংশ-লতিকা

৺কালীপ্রসাদ
৺সন্তোষকুমার
৺দুলালচাঁদ
৺কালাচাঁদ
৺দশরথ
৺রাজবল্লভ
(উত্তরা)
৺বাসুদেব
(অভয়া)
গৌরমোহন
৺নন্দকুমার
ফতুচন্দ্র [কুবেরচন্দ্র বা জনার্দ্দন]
(আনন্দময়ী)
পুঁটীরাম

ফতুচন্দ্র
(আনন্দময়ী)
৺রামকৃষ্ণ
(মনোমোহিনী
সৌদামিনী)
৺হরেকৃষ্ণ
(ভবতারিণী)
৺ পার্ব্বতীচরণ
(বরদাময়ী)
৺দয়ালকৃষ্ণ
(সৌরিন্দ্রী ও গুণমণি)
৺উদয়কৃষ্ণ
(পরশমণি)
৺তারণকৃষ্ণ
(কামিনী)
৺সারদাপ্রসাদ
(হেমাঙ্গিনী)
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ
শ্রীশরচ্চন্দ্র
(শ্বেতাঙ্গিনী)
*শ্রীহেমচন্দ্র
(প্রবোধবালা)
৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ
*শ্রীহেমচন্দ্র
(প্রবোধবালা)
*শ্রীযোগেন্দ্রনাথ
(যোগেশ্বরী)
অর্দ্ধেন্দু
নবেন্দু
পূর্ণেন্দু
অমলেন্দু
বিমলেন্দু
৺ভূপেন্দ্র
উপেন্দ্র
(আশালতা)
শিশুকন্যা ও পুত্র
নৃপেন্দ্র
(রাধারাণী)
রব

- পুঁটিরাম
  - অবিনাশ
  - ননী
  - খগেন্দ্র
  - হাবুল
  - ধীরেন
    - পাঁচু
  - মাণিক
  - রতন

- ৺তারাশঙ্কর (কামিনী)
  - ৺সুরেন্দ্র
  - শ্রীনগেন্দ্রনাথ (উষাঙ্গিনী)
    - শরদিন্দু
    - ৺ফিটু
    - অরবিন্দ
  - *শ্রীযোগেন্দ্রনাথ (যোগেশ্বরী)
  - ৺কাশীনাথ (কুমুদিনী)
    - ৺ভাটু
    - ক্ষিতীন্দ্র
  - শ্রীবিশ্বনাথ (প্রভাবতী)
    - শিশুপুত্র

স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার দত্ত

ব্যবসায়-জগতে প্রসিদ্ধ স্বনামধন্য কর্ম্মবীর প্রসন্নকুমার দত্ত মহাশয় কায়স্থ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের আদিনিবাস ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত মৃগাছাতরা গ্রামে। তথা হইতে তাঁহারা পরে তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী শ্যামপুর গ্রামে বসবাস স্থাপন করেন।

তিন বৎসর বয়সের সময় প্রসন্নকুমারের মাতৃদেবী পরলোক গমন করেন; তাঁহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, সেই সময়ে তাঁহার পিতৃদেবেরও মৃত্যু হয়। মাতৃপিতৃহীন বালককে তাঁহার পিতৃব্য সূর্য্যকুমার দত্ত মহাশয় হাওড়ায় লইয়া আসেন। নৌকাযোগে তাঁহারা শ্যামপুর হইতে হাওড়ায় আসিতেছিলেন; পথিমধ্যে ভাগীরথীতে নৌকা ডুবিয়া যায়। একখানি ষ্টীম লঞ্চ তাঁহাদিগকে উদ্ধার করে; নহিলে তাঁহাদের সলিল-সমাধি হইত।

প্রসন্নকুমারের পিতৃব্য সূর্য্যকুমার হাওড়ার নিকটবর্ত্তী সালিখার লবণ-গোলায় কেরাণীর কার্য্য করিতেন। সেইজন্য তাঁহাকে সপরিবারে হাওড়াতে থাকিতে হইত। প্রসন্নকুমারকে হাওড়ায় আনিবার কারণ—তিনি এই পিতৃমাতৃহীন বালককে কিছু লেখাপড়া শিখাইবেন এবং পরে লবণ-গোলায় চাকরী করিয়া দিয়া তাহার একটা কিনারা করিয়া দিবেন।

বালক প্রসন্নকুমার পিতৃব্যের আশ্রয়ে থাকিয়া সবিশেষ মনোযোগ-সহকারে লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহও বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। রাত্রিতে বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হইলে তিনি দাসীর নিকট হইতে রেড়ীর তৈল চাহিয়া লইতেন এবং গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন।

প্রসন্নকুমারের বয়স যখন ১৫ বৎসর, সেই সময়ে তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে লবণ-গোলায় চাকুরী লইতে বাধ্য করেন। পড়াশুনা ছাড়িয়া এত অল্প বয়সে চাকুরী করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু পিতৃব্যের আদেশ তিনি উপেক্ষা করিলেন না। তিনি চাকুরী করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সেই সঙ্গে অবসর পাইলেই বন্ধু-বান্ধবের নিকট যাইয়া ইংরাজী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। শিবপুর-নিবাসী সব জজ অমৃতলাল পাল মহাশয় প্রসন্নকুমারের বিদ্যাশিক্ষায় অনুরাগ ও আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে সবিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। প্রসন্নকুমার তাঁহার নিকটে ইংরাজী শিখিলেন এবং তাঁহার জনৈক মুসলমান বন্ধুর নিকটে আরবী ভাষা শিক্ষা করিলেন।

১৮ বৎসর বয়সের সময়ে প্রসন্নকুমার ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হাওড়া ষ্টেশনে কেরাণী নিযুক্ত হন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও সাধুতার জন্ম তিনি শীঘ্রই ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ২০ বৎসর বয়সেই তাঁহার পদোন্নতি ও তৎসহ তাঁহাকে এলাহাবাদে বদলি করা হয়। এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে প্রসন্নকুমারের কর্ত্তব্য-বোধ, দায়িত্বজ্ঞান ও সর্ব্বোপরি সাধুতার বিষয় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত হয়।

ঘটনাটি এই:—একদিন সন্ধ্যার সময়ে গবর্ণমেণ্টের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর কক্ষে একটি পার্শেল বা পুলিন্দা ভুলিয়া ফেলিয়া যান। এলাহাবাদে এক কুলী ট্রেণের এই কক্ষটি পরিষ্কার করিবার সময় পার্শেলটি পায়। ইহা দেখিয়া কুলীর ধারণা হয় যে, ইহার ভিতর মূল্যবান্ জিনিস আছে। তখনই সে পার্শেলটী আনিয়া প্রসন্নবাবুর হাতে দেয় এবং রেলওয়ের অন্যান্য কর্ম্মচারীকেও সে এই কথা বলে। ইহা শুনিয়াই এই কর্ম্মচারীরা প্রসন্নবাবুর নিকট ত্বরিতপদে আসেন এবং বলেন,—"পার্শেলটীর মা বাপ কেউ নাই; আসুন, এটাকে ভেঙ্গে ফেলে

এর ভেতর যা আছে আমরা ভাগ-বাটোয়ারা করে নিই।" প্রসন্নকুমার ঘৃণার সহিত এই হীন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন এবং স্বয়ং পার্শেলটী লইয়া লোহার সিন্দুকের ভিতর রাখিয়া চাবি দেন। তার পর সেই চাবিটী ষ্টেশনের অধ্যক্ষের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং তৎসহ পত্রদ্বারা তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক জ্ঞাপন করেন।

রাত্রি সাড়ে এগারটার সময়ে প্রসন্নকুমারের হাতের কাজ শেষ হয়। তিনি তখনই বাসায় যাইবার জন্য বাহির হন। তাঁহার বাসা সেখান হইতে প্রায় দেড় মাইল। পথে যাইতে যাইতে তিনি কোনওরূপে জানিতে পারেন যে, কতকগুলি লোক তাঁহাকে ধরিবার জন্য রাস্তায় লুকাইয়া আছে; তাঁহার সন্দেহ হয়—উহারা তাঁহাকে গুম্ করিতে পারে। সেইজন্য তিনি বাসার দিকে না গিয়া এক-দৌড়ে পুনরায় ষ্টেশনে ফিরিয়া আসেন এবং পুলিশকে সংবাদ দেন। অতঃপর পুলিশের সাহায্যে তিনি বাসায় চলিয়া যান। পরদিন ভোর ৪টার সময়ে ষ্টেশনে তাঁহার কাজ। বাসা হইতে তিনি যথাসময়েই ষ্টেশন-অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু জানিতে পারেন যে, তখনও তাঁহাকে ধরিবার জন্য এক দল লোক ওৎ পাতিয়া আছে। এই কারণে প্রসন্নকুমার অন্য পথ ধরিয়া অনেক ঘুরিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হন। ইহাতে আফিসে আসিতে তাঁহার প্রায় ১০ মিনিট বিলম্ব হইয়া যায়। যাহা হউক, ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াই তিনি একমনে আফিসের কাজ করিতে প্রবৃত্ত হন। এদিকে পুলিশ সমস্ত ঘটনা ষ্টেশনের অধ্যক্ষ-মহাশয়ের গোচর করে। ইহা শুনিবামাত্র তিনি অবিলম্বে প্রসন্নকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। আসিয়া দেখেন—প্রসন্নকুমার নিবিষ্টমনে কর্ম্মে ব্যাপৃত; তাঁহার উপরিওয়ালা যে, তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—ইহা তিনি জানিতে পারেন নাই। এত বড় ব্যাপার যে হইয়া গিয়াছে, ষড়যন্ত্রে যে তাঁহার প্রাণহানি পর্য্যন্ত ঘটিতে পারিত—

প্রসন্নকুমার এ সকল ভাবনা মন হইতে দূর করিয়া একান্তচিত্তে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন। ৫।৭ মিনিট কাল ষ্টেশনের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। যে কাজটি তিনি করিতেছিলেন তাহা শেষ হইবামাত্র অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার পৃষ্ঠে মৃদু করস্পর্শ করিলেন; তখনই প্রসন্নকুমার চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন—তাঁহারই উপরওয়ালা তাঁহারই পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; প্রসন্নকুমার সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার নিকট ত্রুটি স্বীকার করিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় বলিলেন,—"প্রসন্নবাবু! আপনি আপনার কাজ করিতে থাকুন। সমস্ত ব্যাপার আমি শুনিয়াছি। আমি কার্য্য হইতে আপনার মনোযোগ ভঙ্গ করিতে আসিতাম না; কেবল আসিয়াছি আপনাকে এই কথাটি জানাইতে যে, আপনার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সাধুতার পুরস্কার আপনি পাইবেন; যে পার্শেলটী আপনি লোহার সিন্ধুকে রাখিয়াছিলেন তাহার ভিতর ৫০ হাজার টাকা মূল্যের সোনা ছিল এবং যে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ এই পার্শেলটী ভুলিয়া ট্রেণে ফেলিয়া গিয়াছিলেন উহা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে।"

দুই একদিন পরেই উক্ত রাজপুরুষ ষ্টেশনের অধ্যক্ষকে একখানি পত্র লিখেন। সেই পত্রে প্রসন্নবাবুর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সাধুতার প্রভূত প্রশংসা করেন [illegible] পুরস্কারস্বরূপ একখানি ৫০০৲ টাকার চেক প্রসন্নবাবুকে দিবার জন্য চিঠির ভিতরে পাঠাইয়া দেন। প্রসন্নবাবু এই বলিয়া সেই চেক লইতে অসম্মত হন যে, আমি আমার কর্ত্তব্যই পালন করিয়াছি, সুতরাং এই চেক আমার পক্ষে অবাঞ্ছনীয় প্রলোভন। সেইজন্য আমি ইহা আপনাকে ফেরত পাঠাইতেছি। আশা করি, এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এই ঘটনার [illegible] তুষ্ট হ[illegible] রেলওয়ে কোম্পানীর এজেন্ট

প্রসন্নকুমারের পদোন্নতি করিয়া দিলেন—তিনি উচ্চতর পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার চক্ষুর পীড়া হইল। সেই জন্য তিনি ৬ মাসের ছুটী লইয়া হাওড়ায় চলিয়া আসিলেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত মিঃ আপকারের পরিচয় হয়। ইহার ফলে হাওড়া কোল ইয়ার্ডে একটি কয়লার ডিপো খুলিবার সঙ্কল্প তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে। ইহার অব্যবহিত পরেই কয়লার ডিপো খোলা হয় এবং প্রসন্নকুমার উহার মালিক ও পরিচালক হন। এই সময়ে প্রসন্নবাবুর বয়স ২২ বৎসর। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম হাবড়া কোল ইয়ার্ডে কয়লার ডিপো খুলেন। দুই তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি এই ব্যবসায়ে এরূপ সুযশঃ অর্জ্জন করেন যে, তাহার ফলে তাঁহার ব্যবসায় দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। তাঁহার দায়িত্বজ্ঞান, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সাধুতার খ্যাতি তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যান্ত অক্ষুন্ন ছিল। এই গুণেই তিনি জীবনে উন্নতি লাভ ও সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অবশ্য চাকুরীর ছুটী ফুরাইলেই তিনি চাকুরীতে ইস্তফা দেন এবং চাকুরীর সম্বন্ধ ঘুচাইয়া ফেলিয়া ব্যবসায়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। ব্যবসায়ে সাফল্যের ফলে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সীতারামপুরে কয়লার খনি-যুক্ত জমি খরিদ করেন এবং সেখান হইতে কয়লা উত্তোলন করিয়া তিনি বিপুল অর্থের অধীশ্বর হন। কয়লার খনির মালিক-হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে; ইহার ফলে ইউরোপীয় বণিকগণও তাঁহার সহিত কাজ-কারবার আরম্ভ করেন। অতঃপর তিনি রাণীগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানে আরও কয়লার খনি খরিদ করেন। অদ্যাবধি তাঁহার পুত্রগণ এই সকল খনির কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। কলিকাতায় তিনি কয়লা খরিদ-বিক্রয়ের একটি আফিস খুলেন; উহা এখনও পর্য্যন্ত চলিতেছে।

গত ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রসন্নকুমার পরলোক গমন

করেন; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৯ বৎসর। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পত্নী, ৫ পুত্র ও ২ কন্যা রাখিয়া যান।

প্রসন্নকুমারের পুত্রগণের মধ্যে ৩ জন অর্থাৎ হেমচন্দ্র দত্ত, চারুচন্দ্র দত্ত ও কানাইলাল দত্ত কয়লার খনির ব্যবসায় ও অন্যান্য ব্যবসায়ের ভার লইয়া সে সকলের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তৃতীয় পুত্র মিঃ বি-সি দত্ত কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। চতুর্থ পুত্র শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দত্ত হার্ডওয়্যার বা লৌহজাত দ্রব্যের ব্যবসায় খুলিয়াছেন।

প্রথম পুত্র হেমচন্দ্র খাঁড়দহ-নিবাসী ৺ দ্বা[illegible]নাথ কন্যাকে বিবাহ করেন। হেমবাবুর দুই পুত্র।

দ্বিতীয় পুত্র চারুচন্দ্রের দুইটী বিবাহ। প্রথম বিবাহ হয় রামকৃষ্ণপুর-নিবাসী ৺ নৃসিংহচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত। তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ৺ চারুচন্দ্র বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে। চারুচন্দ্রের দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা।

তৃতীয় পুত্র মিঃ বি-সি দত্ত ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হাওড়া স্কুলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি তথা হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষা দেন ও উত্তীর্ণ হন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টের উকিল শিবাপ্রসন্ন-ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট শিক্ষানবীশ থাকেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে তিনি হাইকোর্টের উকীল-শ্রেণীভুক্ত হন। এই বৎসরের অক্টোবর মাসে তিনি ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ব্যারিষ্টারীর আদ্য পরীক্ষায় তিনি হিন্দু ও মুসলমান আইনের পরীক্ষা দেন ও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ইংলণ্ডীয় শাসন-সংক্রান্ত আইনে, এবং ফৌজদারী আইনেও তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং রোমক আইনে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ব্যারিষ্টারীর শেষ পরীক্ষায়

মি: বি. সি. দত্ত (বার-এট্-ল)

তিনি গুণানুসারে ৫ম স্থান অধিকার করেন। বেলফাষ্ট ইউনিভারসিটি হইতে তিনি এল-এল-বি উপাধি লাভ করেন এবং তথা হইতে সার্টিফিকেট অফ অনার বা মান-পত্র প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসর যাবত তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনর আছেন। তিনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার কালি কৃষ্ণ বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার ২ পুত্র ও ৪ কন্যা। তাঁহার প্রথমা কন্যার সহিত কলিকাতা বিডন স্ট্রীটের খ্যাতনামা স্বর্গীয় কালীপ্রসাদ ঘোষের বংশধর শ্রীমান্ ভবানী-প্রসাদ ঘোষ, বি-এস-সির বিবাহ হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ গৌরীশঙ্কর প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ হইয়া সম্মান পাইয়াছেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ করিতেছেন। দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ গুরুপ্রসাদ দত্ত রিপণ কলেজিয়েট স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতেছে।

চতুর্থ পুত্র পূর্ণচন্দ্র কলিকাতা-নিবাসী গিরীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। পূর্ণচন্দ্রের ৪ পুত্র ও ৩ কন্যা।

পঞ্চম বা কনিষ্ঠ পুত্র কানাইলাল হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পৌত্রীকে (শ্রীযুত শরৎচন্দ্র মিত্রের কন্যা) বিবাহ করেন। ইনিও মিঃ বি-সি দত্তের সহিত বিলাত গিয়াছিলেন।

বংশ-লতা

গোবর্দ্ধন দত্ত
প্রসন্নকুমার দত্ত
হেমচন্দ্র
চারুচন্দ্র
কানাইলাল
পাচু
ভোলা
মৃত্যুঞ্জয়
বিমল
মৃনাল
শিশু
গুরুপ্রসাদ
কল্যাণ
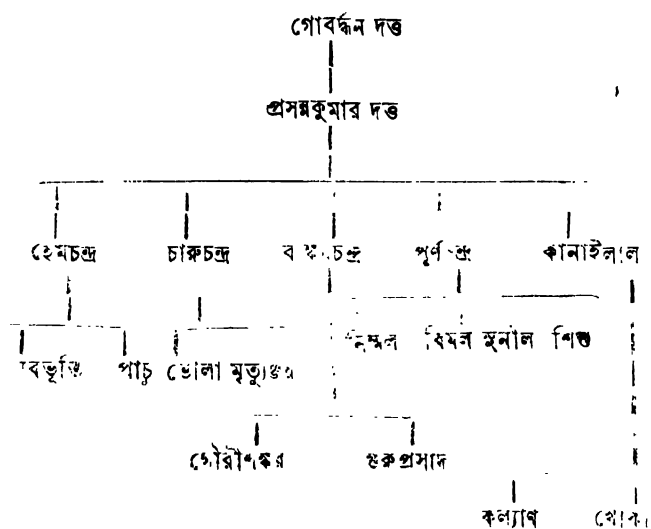
স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র রায় সি, আই, ই,।

প্রতাপ চন্দ্র রায় সি, আই, ই

মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদক স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র রায় সি, আই, ই, মহোদয় বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী শাঁকো গ্রামের প্রসিদ্ধ রায় বংশে উগ্রক্ষত্রিয় কুলে, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বংশ পরিচয় ও বাসস্থান।

উগ্রক্ষত্রিয়গণ আদৌ আগরা অঞ্চলবাসী এবং সেই হেতু, বঙ্গদেশে ইঁহারা 'আগরী' নামে পরিচিত। মোগল রাজত্বের অভ্যুদয় ও পাঠান রাজত্বের অবসানের সমসাময়িক কালে উগ্রক্ষত্রিয়গণ মোগল-সৈন্যভুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং মোগল কর্ত্তৃক বাঙ্গালা-বিজয়ের পর, ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপে প্রভূত জায়গীরাদি লাভ করিয়া বর্দ্ধমান প্রদেশে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। রায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা উগ্রক্ষত্রিয় রাজা বাঘরায় এই উপলক্ষে তন্নামধেয় সমগ্র বাঘা পরগণা জায়গীর-রূপে প্রাপ্ত হন এবং তাৎকালীন মোগল অধিকারের সীমান্ত-রূপে বর্ত্তমান খানাজংশন ষ্টেশনের (ই, আই, আর) নিকটবর্ত্তী খানো গ্রামে স্বীয় বাসস্থান স্থাপন করেন। রাজা বাঘ একজন বীর ও চরিত্রবান মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রতার বিষয়ে বহু প্রবাদ-বাক্য এতদঞ্চলে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। কৃষিকার্য্যের সৌকার্য্যার্থে এবং প্রজাগণের সুবিধার জন্য তিনি স্বীয় জায়গীর মধ্যে নানাস্থানে ঈশানদীঘি, পারুলদীঘি, ত্রিশূলদীঘি প্রভৃতি সাতটী সুবিস্তৃত জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। খানো গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে যে স্থানে বাঘের স্থায়ী সৈন্যদল (Standing army) অবস্থান করিত, সেই স্থান এখনও "পল্টন্ ডাঙ্গা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

রাজা বাঘের অধস্তন পুরুষ রাজা রাজবল্লভ রায় শাসনকার্য্যের সুবিধার্থে বা অপর কোন কারণে, খানো হইতে বাসস্থান উঠাইয়া আনিয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের দক্ষিণ পার্শ্বে (যে স্থান শাঁকো নামে অভিহিত) স্থাপন করেন।

শঙ্খগড় বা শাঁকো

রাজা রাজবল্লভ এই স্থানটীকে শঙ্খ-বেষ্টনীর ন্যায় পর পর তিনটী পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন এবং ৺শঙ্খেশ্বরী নাম্নী দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়া এই স্থানের নাম শঙ্খগড় (বা শাঁকো) রাখেন। ভগ্ন মন্দির মধ্যে দেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি এখনও গড়ের ভিতরদেশে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রহিয়াছেন। ৺উগ্রাদিত্য দেবও এই স্থানের প্রাচীন দেবতা। উগ্রাদিত্য সূর্য্যমূর্ত্তি; সুতরাং ইহার প্রতিষ্ঠাতা যে সূর্য্যোপাসক ক্ষত্রিয় বা উগ্রক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পরিখাত্রয় পরিবেষ্টিত শঙ্খগড়ের সকল পরিখাগুলির নিদর্শন বর্ত্তমানে না পাওয়া গেলেও, মূল গড়টী এখনও অবিকৃত অবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। গড়ের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উত্তরদিকে প্রবেশ ও নির্গমের দুইটী পথ ছিল এবং উক্ত উভয় পথই উগ্রক্ষত্রিয়-অধিনায়কিত বাহক-বীরগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইত। নগরের মধ্যে আসিতে বা তথা হইতে যাইতে হইলে, নৌকাযোগে গড় পার হইতে হইত। এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত পথ দুইটী এখনও না-ঘাটা Ferry-ha বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। গ্রাম মধ্যে বিভিন্ন জাতি সকলের অবস্থান-সংস্থান অনুধাবন করিলে স্থানটী যে হিন্দু তথা উগ্রক্ষত্রিয় প্রধান স্থান ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বাগ্দী, ডোম, চামার বাউরী এবং মুসলমান প্রভৃতি পল্লীসমূহ এখনও গড়ের বাহিরে অবস্থিত রহিয়াছে। গড় মধ্যস্থিত অধিকাংশ অধিবাসীই উগ্রক্ষত্রিয় ও তাঁহাদের সংসারযাত্রার সাহায্যকারী ব্রাহ্মণ, নবশাক প্রভৃতি অন্যান্য জাতি। যে অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রি জাতি এক্ষণে গড়বেষ্টিত নগরের দক্ষিণ প্রান্তে বাস

করিতেছেন, তাঁহারা এস্থানের প্রাচীন অধিবাসী নহেন। উগ্রক্ষত্রিয় প্রভাব ধ্বংসের বহুকাল পরে তৎকালীন বর্দ্ধমানাধিপতি এই স্থানের কালেক্টরী স্বত্ব খরিদ করিয়া এই নবাগত জাতিটীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বর্দ্ধমান-রাজের তন্‌খাপ্রাপ্ত নিকট আত্মীয়। গড়ের অনতিদূর দক্ষিণে "মোগল সীমা" নামক একটা ক্ষুদ্র পল্লী আছে। এই পল্লীটী নিশ্চতই তাৎকালিক মোগলাধিকৃত রাজ্যের সীমারূপে পরিগণিত ছিল। উগ্রক্ষত্রিয় প্রধান শাঙ্খগড়ের অনতিদূরে অবস্থিত সীমা-নির্দ্দেশক এই পল্লীটী এবং ইহার ঠিক তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত 'দাউদপুর' বা (দাদপুর) পল্লীটী নিশ্চিতই মোগল কর্তৃক দাউদ বিজয়ের এবং তাহারই অব্যবহিত পরে উগ্রক্ষত্রিয়গণের বর্দ্ধমান অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হইবার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। গ্রামের পশ্চিমে, গড়ের পরপারে, 'মুণ্ডমালা' নামক পুষ্করণীর পঙ্কোদ্ধার কালে বহু নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা হইতে উপলব্ধি হয় যে রায়বংশীয়গণকে দুর্গরক্ষার্থে বহুবার বহু আক্রমণকারীর সহিত যুদ্ধ-ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল।

স্বর্গীয় রাজা রাজবল্লভের সময় হইতেই খাঁড়া গ্রামের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বর্তমান চণ্ডীমণ্ডপ, নাট্যশালা, রাসমঞ্চ এবং প্রাসাদোপম সুবৃহৎ বাসভবন প্রভৃতি এই সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। গ্রামের বিভিন্ন স্থানে শিবালয়াদি এবং প্রসিদ্ধ 'সুখ সায়র' নামক সুবৃহৎ জলাশয় এখনও রাজা রাজবল্লভের অতুল কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

রায় বংশের কীর্ত্তি কাহিনী।

স্বর্গীয় সুবল চন্দ্র রায়, রাজা রাজবল্লভের পুত্র। ইনি বর্ত্তমান সদাব্রত ও অতিথিশালা স্থাপন এবং নানা স্থানে জলাশয়াদি খনন ও হাট-বাজার পত্তন করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রায়বংশের এই দেবসেবা, অতিথিসেবা ও দোল-দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপ

এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণোদ্দেশে ভূমি ও জলাশয়াদি দান এখনও এতদঞ্চলে তাঁহাদের বংশধরদিগকে সম্মানিত করিয়া রাখিয়াছে এবং এই হেতু ব্রাহ্মণগণ এখনও ইঁহাদের বাটীতে মাত্র এক পয়সা দক্ষিণা লইয়া ভোজন-ব্যাপার সমাধা করিয়া থাকেন।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, অশেষ গৌরবান্বিত এই রায় বংশের অন্যতম শাখা বিশেষে, ১৮৪২ খৃঃ অব্দের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে প্রতাপ চন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম রামজয় রায় এবং মাতার নাম দ্রবময়ী দেবী। প্রতাপ রামজয়ের সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী প্রতাপের মৃত্যুর পরও কিছুদিন জীবিতা ছিলেন। এই বর্ষীয়সী মহিলার নিকট হইতে প্রতাপের বাল্য-জীবনের ঘটনা সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রতাপ যখন মাত্র আড়াই বৎসরের, তখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটে, এবং এই অপোগণ্ড শিশুর ভার তখন হইতেই সর্ব্বমঙ্গলার উপর পতিত

জন্ম ও শৈশব।

প্রতাপ বাল্যকালে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ও অতিশয় চঞ্চল ছিলেন ; সুতরাং সব সময় তাঁহাকে সামলাইয়া রাখা সর্ব্বমঙ্গলার পক্ষে সহজ হইত না। স্ত্রীলোকবিহীন সংসারে নানা বিশৃঙ্খলার মধ্যেও মাতৃহীন প্রতাপ এইরূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে, বিবাহান্তে সর্ব্বমঙ্গলা যখন শ্বশুর গৃহে চলিয়া গেলেন, তখন প্রতাপকে লইয়া রামজয় বড়ই বিপদে পড়িলেন। এরূপ অবস্থায় কৃষ্ণমণি দেবী নাম্নী তাঁহার এক নিকট আত্মীয়ার সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন অন্য উপায় রহিল না। কৃষ্ণমণি নিঃসন্তান এবং বালবিধবা। স্বামী পরিত্যক্ত যৎসামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়া তিনি কালনায় নিজ ভবনে বাস করিতেন। সর্ব্বমঙ্গলার বিবাহ উপলক্ষে কৃষ্ণমণি শাঁকো গ্রামে আসিলে, মাতৃস্নেহবঞ্চিত প্রতাপ তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং কৃষ্ণমণিও তাঁহার মাতৃহৃদয়ের

অতৃপ্ত ভালবাসা সেই হৃষ্ট-পুষ্টাঙ্গ বালকের উপর নিঃশেষে ন্যস্ত করিয়া ফেলেন। ইহার ফল এই হইল যে, কৃষ্ণমণি প্রতাপকে সঙ্গে লইয়া কালনার বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে, প্রতাপের সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে, রামজয় পরলোক গমন করেন এবং কৃষ্ণমণির পুত্ররূপে প্রতাপ কালনাতেই অবস্থিতি করিতে থাকেন।

বাল্যকাল ও শিক্ষা।

জীবিত অবস্থায় রামজয় কৃষ্ণমণিকে কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। কিন্তু এক্ষণে সে সাহায্যটুকুও বন্ধ হওয়ায় কৃষ্ণমণি বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। কিরূপে বালকের শিক্ষা ও গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় বিধান করিবেন—এই চিন্তা তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। নিরুপায় কৃষ্ণমণি অবশেষে প্রতিবেশী কোন ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। উভয়ের মধ্যে এই স্থির হইল যে, কৃষ্ণমণি ব্রাহ্মণের দাসীত্ব করিবেন ও প্রতাপ তাঁহার গোচারণে নিযুক্ত থাকিবেন এবং ব্রাহ্মণ তদ্বিনিময়ে মাতাপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন ও প্রতাপের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ভাগ্য যাহাকে মহৎ কার্য্যের জন্য নিয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, শুধু দুইটি খাইতে পরিতে পাইয়া এবং গোচারণ করিয়া তাঁহার জীবন কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না। নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য সমাপনান্তে প্রতাপ যে অবসরটুকু পাইতেন, তাহার প্রায় সমস্তটুকুই তিনি যত্নসহকারে নিজ শিক্ষায় ব্যয় করিতেন। তাঁহার এই অধ্যবসায়, এই ঐকান্তিকতা দর্শন করিয়া তাঁহার আশ্রয়দাতা মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং গোচারণ বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাকে নিজপুত্রগণের সহিত স্থানীয় পাঠশালায় বিনা বেতনে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। নিঃস্বার্থ,

পরোপকারী, মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের এই উপকার প্রতাপ পরবর্ত্তী জীবনে বিস্মৃত হয়েন নাই। তাঁহার অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত হইলে এই ব্রাহ্মণ-দম্পতির জন্য তিনি মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন।

বিনা বেতনে পাঠশালায় অধ্যয়নের ব্যবস্থা হইলেও পাঠ্য পুস্তকের অভাবে প্রতাপের শিক্ষা বেশী দূর অগ্রসর হইতেছিল না। প্রথম প্রথম তিনি সহপাঠীদের পুস্তক লইয়া পাঠাভ্যাস করিতেন, কিন্তু ইহাতে তাহাদের অসুবিধা হয় দেখিয়া এবং মাতাকে এ জন্য চিন্তান্বিতা করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া, প্রতাপ পাঠ্য পুস্তকের মূল্য সংগ্রহের এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি দেখিলেন, ধার্ম্মিক হিন্দুগণ প্রতিদিন ঘাটে ঘাটে নারিকেল ভেট করিয়া গঙ্গাদেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; ঐ ফলগুলি তাঁহারই সমবয়সী কত দরিদ্র বালক জল হইতে কুড়াইয়া আনিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। প্রতাপ মনে করিলেন, তিনিও যদি ঐ সব বালকের ন্যায় ফল কুড়াইয়া আনিয়া বিক্রয় করিতে পারেন, তাহা হইলে বই কিনিবার মত পয়সা অনায়াসেই সংগ্রহ হইতে পারে। প্রতাপের যে কল্পনা সেই কার্য্য। তিনি তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। অন্যান্য বালকদিগের অপেক্ষা প্রতাপ সমধিক সবল ও সুস্থকায় ছিলেন; সুতরাং তিনি সকলের অপেক্ষা বেশী ফল সংগ্রহ করিলেন। ঐ সকল ফল বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইলেন, তৎসমুদায়ই তিনি তাঁহার মাতার হস্তে দিলেন। প্রতাপ অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বাঙ্গালা লেখা-পড়া ও অঙ্কে একরূপ চলনসই ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।

প্রতাপের বয়স এখন পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র। এই অল্প বয়সেই তিনি

দুঃখ কি তাহা বিশেষরূপেই অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও ঘোরতর দুঃখ যে তাঁহার অদৃষ্টাকাশকে একেবারে অন্ধকারাবৃত করিয়া দিতে পারে, এ ধারণা জন্মিবার পূর্ব্বেই তাঁহার একমাত্র অভিভাবিকা মাতা পরলোক গমন করিলেন। স্নেহময়ী মাতার বিয়োগে প্রতাপ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন,—কোন সান্ত্বনাই আর তাঁহাকে কালনায় ধরিয়া রাখিতে পারিল না। এই জনবহুল জগতে তিনি একা, নিঃসহায়, নিঃসম্বল অবস্থায় ভাসিয়া চলিলেন,—কে জানিত তখন, ইহার পরিণতি কোথায়! প্রতাপ শুনিয়াছিলেন, ইংরাজের তদনীন্তন রাজধানী কলিকাতায় গেলে কাহারও অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ থাকে না। আমরা পূর্ব্বেও দেখিয়াছি এবং পরেও দেখিব—প্রতাপের যে কল্পনা সেই কার্য্য। সদ্য মাতৃস্নেহচ্যুত, সংসারানভিজ্ঞ, অসহায় পল্লীবালক প্রতাপ কলিকাতার জনসমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলেন! আক্ষেপের বিষয়, প্রতাপ তাঁহার প্রথম কলিকাতা বাসের কোন ইতিবৃত্ত রাখিয়া যান নাই; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে এই সময়ে তাঁহাকে বহু দুঃখের মধ্য দিয়া ই অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। একাকী, অসহায়, কপর্দ্দকহীন অবস্থায় কলিকাতার ন্যায় জনবহুল নগরীতে তাঁহাকে যে কি ভীষণ শূন্যতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কেহই অনুমান করিতে পারিবেন না। কয়েক দিন একরূপ পথে পথেই কাটাইয়া ভাগ্য-প্রেরিত প্রতাপ, জানিনা কিরূপে, স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের আশ্রয় লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রতাপের অটুট স্বাস্থ্য, সুগঠিত অবয়ব এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার করুণ মুখমণ্ডল দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া সিংহ মহোদয় তাঁহাকে মাসিক সাত টাকা বেতনে নিজ খাস-খানসামারূপে নিযুক্ত করিলেন। দক্ষতা ও সরলতা গুণে প্রতাপ অতি অল্প দিনের মধ্যেই স্বীয় প্রভুর চিত্ত অধিকার করিয়া ফেলিলেন, এবং তিনিও তাঁহাকে মাসিক পনর টাকা

প্রতাপ কলিকাতায়।

বেতনে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসাবাটী সমূহের আদায়কারী গোমস্তার পদে উন্নীত করিলেন। সিংহ মহোদয় প্রতাপকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার পড়াশুনায় অনুরাগ দেখিয়া তদনুশীলনের জন্য তিনি বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিলেন।

বাবু কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয় এই সময়ে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এই অনুবাদ গ্রন্থ তিনি কেবলমাত্র পণ্ডিতগণকেই বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন; সুতরাং জনসাধারণ তাঁহার দানে বিশেষ কিছু উপকৃত হইত না। প্রতাপ নিত্যই দেখিতেন,—শত শত আবেদনকারী গ্রন্থ লাভে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেন; কেহ কেহ বা, প্রভুর প্রিয়পাত্র জানিয়া তাঁহাকে এ সম্বন্ধে বহু অনুরোধও করিতেন; কিন্তু তিনি কি করিতে পারেন? দৃশ্য কিন্তু প্রতাপকে অত্যন্ত মর্ম্মাহত করিত। এই সময় হইতেই তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—যদি তিনি কখনও বড়লোক হইতে পারেন, তাহা হইলে আপামর-সাধারণ সকলকেই বিনামূল্যে মহাভারত বিতরণ করিবেন! দীন হীন, পরদাস প্রতাপের পক্ষে এ সঙ্কল্প বাতুলতা মাত্র! কিন্তু আমরা দেখিব, এই সময়ে নিভৃতে তিনি যে সুমহান প্রেরণার বীজ স্বীয় হৃদয়ে উপ্ত করিয়াছিলেন, তাহাই কালে ফলফুলে সুশোভিত হইয়া দিগন্তব্যাপী মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছিল! মহাভারতের বঙ্গানুবাদ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ পরলোক গমন করেন। প্রিয় প্রতিপালকের লোকান্তরের পর প্রতাপ আর চাকুরি করিলেন না। দাসত্বকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। উপায়ান্তর না পাইয়া এবং স্বর্গীয় সিংহ মহোদয়ের ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া এই চারি বৎসর কাল তিনি তাঁহার সেবা করিয়াছেন; কিন্তু আর কেন?

প্রতাপ অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। কলিকাতা নগরীর কোন প্রলোভনই তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই।

কর্ম্মজীবন—কলিকাতায়।

সময় ও অর্থের অযথা ব্যবহার না করিয়া তাঁহার অল্পমাত্র আয়ের অধিকাংশই তিনি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতেন, এবং কার্য্যান্তরালে যে অবসর টুকু পাইতেন তাহার প্রায় সব টুকুই নিজ শিক্ষায় নিয়োজিত করিতেন। বলা বাহুল্য, পনের টাকা মাহিনার চাকরী করিয়া প্রতাপ অতি সামান্য মাত্রই সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। এই যৎসামান্য মূলধন লইয়া তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় মনোনিবেশ করিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, কলিকাতা নর্ম্মেল স্কুল তখন জোড়াসাঁকো শীলবাবুদের সুবিস্তৃত ভবনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ভবন সংলগ্ন গোল ঘরটীতে (সেটী এখনও বর্ত্তমান আছে) প্রতাপ তাঁহার পুঁজির অর্দ্ধাংশ মাত্র লইয়া সামান্য মত একটী মনোহারী দোকান খুলিয়া বসিলেন। তাঁহার দোকানে পণ্য দ্রব্যের মধ্যে বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ, ধারাপাত, কাগজ, কলম, কালী, খাতা, পেন্‌সিল, ছুরি, কাঁচি, সূচ প্রভৃতি, এবং কিছু কিছু খেলানা, লজঞ্চুস, খাবার ইত্যাদি—বালকদের উপযোগী নানা জিনিস সামান্যভাবে সর্ব্বদাই মজুত থাকিত। দোকানটী ক্ষুদ্র হইলেও প্রতাপের মিতব্যয়িতা ও সততা গুণে অল্পদিনের মধ্যেই বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিল, এবং লাভও মন্দ হইতেছিল না। প্রতাপ একণে সঞ্চিত অর্থের বাকী অর্দ্ধেকও কারবারে নিয়োজিত করিলেন এবং দোকানটীকে একটু বড় করিয়া ফেলিলেন। কিছুদিন পরে, প্রতাপ তাঁহার এই দোকানটীকে একটী অর্ডারসাপ্লাইএর কার্য্যালয়ে পরিণত করিলেন, এবং ইহাতে তাঁহার লাভও বেশী হইতে লাগিল।

প্রতাপের বয়স এখন তেইশ বৎসর। তাঁহার কারবারের আয় মন্দ হইতেছে না; সুতরাং তাঁহার আর্থিক অবস্থা বর্ত্তমানে বহুল পরিমাণে স্বচ্ছল হইয়াছে। সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসরের পর, প্রতাপ জন্মভূমি-দর্শনে অভিলাষী হইয়া, এই প্রথম বার শাঁকো গ্রামে ফিরিয়া গেলেন, এবং অনতিবিলম্বে এক মনোরমা জীবন-সঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। ভার্য্যা গোলাপ সুন্দরী একরূপ স্বয়ম্বরা হইয়াই প্রতাপকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এই শুভ পরিণয়ের ফল স্বরূপ প্রতাপের একমাত্র কন্যা হরিদাসী ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ১২ই জুলাই তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া, প্রতাপ বিপুলতর উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বর্ত্তমানে তিনি আর একা নহেন; এক্ষণে তাঁহাকে অপর একজনকে প্রতিপালন করিতে হইবে—সুখী করিতে হইবে। প্রতাপ অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। তাঁহার অত্যুচ্চ আকাঙ্খা, তাঁহার অনন্যসাধারণ আত্মনির্ভরশীলতা, তাঁহার অতুলনীয় কর্ম্মকুশলতা তাঁহাকে এই ক্ষুদ্র কারবারটীর সীমায় আবদ্ধ থাকিতে দিল না, এবং ইহা অপেক্ষা কোন বৃহত্তর কার্য্যের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল,—যে কার্য্যে তিনি তাঁহার সমস্ত সত্বা, সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত দক্ষতা, সমস্ত উদ্যমশীলতা নিঃশেষে ব্যয়িত করিতে পারেন।

বিবাহও গার্হস্থ্য জীবন।

মহাভারত প্রচারের সেই পুরাতন চিন্তাই সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার মনে উদিত হইল। আমরা দেখিয়াছি, প্রতাপের যে কল্পনা সেই কার্য্যারম্ভ। যে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রচারে বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর এবং স্বর্গগত কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের ন্যায় ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকেও বিশেষ বিবেচনার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, চির আত্ম-নির্ভরশীল প্রতাপ তৎসাধন পক্ষে বিন্দুমাত্রও চিন্তা না করিয়

কিন্তু তাহা না করিয়া প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ-প্রচাররূপ আমার চিরআকাঙ্ক্ষিত আশার সফলতার পক্ষে যতটুকু পারি, তাহাই সম্পাদন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম।"

১৮৬৮ খৃঃ অব্দের জুন মাসে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ কার্য্য আরম্ভ হয়, এবং ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে তাহা সম্পূর্ণ হয়। অক্লান্তকর্ম্মী সুপণ্ডিত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই কার্য্যের সহায়করূপে পাইয়া প্রতাপ বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। প্রথম সংস্করণের ৩,০০০ কপির মধ্যে প্রায় অধিকাংশই সাধারণ পণ্যরূপে, প্রতি কাপি ৪২৲ টাকা মূল্যে, বিক্রীত হইয়া গেল, এবং ইহাতে প্রতাপের প্রভূত অর্থাগম হইল। বঙ্গদেশে কেবল প্রতাপই এই প্রকার বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার এই সৎসাহসের পুরস্কার স্বরূপ তিনি বিপুল ধনসম্পদ্ ও সম্মানের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন।

পত্নী বিয়োগ ও মানসিক অবস্থা।

কিন্তু অবিচ্ছিন্ন সুখ-সম্পদ্ মানবভাগ্যে একান্তই সুদুর্লভ। কয়েক বৎসরের প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ফলে যদিও প্রতাপ বিপুল বিত্ত ও স্বসমাজে প্রভূত সম্মান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু কে জানিত, উন্নতির এই প্রথম সোপানে নবীন বয়সেই তাঁহাকে প্রিয় পত্নী হারা হইয়া পুনরায় নিঃসঙ্গতার নিভৃত বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে? সপ্তম বর্ষীয়া শিশু-কন্যা হরিদাসীর জন্য প্রতাপ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। প্রতাপের তৎকালীন মানসিক অবস্থা তাহার নিজ ভাষাতেই ব্যক্ত করিতেছি। এই সময় প্রিয় বন্ধু দুর্গাচরণকে তিনি লিখিয়াছিলেন— "বর্ত্তমানে আমি একরূপ পাগল। ডাক্তার-কবিরাজ এবং বন্ধুগণ স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য বলিতেছেন, কিন্তু আমার প্রিয়তমার ক্ষুদ্র স্মৃতি হরিদাসীকে কাহার নিকট রাখিয়া

যাইব? বিশেষ, আমার ব্যাধি শারীরিক নহে, মানসিক; স্থান পরিবর্ত্তনে ইহার কি উপকার হইতে পারে,—জানি না।"

দুই বৎসর পরে, নবম বর্ষীয়া হরিদাসীকে এক উচ্চ বংশীয়, সুশিক্ষিত ও ধনাঢ্য যুবকের করে সমর্পণ করিয়া প্রতাপ একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু প্রিয় পত্নীর শোক কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। পুরাতন স্মৃতি-বিজড়িত কলিকাতার বাসভবন তাঁহার বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। উদ্দেশ্য-বিহীন ব্যর্থ জীবন বহন করা তাঁহার পক্ষে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল - তিনি গৃহের বাহির হইয়া পড়িলেন। ঢাকা, ময়মনসিং বরিশাল, কাঁকিনারা, ভাওয়াল, ভুবনহাগ পুঁটীয়া, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, এবং বহু পরিচিত ও অপরিচিত ধনাঢ্য ও মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখা-শুনা ও আলাপ-পরিচয়াদি করিয়া, তাঁহার এই চিত্ত-চাঞ্চল্য বহুল পরিমাণে উপশমিত হইল। এই সময় সকলেই একবাক্যে মহাভারতের অনূদিত বঙ্গানুবাদের প্রশংসা করিয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সংস্করণ, মূল্যের অত্যধিকতাহেতু সাধারণ পাঠকের লভ্য নহে বলিয়া অনেকেই অনুযোগ করিয়াছিলেন। মফঃস্বলবাসীদের এই অনুযোগ প্রতাপের মনে পুনরায় কর্ম্ম-প্রেরণা আনিয়া দিল এবং তিনিও তাঁহার গভীর শোক বিস্মৃত হইবার প্রকৃষ্ট পন্থা দেখিতে পাইলেন। ভারতের জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থরাজি যাহাতে তাঁহার স্বদেশবাসীগণের মধ্যে অবাধে প্রচারিত হয়, এবং তাৎকালিক ধর্ম্মবিপ্লবের যুগে যাহাতে তাহাদের এই জ্ঞানচর্চ্চা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে স্ব-ধর্ম্মনিষ্ঠ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই প্রতাপ প্রথমতঃ কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এক্ষণে, তাঁহার এই প্রচেষ্টার আংশিক সফলতা-স্বরূপ মফঃস্বলবাসীদের মহাভারত-প্রাপ্তি বিষয়ে আগ্রহ

"দাতব্য ভারত কার্য্যালয়।"

উপলব্ধি করিয়া, প্রতাপ তাঁহার সকল শোক, সমস্ত-দুঃখ ভুলিয়া গেলেন এবং যাহাতে তাঁহার স্বদেশবাসীগণ বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে মহাভারত পাইতে পারে, ত সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রতাপ দেখিলেন, বিক্রয় বাদে, তখনও প্রায় একহাজার কাপি মহাভারত তাঁহার আফিসে মজুত আছে,—এ গুলি তিনি বিনামূল্যেই বিতরণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। সমস্তগুলি নিঃশেষিত হইয়া গেলে, প্রতাপ মহাভারতের এক বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ আরম্ভ করিলেন, এবং প্রত্যেক কাপি ডাকমাশুল ও সবঞ্জামী খরচার জন্য মাত্র ৬।৵০ মূল্যে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ইহাতেও প্রতাপের আয় মন্দ হইল না, কারণ প্রত্যেক কাপিতে মাত্র একটী করিয়া টাকা লাভ থাকিলেও দশ হাজারের একটী সংস্করণে তাঁহার দশ হাজার টাকা লাভ হইল। প্রতাপ এক্ষণে, ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ বিতরণের জন্য একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার এই আত্ম-নিয়োগের শুভফল তৎপ্রতিষ্ঠিত "দাতব্য ভারত কার্য্যালয়।" এই কার্য্যালয় ১৮৭৮ খৃঃ অব্দের ২রা জানুয়ারী তারিখে, ৬৭নং অপার চিৎপুর রোডস্থ ভবনে প্রতিষ্ঠিত হইল। কার্য্যালয়ের মস্তক প্রতাপ, এবং হস্ত তাঁহার সহকর্ম্মী পণ্ডিত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যে সকল পণ্ডিতমণ্ডলী ও ভদ্রমহোদয়গণ কার্য্যালয়ের অবৈতনিক ও নিয়মিত সভ্যরূপে প্রতাপের এই উদ্যমে নানাপ্রকারে সাহায্য দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি :—পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন, অধ্যাপক কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত জগমোহন তর্কালঙ্কার, ডাঃ শম্ভু চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মিঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত, রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর (হিন্দু পেট্রিয়ট), বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন, (ইণ্ডিয়ান মিরর), বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাবু শিশির কুমার ঘোষ (অমৃতবাজার) মহারাজা সার

যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তর পাড়া) প্রভৃতি।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ের উদ্দেশ্য মহৎ এবং দেশ-হিতৈষণার চরম পরিণতি। এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা ভারতে এই প্রথম এবং নূতন। প্রতাপ অংশালী ব্যক্তি ছিলেন না, এবং তৎকালে তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতেও কেহ স্বীকৃত হন নাই ; পরন্তু স্বকীয় অসাধারণ অধ্যবসায় ও অসামান্য কর্মকুশলতার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যেমন হইয়া থাকে—প্রথম কয়েক বৎসর প্রতাপকে প্রভূত প্রতিবন্ধক, প্রভূত উপহাস, এবং সর্ব্বোপরি প্রভূত অর্থকষ্ট ও তীক্ষ্ণ সমলোচনার বিষয়ীভূত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু প্রতাপ কিছুতেই ধৈর্য্যহারা হন নাই। কয়েক বৎসরের প্রাণান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি কার্য্যালয়টীকে একটী আত্মনির্ভরশীল স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে সমর্থ হইলেন।

কার্য্যালয়ের কার্য্যবিবরণ

আমরা দেখিয়াছি, দাতব্য ভারত কার্য্যালয় প্রথম হইতেই বহু গণ্য-মান্য পণ্ডিতমণ্ডলী এবং বহু উচ্চপদস্থ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছিল। এক্ষণে, ইহার কার্য্যাবলী নিয়মিত ভাবে ও শৃঙ্খলামত চালতে দেখিয়া. এবং স্থাপয়িতার উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, অনেকেই অযাচিত ভাবে ইহার সাহায্যার্থে মনোনিবেশ করিলেন। এই সকল বদান্য ও সদাশয় ব্যক্তিগণের মধ্যে কাসিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ের সাহায্য কল্পে স্বর্গীয়া মহারাণীই সর্ব্বপ্রথমে দুই সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। ময়মনসিংএর মহারাজা স্বর্গীয় সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী এবং কাঁকিনার রাজা মহিমারঞ্জন রায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া, প্রত্যেকে এক এক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানও অনেক সংগৃহীত হইয়াছিল। কার্য্যালয়ের আর্থিক কষ্ট এইরূপে নিরাকৃত হইলে, একটী মুদ্রাযন্ত্র খরিদ করা হইল, এবং কার্য্যও বেশ সুচারুরূপে চলিতে লাগিল। ভারত কার্য্যালয়, ইহার পর, মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে সংস্করণ মূল মহাভারত ও চার সংস্করণ বঙ্গানুবাদ, হরিবংশ শ্রীমদ্ভাগবত এবং রামায়ণ (মূল ও বঙ্গানুবাদ) প্রত্যেক সংস্করণ তিন হাজার হিসাবে, ৩০,০০০ কাপি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইল। এই ত্রিশ হাজার কাপির অধিকাংশই বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করা হইল।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ের সম্বন্ধে বাঙ্গালা এই দানময় যজ্ঞ, বাস্তবিক সাফল্য [illegible] এবং [illegible] অর্পিত। প্রতাপ যখন ভাবি,

প্রতাপের সাফল্য।

এই অমানুষিক কার্য্য প্রতাপ একাকী সম্পাদন করিয়াছিলেন, তখন বিস্ময়ে আনন্দে, গর্ব্বে অভিভূত হইয়া পড়ি। সংবাদপত্রে গরিমার উৎফুল্ল হইয়া প্রতাপের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"It might be fairly presumed that the genuine demand for 30,000 copies of the sacred books of India represents a decree of interest, taken by the people in the history of their past, is certainly not discouraging to patriotic hearts. * *If the publications of the " Datavya Bharata Karya-laya " have succeeded in withdrawing, to some extent, readers of the sensational literature of the present day, * * and turning them to contemplate the purity of Aryan society, the immutable thoughts of Aryan philosophy, the chivalry of Aryan princes and warriors, the

masculine morality that guides the conduct of men, even in the most trying situations, the bright examples of loyalty, constance and love which the Aryan poet discribes with a swelling heart, the end of these publications has, at last, been partially achieved. May I indulge the hope that my countrymen be preserved from foreign influences in their manners, and may I also indulge the hope that my countrymen continue to look upon Vyas and Valmiki with feelings of proper pride!" মর্ম্মার্থ —"ভারতীয় ধর্ম্মগ্রন্থের ৩০ ••• কবির রচিত নিশ্চিতই এতদ্দেশবাসীর জাতীয় পুরাবৃত্তানুরাগের [illegible] পরিচায়ক, এবং তাহাদের এই অনুরাগ প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে। দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ের প্রকাশিত গ্রন্থ-রাজি যদি বর্ত্তমানকালের উত্তেজনাপূর্ণ [illegible] যুগের পাঠকবর্গের কিয়দংশকেও সংযত রাখিতে সমর্থ হইয়া থাকে এবং যদি তাহাদিগকে আর্য্যসমাজের পবিত্রতা, আর্য্য-দর্শনের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত [illegible] ও যোদ্ধৃগণের অলৌকিক শৌর্য্য, আর্য্য নীতির সর্ব্ব মহত্ত্ব, রাজভক্তির দৃপ্ত উদাহরণ সত্যবাদিতা এবং আর্য্যকবি-উদ্গীত পবিত্র প্রণয়-কাহিনী সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর দানে সক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছে বলিয়াই মনে করিব। এক্ষণে, আমার স্বদেশবাসীগণের নিকট নিবেদন এই যে— তাহারা যেন বৈদেশিক ভাবাপন্ন হইয়া স্বীয় জাতীয়তার ধ্বংসসাধন না করেন, এবং ব্যাস ও বাল্মিকীকে প্রকৃত শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত জ্ঞান করেন"।

ঋগ্বেদের ফরাসী-অনুবাদক অধ্যাপক এ. বার্থ দাতব্য ভারত

কার্য্যালয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"Here we have something like a 'Hindu Biblical Society', and we should not wonder. if one day, the Ganges sent out missonaries to us." মর্ম্মার্থ—"দাতব্য ভারত কার্য্যালয়কে নিঃসন্দেহে 'হিন্দু বাইবেল সমিতি' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, এবং এই গাঙ্গেয় সমিতি যদি কোন দিন আমাদের নিকট প্রচারক পাঠাইবার ব্যবস্থা করে, তাহাতেও আমাদের বিস্মিত হইবার কারণ থাকিবে না।"

কার্য্যালয়ের কার্য্যাবলী সম্যক্ সম্প্রসারিত হইলে, প্রতাপ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীটের ১নং বাড়ীখানি খরিদ করিয়া, তাহাতে কার্য্যালয় উঠাইয়া আনিলেন, এবং এই নূতন ও নিজস্ব বাড়ীতে বিপুল উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করিয়া ছিলেন। এই বড়ীখানি সম্বন্ধে একটু ঐতিহাসিকতা আছে—এটী ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজা নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাসের বসত বাড়ী ছিল। মহারাজা নন্দকুমারের আদি বাসস্থান ছিল—এখন যেখানে বিড্‌নপার্ক বা কোম্পানির বাগান। নন্দকুমারের ফাঁসির পর, এই বাড়ীখানি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক তৎপুত্র রাজা গুরুদাসকে দান করা হয়।

নূতন ভারত কার্য্যালয়- ১নং রাজা গুরুদাস ষ্ট্রিট।

আমরা দেখিয়াছি, প্রতাপ একাধিকবার সমগ্র মহাভারতের মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তৎসহ রামায়ণ প্রভৃতি বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রচার ও বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। কপর্দ্দকহীন প্রতাপের পক্ষে এই ব্যাপার অলৌকিক,—সন্দেহ নাই; কিন্তু অতঃপর তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে মনস্থ করিলেন তাহার তুলনায় তাঁহার পূর্ব্বকৃত কার্য্য

ইংরাজী মহাভারত।

অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয়। তিনি মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ প্রচারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মহাভারত জগতের অদ্বিতীয় গ্রন্থ—আর্য্য-মনীষার অফুরন্ত ভাণ্ডার! যুগে যুগে এই ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। মহাভারত একাধারে রাজনীতি-অর্থনীতি প্রভৃতি যাবতীয় নীতিশাস্ত্রের একমাত্র আধার। মহাভারত আর্য্যজাতির ব্যবহার শাস্ত্র—উত্তরাধিকার ও দণ্ডনীতি ইহাতে অতি সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এক কথায় মহাভারত হিন্দুর সর্ব্বস্ব। কেবল মহাভারত পড়িলেই হিন্দুর অপরাপর শাস্ত্র পাঠের ফল পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে—"যা' নাই (মহা) ভারতে তা' নাই ভারতে।" কিন্তু শুধু ইহাই নহে—মহাভারতের বিশালতার বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া যায়। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন—

"It (the Mahabharata) resembles ordinary Epics much as the Himalayas resemble ordinary mountains—that is in length, breadth and general inaccessibility and bewilderment !"—অর্থাৎ (জগতের) অন্যান্য পর্ব্বতের সহিত তুলনায় হিমালয় যেমন অদ্বিতীয়, (জগতের) অন্যান্য পুরাণের সহিত তুলনায় মহাভারতও সেইরূপ দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, দুরতিক্রমণীয়তায় এবং পথবিভ্রান্তকারীতায় অদ্বিতীয়!' মহাভারতে ২২,০০০ ছত্র অর্থাৎ ১১০,০০০ শ্লোক এবং আঠারটী পর্ব্ব আছে। সমগ্র গ্রন্থ ভাষান্তরিত ও প্রকাশিত করিতে হইলে লক্ষাধিক মুদ্রার প্রয়োজন। বিশেষতঃ, সংস্কৃত শব্দের ইংরাজী পরিভাষা, সংস্কৃত বাক্যাংশের(phrases) ইংরাজী অনুবাদ এবং সর্ব্বোপরি "ব্যাসকূট" নামক শ্লোকাবলীর ইংরাজী সমাধান একরূপ অসম্ভব ব্যাপার বলিলেই হয়। বার্ণক ও অন্যান্য বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ

এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাভারতের বিশালতা ও জটিলতার বিষয় অনুধাবন করিয়া তৎসাধনে বিরত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ বহু পণ্ডিত এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই।

মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশের পরিকল্পনা প্রতাপের নিজস্ব। তিনি দেখিলেন, তাঁহার স্বদেশবাসীগণ ইউরোপীয় সভ্যতার

ইংরাজী মহাভারতের পরিকল্পনা।

উজ্জ্বলালোকে বিভ্রান্ত হইয়া প্রকৃত পথ অনুসরণ করিতে পারিতেছে না। তাহারা এক্ষণে আয়াসলভ্য ও ব্যাকরণ-জটিল সংস্কৃত ভাষার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া সরল ও সুখপাঠ্য ইংরাজী ভাষানুশীলনে মনোনিবেশ করিয়াছে। প্রতাপ মনে করিলেন, এইরূপ একটী আত্মবিস্মৃত জাতিকে পুনরায় স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে তাহার জাতীয় সম্পদ, অমূল্য সাহিত্য-ভাণ্ডার, তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত করিতেই হইবে। তিনি স্থির করিলেন, মৃত (dead) সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে তাঁহার এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না; সুতরাং তিনি জীবিত ইংরাজী ভাষার আশ্রয়ই গ্রহণ করিলেন। ইংরাজী মহাভারত প্রকাশের দ্বিতীয় ও প্রধানতম উদ্দেশ্য—ভারতে শাসন-সংস্কার। প্রতাপ দেখিলেন, শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় কেহই সংস্কৃত শিখিবার সুযোগ ও অবসর পান না। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য যাহা কিছু শিখেন তাহা শিক্ষা হিসাবে অতি অকিঞ্চিৎকর। এক্ষণে, এই শাসকসম্প্রদায় যদি ভারতীয় আচার ব্যবহার, ভারতীয় রীতি-নীতি, ভারতীয় বিধি-বন্দোবস্ত এবং ভারতীয় ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ভারতে বৃটীশ শাসন ন্যায় ও ধর্ম্মের ভিত্তির

উপর প্রতিষ্ঠাপিত হইবে। কিন্তু, এই সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে ভারতীয় শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহ রীতিমত ভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে; কিন্তু ইহার জন্য ব্যবহারোপযোগী সময় তাঁহাদের কর্ম্মবহুল জীবনে কোথায়? এরূপ অবস্থায়, যাহাতে তাঁহারা স্বল্পায়াসে এবং তাঁহাদের নিজ ভাষাতেই ভারতীয় শাস্ত্রার্থ অবগত হইতে পারেন, তাহার উপায় করিতেই হইবে। এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য প্রতাপ মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

ইংরাজী মহাভারতের ঘোষণা-পত্র।

কিন্তু এই কার্য্যের উপযোগী অর্থ ও সামর্থ প্রতাপের কোথায়? ইংরাজী অনুবাদ মহাভারত, খুব কম পক্ষে ধরিলেও, প্রায় ১০,০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে, এবং ন্যূনাধিক একলক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইবে! এই টাকার অধিকাংশই আবার, জনসাধারণের স্বেচ্ছাকৃত দানরূপে সংগ্রহ করিতে হইবে! কিন্তু কোন চিন্তাই প্রতাপের অদম্য উৎসাহে বাধা দিতে পারিল না, এবং আমরা পরে দেখিব, বাস্তবিকই, তিনি এই লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদকার্য্য সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! ১৮৮২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে ইংরাজী অনুবাদ মহাভারতের ঘোষণা পত্র (Prospectus) প্রচারিত হইল, এবং প্রতাপ পূর্ণোদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যে কার্য্য সাধনে মহা মহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, এমন কি, ভারতগবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্তও ভীত হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন, সেই মহান্ গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যভার প্রতাপ স্বইচ্ছায় নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন! কিন্তু তিনি শুধু গ্রহণই করেন নাই, তাহা সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন! আমরা মনে করি, এই উদ্দেশ্য-বিশেষ সিদ্ধ করিবার জন্যই প্রতাপের জন্ম। তিনি

জন্মগ্রহণ না করিলে, মহাভারত কখনই ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইত না !

কিন্তু এই উদ্যমের প্রারম্ভেই প্রতাপকে যে দারুণ শোকে অবিভূত হইতে হইল, তাহাতে তাঁহার কার্য্যকরণ শক্তি কিছু দিনের জন্য একেবারে স্থগিত হইয়া গেল। আমরা দেখিয়াছি, সাংসারিক জীবনে প্রতাপ কখনই সুখী হইতে পারেন নাই। শৈশবে মাতৃ-স্নেহচ্যুত, কৈশরে পিতৃহীন এবং যৌবনে প্রিয় পত্নীহারা হইয়া তাঁহাকে এযাবৎ একরূপ নিঃসঙ্গ জীবনই যাপন করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই দুঃখই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নহে ; ভাগ্য তাঁহাকে অধিকতর দুঃখে নিপাতিত করিবার জন্যই, বোধ হয়, তাঁহার একমাত্র কন্যা হরিদাসীর প্রতি, মাত্র পঞ্চদশ বৎসর বয়সেই, চির বৈধব্যের ব্যবস্থা করিলেন ! কন্যা হরিদাসীকে উপলক্ষ্য করিয়াই তাঁহার বর্ত্তমান সংসার। তিনি আশা করিয়াছিলেন, হরিদাসীর পুত্র সন্তান হইলেই তাঁহার নাম ও বংশ বজায় থাকিবে, এবং এই ভাবিয়াই, তিনি বন্ধুবর্গের উপরোধ উপেক্ষা করিয়া পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই। কিন্তু সেই হরিদাসী যখন মাত্র এক বৎসরের একটী শিশু কন্যা লইয়া, সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন শোকে, দুঃখে, নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। এই ঘটনার পর, বৎসরাধিক কাল প্রতাপ কোন কার্য্যেই মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। তাঁহার বন্ধুবর্গ, বিশেষতঃ পণ্ডিত দুর্গাচরণ তাঁহার জন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, এবং পরিশেষে তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য তীর্থ-ভ্রমণে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রতাপের অনুপস্থিতি কালে কার্য্যালয়ের সমস্ত ভার পণ্ডিত দুর্গাচরণ নিজ শিরে গ্রহণ করিলেন।

পারিবারিক দুর্ঘটনা।

দীর্ঘ তিন মাস কাল নানাতীর্থে ভ্রমণ করিয়া, কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রতাপ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন ; কিন্তু কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না। এই সময়, দিবসের অধিকাংশ ভাগই তিনি রাজকীয় পুস্তকাগারে (Imperial Library) অধ্যয়নে রত থাকিতেন। এই উপলক্ষে, পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ ডাঃ আর, রষ্টের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, এবং এই পরিচয় ক্রমে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রষ্ট মহোদয়ের সহিত প্রতাপের বহু আলোচনা হয়, এবং গুণগ্রাহী রষ্ট প্রতাপের এই কার্য্য সাগ্রহে অনুমোদন করেন, এবং এতৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তিনি স্বয়ং করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। রষ্ট মহোদয় তাঁহার এই প্রতিশ্রুতি বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিলেন ; তিনিই প্রধানতঃ গভর্ণমেণ্ট কৃত সাহায্য প্রাপ্তির মূল। প্রতাপের এই উদ্যমে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি নানা প্রকারে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়াছিলেন।

প্রতাপ ও ডাঃ আর, রষ্ট।

ডাঃ রষ্টের সহিত পরিচয়ে প্রতাপ তাঁহার লুপ্তপ্রায় কর্ম্মানুরক্তি ফিরিয়া পাইলেন, এবং অধিকতর উৎসাহের সহিত পুনর্ব্বার কার্য্যে-মনোনিবেশ করিলেন। প্রতাপের অকৃত্রিম বন্ধু পণ্ডিত দুর্গাচরণ, কর্ম্মযোগী প্রতাপকে পুনর্ব্বার কর্ম্মানুরক্ত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং তাঁহাকে পুনরায় সংসারী করিবার জন্য বন্ধুগর্ণের সহিত বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন : দুর্গাচরণ ও বন্ধুবর্গের সমবেত চেষ্টার ফলে, প্রতাপ ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে, ৩৭ বৎসর বয়সে, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইলেন। প্রতাপের এই দ্বিতীয়া পত্নী স্বর্গীয়া সুন্দরী বালা রায়, প্রতাপের পরলোক গমনের পর,ইংরাজী মহাভারত সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই মহীয়সী মহিলার নাম তাঁহার স্বনামধন্য স্বামী মহাশয়ের নামের

পুণর্বিবাহ দ্বিতীয়া পত্নী।

সহিত মহাভারতের পৃষ্ঠায় চিরসংযোজিত রহিয়াছে। ইনিই প্রতাপের শেষ উইল অনুসারে শাঁকো গ্রামে, ৺ প্রতাপেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ ও ইহার সপত্নী (প্রতাপের প্রথমা পত্নী) স্বর্গীয়া গোলাপ সুন্দরীর নামে "গোলাপ সায়র" নামক সুপ্রশস্ত সরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

মার্কইস অব হাটিংট ও অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর।

ইংরাজী মহাভারতের পরিকল্পনা প্রতাপের নিজস্ব হইলেও স্বাভাবিক শীলতাবশতঃ তিনি এই কার্য্যের যাবতীয় গুরুত্ব ও প্রাথমিক অনুষ্ঠান সমূহ তদানীন্তন ভারত-সেক্রেটারী মার্কুইস অব হাটিংটন ও অধ্যাপক ম্যাক্স মূলরের উপরেই ন্যস্ত করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে, এইরূপ দুইজন মহানুভব ব্যক্তির সাহায্য না পাইলে, প্রতাপ কখনই এই অসমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেন না। ডাঃ রষ্ট স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই মার্কুইস মহোদয়কে প্রতাপের অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইয়া একখানি পত্র দিয়াছিলেন; এই পত্রের উত্তরে মার্কুইস মহোদয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি:—The Mahabharata, if translated into English, would supply a want, long-felt, and be a real boon to the ever increasing band of students of indian history and archaelogy. I recomend the idia heartily and wish its success.—" অর্থাৎ, "মহাভারত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইলে নিশ্চিতই একটী দীর্ঘকালব্যাপী অভাবের পরিপূরণ হইবে, এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিৎ সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হইবে।"—মার্কুইস মহোদয়ের এই আশার বাণীই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতাপকে কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, এবং তিনিই পরিশেষে প্রতাপকে রাজদরবারে পরিচিত করাইয়া দিয়াছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশের অনুবাদ স্বয়ং করিয়া

দিয়াছিলেন। তাঁহার এই অনুবাদাংশ যদিও মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদের নমুনা স্বরূপ গৃহিত হইয়াছিল, তথাপি তিনি স্বয়ং প্রতাপকৃত অনুবাদেরই ভূয়সী প্রসংশা করিয়াছেন। তিনিই প্রথমে প্রতাপকে ইউরোপও আমেরিকার পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত পরিচিত করাইয়া দেন।

ভারত সাম্রাজ্যের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডফারিণ ও ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলি প্রতাপের এই উদ্দামে বিশেষ ভাবেই সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এইরূপ দুইজন উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষের সাহায্য লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া প্রতাপ তৎক্ষণাৎ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন—কোন চিন্তাই এক্ষণে আর তাঁহাকে বাধা দান করিতে পারিল না; কার্য্যালয়ের যাবতীয় ভার তিনি নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহকর্ম্মী পণ্ডিত দুর্গাচরণ এই সময় তাঁহাকে যেরূপ সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, তাহা একরূপ অমূল্য বলিলেই হয়। মহাভারতের গাবী অনুবাদকারী পণ্ডিত কিশোরী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয়ের সহিত তিনিই এই সময় প্রতাপের পরিচয় করাইয়া দেন। পণ্ডিত কিশোরী মোহন একজন অসাধারণ মেধাবী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অনন্যসাধারণ সাহিত্যানুরাগ তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানবত্তার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহাকে মহাশক্তিশালী করিয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যাসরূপে তিনিই মহাভারতের ন্যায় মহাগ্রন্থ একাকী আদ্যোপান্ত অনুবাদ করিয়া পাশ্চাত্য সমাজে "সাহিত্য-রথী" (Literary Atlas) খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত মাসিক ৫০৲ টাকা পেন্‌সন্ আজীবন উপভোগ করিয়াছিলেন।

মহাভারত অনুবাদকারী পণ্ডিত কিশোরী মোহন।

দুইজন শক্তিশালী পুরুষ এযাবৎ বঙ্গভূমে বিনামূল্যে জ্ঞান বিতরণ

করিতেছিলেন, এক্ষণে, সমশক্তিশালী অপর এক ব্যক্তি সমগ্র সভ্য জগতে ভারতীয় মহাপুরাণ আস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

ভারত কার্য্যালয়ের ইংরাজী বিভাগ।

ভারত কার্য্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের যাবতীয় ভার পণ্ডিত কিশোরী মোহন গ্রহণ করিলেন। স্থিরীকৃত হইল, মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ প্রতি মাসে দশ ফর্ম্মা, ডিমাই আটপেজী আকারে বাহির হইবে; এবং এইরূপ একশত খণ্ডে সমগ্র মহাভারত শেষ হইবে। এই সঙ্গে ইহাও স্থির হইল, যে বর্ত্তমান সংস্করণে মোট ১,২৫০ কাপি ছাপা হইবে; তন্মধ্যে ২৫০ কাপি ভারতের রাজন্যবর্গ ও প্রধানদিগকে, ৩০০ কাপি প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগকে, ৫০ কাপি বৈদেশিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে, এবং ২০০ কাপি কার্য্যালয়ের ভাণ্ডারে মজুত থাকিবে; বক্রী ২৫০ কাপি সাধারণ পণ্য রূপে ভারতে ও ভারতের বাহিরে যথাক্রমে ৫০৲ ও ৬৫৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় করা হইবে। কিন্তু ইহাও যাঁহারা দিতে অক্ষম হইবেন, তাঁহারা যথাক্রমে ১২৲ ও ২৫৲ টাকা মূল্যে এক এক কাপি মহাভারত খরিদ করিতে পারিবেন।

পূর্ব্ব বন্দোবস্তমত ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে ইংরাজী অনুবাদ মহাভারতের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রতাপ জানিতেন না, তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম মহাভারত জগত কি ভাবে গ্রহণ করিবে। হয় ত বা তাঁহাকে সমগ্র সভ্য জগতে এবং তাঁহার নিজ জন্মভূমি ভারতবর্ষে তাঁহাকে অপদস্থ ও উপহসিত হইতে হইবে—হয় ত বা ম্লেচ্ছ ভাষায় মহাভারত অনুবাদরূপ গুরুতর অপরাধে তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু এসবের কিছুই হইল না; পরন্তু প্রতাপ-প্রকাশিত

প্রতাপ চন্দ্র রায় সি, আই, ই।

ইংরাজী অনুবাদ মহাভারত সমগ্র সভ্য জগত সাদরে গ্রহণ করিলেন! ইংলণ্ডীয় এবং ভারতীয় উচ্চ রাজকর্মচারীবৃন্দ, জগতের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলী, জাতিধর্মনির্বিশেষে দেশীয় রাজন্যবর্গ ও প্রধানগণ, দেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদ-পত্র-সেবীগণ, এমন কি, খৃষ্টান মিশনরী ও ইস্লামীয় মোল্লাগণ পর্য্যন্ত প্রতাপের এই কার্য্যে আন্তরিক প্রশংসাবাদ করিলেন। ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রতাপের এই নিঃস্বার্থ স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ স্বয়ং তাঁহাকে, ১৮৮৯ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে সি, আই, ই (Companion of the Order of the Indian Empire) উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

ভারত কার্য্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুবর্গ।

প্রতাপের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুবর্গের মধ্যে ডিউক অব ডিভনসায়র বা তদানীন্তন ভারত সেক্রেটারী মার্কুইস্ অব হার্টিংটন্ মহোদয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। এই মহাত্মার আশার বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়াই প্রতাপ মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ রূপ মহান্ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন এবং তিনিও প্রতাপের এই প্রচেষ্টায় সমধিক সাহায্য করিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতাপ যে বিপুল অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন, তৎ সমস্তের মূলই উক্ত মার্কুইস্ মহোদয়।*

* ভারত গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের দানের তালিকা :—

ভারত গবর্ণমেণ্ট	...	...	১৩৬০০৲
বেঙ্গল "	...	...	৬,০০০৲
উঃপঃ "	...	...	৫,০০০৲
পাঞ্জাব "	...	...	২,৫০০৲
বোম্বে "	...	...	২,৫০০০৲
মাদ্রাজ "	...	...	১,৫০০৲
আসাম "	...	...	১,০০০৲
সিলোন "	...	...	২,০০০৲
ফরাসী "	...	...	৯০০ ফ্রাঙ্ক

মার্কুইস মহোদয়ের পরেই, ভারতের বড় লাট লর্ড রিপন এবং লর্ড ডফারিণের নাম করা যাইতে পারে। ইঁহারা উভয়েই প্রতাপের এই কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। লর্ড ডফারিণ ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে ৫০ খণ্ড হইতে প্রত্যেক খণ্ড মহাভারতের জন্য ১৭৫৲ টাকা হিসাবে দান মঞ্জুর করিয়াছিলেন। লর্ড নর্থব্রুক ও এই অনুবাদ কার্য্যের সাহায্যার্থে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন।

লর্ড রিপন, লর্ড ডফারিণ ও লর্ড নর্থব্রুক।

বঙ্গের ছোটলাটদিগের মধ্যে সার রিভার্স টমসন এবং সার ষ্টুয়ার্ট বেলি প্রতাপের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। সার রিভার্স টমসনই বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রথম ৫,০০০৲ টাকা দান করেন। সার ষ্টুয়ার্ট বেলি তৎকালে গবর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন; এবং প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে, মহাভারতের প্রথম খণ্ড বাহির হইবার সময় হইতেই, প্রতাপ এই দান প্রাপ্ত হয়েন। সার ষ্টুয়ার্ট পরে যখন বঙ্গের ছোটলাট হইলেন, তখন তিনি প্রতাপের এই উদ্যমে নানা প্রকারে সহায়তা করিয়াছিলেন।

সার আর টমসন ও সার ষ্টুয়ার্ট বেলি।

উঃপঃ প্রদেশের ছোট লাট সার অকল্যাণ্ড কল্‌ভিন্‌ উক্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট হইতে ৫,০০০৲ টাকা দান করেন, এবং প্রতাপের এই কার্য্যে বহু উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পঞ্জাবের গবর্ণর সার চার্লস এ্যাচিসন্‌ প্রতাপের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন; গভর্ণমেণ্টের দান ছাড়া তিনি নিজ হইতে বহু সহস্রমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সার চার্লস ইলিয়ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট হইতে দ্বিতীয় বারে ৫,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

সার অকল্যাণ্ড, সার সি এ্চিসন ও সার চার্লস ইলিয়ট।

সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদিগের মধ্যে জেনারেল ষ্টুয়ার্ট এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত বুয়োর-বিজয়ী লর্ড রবার্টসের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। অনেকেই হয়ত

জেনারেল ষ্টুয়ার্ট ও লর্ডরবার্টস।

জানেন না যে জেনারেল ষ্টুয়ার্ট সংস্কৃত ভাষায় বেশ ভালরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মহাভারতের প্রথম খণ্ড হাতে পাইয়াই তিনি প্রতাপকে ডাকিয়া পাঠান, এবং নানা প্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিশ্রুতির সফলতা স্বরূপ তিনি দেশ-বিদেশের বহু গণ্যমান্য ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির সহিত প্রতাপের পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল। লর্ড রবার্টস প্রতাপকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিতেন, এবং তিনিও বহু লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রফেসর মোক্ষমূলর প্রতাপের এই উদ্যমের প্রথম এবং প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি শুধু অনুক্রমণিকা অংশের

প্রঃ ম্যাক্সমুলর ও ডাঃ রষ্ট।

অনুবাদ পাঠাইয়া দিয়াই ক্ষ্যান্ত হন নাই, পরন্তু "লণ্ডন টাইমস্"এবং ইউরোপের অন্যান্য প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে মধ্যে মধ্যে প্রতাপ ও তাঁহার গ্রন্থের যে সমালোচনা বাহির করিতেন, তাহাতেই জগতের সমস্ত সভ্য দেশে মহাভারতের নাম ও যশ সুপ্রচারিত হইয়া যায়। ডাঃ রষ্টের কথা আমরা কিছু কিছু বলিয়াছি। প্রতাপ তাঁহার সম্বন্ধে যে অভিমত পোষণ করিতেন তাহা তাঁহার নিজ ভাষাতেই ব্যক্ত করিতেছি,—It was his encouraging words that first led me to think seriously of an English translation of the Mahabharata, and it is his sympathy and friendship that have supported and cheered me amid all my distractions."—মর্ম্মার্থ—"ইহাঁরই উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমি মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ

বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিবার অবসর পাইয়াছিলাম, এবং ইঁহারই সহানুভূতি ও বন্ধুত্বলাভ করিয়া আমি আমার সমস্ত দৈন্য ভুলিয়া সানন্দে কার্য্যে অবতীর্ণ হইতে পারিয়াছিলাম।" ডাঃ রষ্ট ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হইলে, প্রতাপ আনন্দিত হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে সংস্কৃত কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"ভূষয়িত্বা ভবন্তং হি রাজ্ঞা বিদ্যা সুপূজিতা।
উপাধিনা ভূষণস্তু তব ভাব বিরাজিতম্॥
অসামান্য গুণৈরেব ভূষতোঽস্তি ভবান্ বিভো।
প্রকৃত্যামধুরশ্চন্দ্রো মণ্ডনং কিমুপেক্ষতে॥
কে বা ন সন্তি মতিমন্ ভুবি ভাবমিশ্রাঃ
শাস্ত্রে শ্রুতৌ সুনিপুণা ধিষণা বিভাতা।
মৈত্রী জনে সরলতা বিপুলঞ্চ চেতঃ
যদ্দৃশ্যতে ত্বয়ি তু তদ্বিরলং হি লোকে॥" ইত্যাদি।

প্রতাপের বিদেশীয় বন্ধুবর্গের মধ্যে প্যারি সহরের মুঁসে এ, বার্থ ও মুঁসে বার্থেলমি, কোপেনহেগেনের ডাঃ ফোবল, ট্রাসবার্গের ডাঃ ব্যারাক এবং ফিলাডেল্‌ফিয়ার ডাঃ হ্যাসলর্ প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম উল্লেখ যোগ্য, এতদ্ব্যতীত দেশ-বিদেশের বহু ভদ্র ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ প্রতাপের এই কার্য্যে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি;—কিল্ (জার্ম্মানী) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যাকবী, লেপজিগের (জার্ম্মানী) সংস্কৃত অধ্যাপক গার্বে, গ্রীসের ডাঃ এ্যানড্রু কেফালিয়নস্, ওয়েটারন্ (বেল্‌জিয়ম) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পৌসিন্, মেরিল্যাণ্ডের অধ্যাপক রিস্, চিকাগোর মিঃ চার্লটন্, কেনেডার মিঃ উইটন্ এবং

বৈদেশিক বন্ধুবর্গ।

আমেরিকার প্রাচ্য সভার সভাপতি প্রঃ ল্যানম্যান প্রভৃতি। এই শেষোক্ত মহোদয় প্রতাপের কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নিজ প্রদত্ত টাকা বাদে তিনি আমেরিকার বহু ভদ্র লোকদিগকে মহাভারতের গ্রাহক করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রতাপকে এত ভাল বাসিতেন, যে ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া সস্ত্রীক প্রতাপের বাস ভবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছিলেন।

দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকেই প্রতাপের এই কার্য্যে বিশেষ ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। আমরা এ স্থলে তাঁহাদের নাম ও সাহায্যের পরিমাণ মাত্র দিলাম।*

দেশীয় রাজন্য মণ্ডলী

তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী সার শেষাদ্রি আয়ার প্রতাপের একজন অকৃত্রিম বন্ধু এবং সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি মহীশূর গভর্ণমেণ্ট হইতে মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদকল্পে ৬,০০০্ টাকা এবং

মহীশূরের মহারাজ —৮,০০০+২০০০্

হায়দারাবাদের নিজাম বাহাদুর	...	৬,৫০০্
সিন্ধিয়ার মহারাজা	...	৩,০০০্
ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা	...	৩,০০০্
বরোদার গাইকোয়ার	...	২,০০০্
মহারাণী স্বর্ণময়ী (কাশিম বাজার)	...	১,৭০০্
কোচিনের মহারাজা	...	১,৫০০্
জয়পুরের মহারাজা	...	১,৫০০্
যোধপুরের মহারাজা	...	১,৫০০্
ইন্দোরের মহারাজা	...	১,৩০০্
হাতোয়ার মহারাজা	...	১,০০০্
কোচবিহারের মহারাজা	...	১,০০০্
পাতিয়ালার মহারাজা	...	১,০০০্
কচ্ছ প্রদেশের মহারাও	...	১,০০০্
উদয়পুরের মহারাজা	...	১,০০০্
ভবনগরের ঠাকুর সাহেব	...	১,০০০
কাপুরথালার মহারাজা	...	১,০০০্
মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর	...	১,০০০্

মূল সংস্কৃতের পুনর্মুদ্রনের জন্য ২,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত সার কৃষ্ণমূর্ত্তি আয়েঙ্গার পঞ্চাশৎ খণ্ড হইতে প্রত্যেক খণ্ডে ৫০৲ টাকা হিসাবে ২,৫০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। হায়দারাবাদের (নিজাম) প্রধান মন্ত্রী নবাব সার সৈয়দ আলি বিলগ্রামী ধর্ম্মে মুসলমান হইলেও উদার মতাবলম্বী মহাপুরুষ ছিলেন। মুসলমান ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই সংস্কৃত শাস্ত্রের বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন। মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যার্থে নিজাম গভর্ণমেণ্ট হইতে তিনি ৬,৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

এইরূপে, বহু বিদেশী ও স্বদেশী ভদ্র মহোদয়গণ, জাতি, ধর্ম্ম এবং দেশ, কাল ও পাত্র নির্ব্বিশেষে, ভারত কার্য্যালয়ের পুষ্টি সাধনার্থ স্বতঃ-

সাহিত্যে ভ্রাতৃভাব।

প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের অর্থভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সমগ্র জগদ্ব্যাপী এরূপ একটী প্রতিষ্ঠান অপর কোন দেশে আছে কিনা জানিনা। চিকাগোর 'বিভিন্ন ধর্ম্মাশ্রয়ী সঙ্ঘ' (Parliament of Religion) স্ব স্ব ধর্ম্মের

আলওয়ারের মহারাজা	...	...	৮০০৲
জুনাগড়ের নবাব বাহাদুর	...	...	৭০০৲
ফরিদ কোটের মহারাজা	...		৫০০৲
ধার প্রদেশের মহারাজা	...	...	৫০০৲
ধ্রাংধারার মহারাজা	...	...	৫০০৲
পদুকোটার মহারাজা	...	...	৫০০৲
রেওয়ার মহারাজা	...	...	৫০০৲
নবাব সার সালার জং বাহাদুর	...	...	৯০০৲
রাজা গজপতি রায়	...	...	৫১০৲
সার দিনসাও মানকজি পেটিট	...	...	৫০০৲
গিধোরের রাজা বাহাদুর	...	...	৪০০৲
ডুঙ্গারপুরের রাজা বাহাদুর	...	...	৩০০৲
লিমড়ির ঠাকুর সাহেব	...	...	২৫০৲
বেতিয়ার মহারাজা	...	...	২৫০৲

প্রাধান্য স্থাপনার্থ বিরোধ-সূচক আলোচনার স্থান, কিন্তু ভারত কার্য্যালয় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, এমন কি জড়মতাবলম্বীগণেরও পরস্পর মিলনের স্থান। বাইবেল-সোসাইটী, বৌদ্ধ ধর্ম্ম-সঙ্ঘ কিম্বা ভারতের জাতীয় মহাসভা (Congress) স্ব স্ব মতেরই পরিপোষকতা করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে, ভারত কার্য্যালয়', সাহিত্যের মধ্য দিয়া সমগ্র জগতে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাবের অবতারণা করিয়াছে! 'One touch o' nature makes the whole world kin—

'প্রকৃতির এক মাত্র পুণ্যঃ পরশন—
সারা বিশ্বে মৈত্রীভাব করে সঙ্ঘটন।'

—মহাকবি সেকস্পিয়রের এই দুর্ব্বোধ্য এবং অপ্রাসঙ্গিক কবিতাংশের সত্যতা প্রতাপের 'ভারত কার্য্যালয়' বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিয়াছে। শতাব্দ পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি কাউপার লিখিয়াছেন;—

"Is India free ? And does she wear
Her plumed and jewelled turban wi'a smile o' peace ?
Or do we grind her still ?"—

অর্থাৎ,—'ভারত কি মুক্ত এবে ? পরে কি সে শিরে
শিখিপুচ্ছ চূড়া তা'র রতন খচিত ?
আশ্বস্তির স্নিগ্ধ হাস হাসে কি সে ফিরে ?
কিম্বা তা'রে আজ (ও) মোরা করি বিদলিত ?"

ভারত মুক্ত না হইলেও 'দাতব্য ভারত কার্য্যালয়' যে তাহার শিরে পুনরায় রত্নখচিত শিখিপুচ্ছ চূড়া পরাইতে পারিয়াছে, এবং দুঃখিনী ভারত-জননীর মুখে যে আশ্বস্তির বিশ্ববিমোহন মৃদু হাস্য আনয়ন করিতে পারিয়াছে, তাহা, বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিবেন না। ভারতের অতুল্য সম্পদ শাস্ত্রৈশ্বর্য্য ইংরাজী

মহাভারত সম্বন্ধে প্রাচ্য অভিমত।

ভাষার অনুদিত হইয়া, সমগ্র সভ্য জগতে কি একটা অপূর্ব্ব বিস্ময়ের, কি একটা বিপুল স্পন্দনের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা প্যারি সহরের বিখ্যাত পণ্ডিত, ঋগ্বেদের ফরাসী অনুবাদক প্রঃ এ, বার্থ মহোদয়ের কথায় ব্যক্ত করিতেছি —"I have not the least doubt that this translation of the ancient Hindu literature will confound the so-called modern civilization, inspiring to it a sprit the might be envied by move pretentious nations" :— মর্ম্মাংশ—"পুরাতন হিন্দু-সাহিত্যের এই ইংরাজী অনুবাদ নিশ্চিতই তথা-কথিত বর্ত্তমান সভ্যতাকে বিভ্রান্ত করিয়া দিবে এবং বহু সভ্যতা-অভিমানী জাতিকে এমন কিছু শিক্ষা দিবে যাহাতে তাহারা ভারতের সভ্যতার প্রতি ঈর্ষান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না।"

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের এই সব দান প্রতাপ অগ্রিম বা একেবারে প্রাপ্ত হন নাই। প্রত্যেক খণ্ডের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কাপির উপর একটা মূল্য নির্দ্ধার্য্য করা ছিল, এবং তৎসংখ্যক কাপি পাইবার পর মূল্যের টাকা মঞ্জুর হইবার ব্যবস্থা ছিল। এই মঞ্জুরী টাকা আদায় হইয়া আসিতে কখন কখন প্রায় ৩।৪ মাস দেরী হইয়া যাইত; সুতরাং পরবর্ত্তী সংখ্যার ও কার্য্যালয়ের অন্যান্য আবশ্যকীয় নিত্য খরচের জন্য প্রতাপকে সময় সময় বড়ই বিব্রত হইতে হইত। তাঁহার একমাত্র সম্পত্তি বসত বাড়ীখানি এই জন্য বৎসরের মধ্যে দুই তিন বা ততোধিক বার বন্ধক দিতে হইত, এবং পরে মঞ্জুরী টাকা আদায় হইয়া আসিলে, সুদ সমেত পরিশোধ করিয়া তাহা খালাস করিতে হইত। গ্রাহকগণের টাকাও প্রায় এই ভাবেই আদায় হইত; তবে দুই এক জন মহানুভব ব্যক্তি দয়া করিয়া মূল্যের সমগ্র, অর্দ্ধেক বা কিয়দংশ অগ্রিমও

জীবনব্যাপী সংগ্রাম।

পাঠাইতেন। এইরূপে কার্য্যালয়ের ব্যয় আংশিকভাবে সঙ্কুলান হইলেও একটা দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা ও ঋণভার কার্য্যালয়কে সর্ব্বদার জন্য অবসাদ-গ্রস্থ করিয়া রাখিত, এবং এই জন্যই মহাভারতের খণ্ড সমূহ সময় মত বাহির করিতে বিলম্ব হইয়া যাইত, আর সেই জন্য প্রতাপের উদ্বেগের সীমা থাকিত না। এইরূপে কষ্টে-সৃষ্টে ৪৫ম খণ্ড বাহির হইবার পর তাঁহার অর্থাগমের সমুদয় পথ বন্ধ হইয়া গেল। বাড়ী খানি ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় বার বন্ধক দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং কোন মহাজনই আর তাহার উপর টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন না। এদিকে তাঁহার সহকর্ম্মী এবং একমাত্র সুহৃৎ পণ্ডিত দুর্গাচরণ পরলোকগত হইলেন (১৮৮৮।৩ জুলাই), এবং কার্য্যালয়ের যাবতীয় ভার একাএক প্রতাপের উপর পতিত হইল—তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অন্যের চেষ্টায় কোথাও বাহির হইতে পারিলেন না। এই দারুণ দুঃসময়ে তাঁহার মানসিক ও দৈহিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনায় হইয়া পড়িল। নিরাশার বিকট দৃষ্টি যেন চারিদিক হইতে তাঁহাকে ভীত, সন্ত্রস্ত ও নিরুৎসাহিত করিয়া ফেলিল। তাঁহার অতুলনীয় উদ্দাম ও বিপুল মনোবল যেন যাদুস্পর্শে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই সময় পণ্ডিত কিশোরী মোহন প্রকৃত সুহৃদের ন্যায় তাঁহাকে উৎসাহিত না করিলে, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে পরিচালিত না করিলে, বোধ হয়, এই মাঝ দরিয়ায় তাঁহার আশার তরিখানি ডুবিয়া যাইত। কিশোরী মোহন দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ের সমস্ত বিবরণ যথাযথ ব্যক্ত করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট একখানি দরখাস্ত পেস করিলেন। ইহার ফলস্বরূপ সদাশয় গভর্ণমেণ্ট ৫০শ খণ্ড হইতে প্রতি খণ্ডের জন্য ১৭৫৲ টাকা হিসাবে দান মঞ্জুর করিলেন। এই ব্যাপারে তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সার আল্‌ফ্রেড ক্রফট্ মহোদয় প্রতাপের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টকৃত এই দান এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট, দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণের প্রতিশ্রুত দান হইতে মহাভারতের খণ্ড সকল কোনরূপে বাহির হইতে থাকিল বটে, কিন্তু এই কার্য্যে অত্যধিক পরিশ্রম এবং অতিরিক্ত মস্তকচালনার ফলে প্রতাপের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল। নিয়মিত দান বাদে, তাঁহার সংসারিক ব্যয় অতি অল্পই ছিল; কিন্তু তাহা সত্বেও বাড়ীখানি খালাস করিবার কোন উপায়ই তিনি করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিরূপে মহাভারতের পরবর্ত্তী খণ্ড বাহির করা হইবে, কিরূপে অনুবাদক ও এজেণ্টগণের খরচ ও বেতন দেওয়া হইবে, কিরূপে প্রেস, দপ্তরী ও কাগজ-ওয়ালাদের দেনা শোধ হইবে অধিক কি, কিরূপে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের সঙ্কুলান হইবে—এই সকল চিন্তাই অহরহ তাঁহাকে অবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিত। সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী এই সকল পরিপার্শ্বিক চিন্তামালা তাঁহাকে নিদ্রা ও খাদ্যসুখে বঞ্চিত রাখিয়াছিল। তাঁহার আসুরিক শক্তি, তাঁহার দুর্ভেদ্য স্বাস্থ্য, তাঁহার বিপুল উদ্যম, তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ম্মকুশলতা ক্রমেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল; তাঁহার শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। মহাভারতের ৯৪ খণ্ড বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন। এই শয়নই তাঁহার অন্তিম শয়ন হইল!

রোগ শয্যায় প্রতাপ

১৮৯৫ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসের প্রথম হইতেই প্রতাপের একটু একটু জ্বর হইতে আরম্ভ হইল, এবং তৎসহ বহুমূত্র রোগ দেখা দিল। চিকিৎসকেরা তাঁহাকে যাবতীয় পরিশ্রমের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবার উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রমবিরতি প্রতাপের ভাগ্যে একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। প্রতাপ ধনবান ব্যক্তি ছিলেন না। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে

প্রতাপ অন্তিম শয্যায়।

ব্রত স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সমাধান কল্পে এযাবত প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, এবং এই সমস্ত টাকাই তাঁহাকে স্বকীয় অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সেই সঙ্কল্পিত ব্রতটীর উদ্‌যাপনের সমসাময়িক কালে তিনি ত এটীকে ত্যাগ করিতে পারেন না। সুতরাং সেই রুগ্ন শরীরেই তাঁহাকে সাধ্যমত পরিশ্রম করিতে হইল। ভাগ্য তাঁহাকে প্রচুর অর্থ-সাহায্য লাভে কৃতার্থ করিয়া ছিলেন, কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, এই সাহায্য প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাঁহার যত্র আয় তত্র ব্যয় ছিল। সময় সময় আবার আয়ের অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা বেশীই হইয়া যাইত। কিরূপে জমা ও খরচের ভারকেন্দ্র সাম্য রাখিতে পারেন—এই চেষ্টাই তাঁহার জীবনব্যাপী, এবং পরিশেষে, তাঁহার জীবনান্তকারী হইয়া দাঁড়াইল! মহাভারত তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং আমাদের বিশ্বাস, মহাভারতের জন্যই তাঁহার এই আত্মদান! তিনি জানিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তিম কাল ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, সুতরাং মহাভারত সমাধানের জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধিই পাইতেছিল। রুগ্নশয্যায়, অসহায় অবস্থায়ও তিনি এই জন্য তাঁহার লোকদিগকে তাগিদ্ দিতেছিলেন। মহাভারত শেষ না করিয়া বা তৎসাধন কল্পে কোন বিশিষ্ট আশায় বাণী প্রাপ্ত না হইয়া তিনি যেন কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছিলেন না। বাবু কিশোরী মোহনকে এই সময়, দিনের মধ্যে দশবার, প্রতিশ্রুতি দিতে হইতেছিল, কিন্তু তথাপিও তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর হইতেছিল না। এই সময় তিনি উদ্বেগাকুলিত কণ্ঠে কিশোরীবাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সুন্দরীবালা এবং বিধবা কন্যা হরিদাসীকে যে কথা গুলি বলিয়াছিলেন তাহা আমরা এখনও স্মরণ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার টাকা নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে, আমার বন্ধুবর্গ কখনই আমাকে ত্যাগ

করিবেন না। যে কোন প্রকারে হউক টাকা আসিবেই। এই মৃত্যুকল্প ব্যক্তির অন্তিম শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া তোমরা শুধু বল,—মহাভারত শেষ করিবে। তোমাদের মুখে এই কথাটী শুনিয়া আমি নিশ্চিন্তে অনন্তের পথে চলিয়া যাই।" বলা বাহুল্য, প্রতাপের এই শেষ অনুরোধ তাঁহার স্ত্রী, কন্যা এবং কিশোরী বাবু প্রাণপণে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

ইহার পর, প্রতাপ পরম নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার চরম ইচ্ছাপত্র (Will) প্রস্তুত করিলেন। আমরা পূর্ব্বাপর দেখিয়াছি, ব্যবসায়-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া প্রতাপ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন নাই; সুতরাং বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য সম্পত্তিও অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহার একমাত্র সম্পত্তি ছিল,—কলিকাতার বসত বাড়ী—তাহাও আবার ঘোরতর ঋণদায়গ্রস্ত। তিনি উইল করিলেন, এই বাড়ীখানি ও ছাপাখানাটী বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ টাকায় প্রথমেই মহাভারত শেষ করিতে হইবে, এবং এই খরচ ও বন্ধকী টাকার সুদ-আসল শোধ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহার কিয়দংশ দ্বারা তাঁহার জন্মভূমি শাঁকো গ্রামে একটী পানীয় জলাশয় খনন ও তত্তীরে একটী শিব স্থাপন করিতে হইবে। অপরাংশের কিছু টাকা সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি কল্পে ব্যয়িত হইবে, এবং বাকী টাকা হইতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী মাসিক মাত্র ১৫৲ টাকা খরচ করিতে পারিবেন। প্রতাপ তাঁহার পিতৃভূমে যে একখানি ছোট বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং যে কয়েক বিঘা আবাদী জমী খরিদ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পত্নী সুন্দরীবালা রায় পূর্ব্বোক্ত ৺শিবঠাকুরের সেবাইৎ রূপে প্রাপ্ত হইবেন।

প্রতাপের চরম ইচ্ছাপত্র।

এই চরম ইচ্ছাপত্র শেষ করিয়া, এব· মহাভারত সম্বন্ধে কিশোরী বাবুর আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া প্রতাপ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন, এবং ভবিষ্যতের আবশ্যম্ভাবীতার উপর একান্ত আত্মসমর্পণ করিলেন। ডিসেম্বরের শেষদিকে তাঁহার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইল, এবং ১৮৯৫ খৃঃ অব্দের ১০ই জানুয়ারী মহাপ্রাণ প্রতাপচন্দ্র রায় পরলোক প্রয়াণ করিলেন।

প্রতাপ প্রয়াণ।

প্রতাপের অন্তিম শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাবু কিশোরী মোহন লিখিয়াছেন—"তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল অতিক্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। বন্ধুগণ নানা প্রকারে শান্তনা দিলেও তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহাই ঠিক। তাঁহার একমাত্র ক্ষোভের বিষয়—তিনি জীবিত থাকিয়া মহাভারত শেষ করিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলন—সে আনন্দ লাভে বঞ্চিত রাখাই বোধ হয়; তাঁহার ভাগ্যবিধাতার ইচ্ছা। সেই সর্ব্বশক্তিবান ভগবানের ইচ্ছায় তিনি শান্তভাবে আত্মসমর্পন করিলেন! ১০ জানুয়ারী (১৮৯৫ খৃঃ অঃ), বৃহস্পতি বার, সন্ধ্যার দিকে তাঁহার শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল, এবং তিনি তাঁহার শুশ্রূষাকারীদিগকে জানাইলেন—সেই রাত্রেই তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিবে। তাঁহার দেহ কিরূপে সমাহিত হইবে—শান্তভাবে, নিরুদ্বেগে, সকলকে সেই উপদেশ দিলেন। অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগের পূর্ব্ব মহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল। মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি জানিতে চাহিলেন—সময় কত; এবং রাত্রি ১২টা জানিয়া তিনি তাঁহার শুশ্রূষা-কারীদিগকে হরিনাম করিতে আদেশ দিলেন, এবং আপনিও ক্ষীণকণ্ঠে তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। তাহার পর, তিনি যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্রি ১টা বাজিল, এবং তিনিও অনন্তধামে চলিয়া গেলেন!"

মৃত্যুকালে প্রতাপের বয়স ৫০ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু কেবল মাত্র তাঁহার স্বদেশের মঙ্গলের জন্য। এইরূপ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ লক্ষের মধ্যে দুই-একটি মাত্র লক্ষ্য হয়।

শেষ।

স্বদেশীয়গণকে তাহাদের জাতীয় সাহিত্যে পুনরনুরক্ত এবং বিদেশীয়গণকে সেই অপূর্ব্ব সাহিত্যের রসলিপ্সু করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য তিনি প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছিলেন। হায়! যদি তিনি আর মাত্র কয়েকদিন জীবিত থাকিয়া তাঁহার এই জীবনব্যাপী প্রচেষ্টার সফলতা দেখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে আমাদের ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণই থাকিত না। মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ যে কি কষ্ট, কি উদ্বেগ কি পরিশ্রম, ও কি অধ্যবসায়ের ফল, তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। স্বদেশ ও স্বজাতীর মঙ্গলার্থে প্রতাপ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং মরণেও তাহাই করিয়া গেলেন। প্রতাপের মৃত্যুতে সন্তপ্ত হইয়া লর্ডডফারিন ও কলিকাতার প্রধান বিশপ (পাদ্রী) গোয়েল্‌স্ যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা প্রতাপের মৃতাত্মার প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার নিদর্শন। প্রতাপের বিধবা পত্নী সুন্দরীবালা রায় এইরূপ বহুদেশ হইতে বহু শান্তনাপূর্ণ পত্রাবলী পাইয়াছিলেন। একজন নগন্য পল্লী-রাখালের মৃত্যুতে সমগ্র জগৎব্যাপী এরূপ শোকের অনুষ্ঠান নিশ্চিতই তাঁহার মৃতাত্মাকে অনন্ত স্বর্গের অধিকারী করিবে। আর আমাদের শ্লাঘা এবং শ্লাঘার বিষয় প্রতাপ আমাদেরই একজন।

প্রতাপ-চরিত্র।

আমার সহৃদয় পাঠকগণ! আপনারা প্রতাপকে পাঠ্য পুস্তকের মূল্য সংস্থান জন্য গঙ্গা হইতে নারিকেল কুড়াইতে দেখিয়াছেন,—জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁহাকে একাকী নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় কলিকাতার পথে পথে

ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছেন, দাসরূপে তাঁহাকে পরসেবা করিতে দেখিয়াছেন, এবং পরিশেষে তাঁহাকে মহাভারতের বাঙ্গালা ও ইংরাজী অনুবাদক, ভারতগবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত উচ্চপদবীপ্রাপ্ত জগৎমান্য পণ্ডিত প্রতাপ চন্দ্র রায় সি, আই, ই রূপেও দেখিয়াছেন। কিন্তু অবস্থার এই পরিবর্ত্তন প্রতাপ-চরিত্রে কোনরূপ গর্ব্বের ছায়াপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি যে প্রতাপ, বরাবর সেই প্রতাপই ছিলেন। তাঁহার আড়ম্বরহীন, সরল ও স্বচ্ছন্দ জীবনধারা ক্ষণতরেও আবিলতাসংযুক্ত হইতে দেখা যায় নাই। প্রতাপের এই উন্নতির প্রধান উপকরণ তাঁহার সবলতা, তাঁহার সৎসাহস, তাঁহার শ্রমশীলতা এবং তাঁহার মিতব্যয়িতা। যে দেশহিতৈষণা এবং সাহিত্যানুরাগের প্রেরণা তাঁহাকে ব্যাস ও বাল্মিকীর ন্যায় সাহিত্য-জগতে চির অমর করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তাঁহার নিজস্ব। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি, প্রতাপ না জন্মিলে মহাভারত কখনই ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইত না, এবং আর্য্য মনীষার অপূর্ব্ব জ্ঞান গরিমা সমগ্র সভ্য জগতে কখনই প্রচারিত হইত না। প্রতাপ লিখিয়াছেন—Homer lived as much for the Greeks—even modern Greeks, Vyasa and Valmiki lived as much for the Hindus as for other nations, capable of understanding them" — "হোমারের আবির্ভাব যেমন প্রাচীন ও আধুনিক গ্রীকগণের মঙ্গলবিধায়ক, ব্যাস এবং বাল্মীকির আবির্ভাবও সেইরূপ শুধু হিন্দু নহে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরও (যাহারা তাঁহাদিগকে বুঝিতে সক্ষম) মঙ্গল বিধায়ক।" ব্যাস ও বাল্মীকিকে বুঝিবার এই ক্ষমতা ও সুযোগ বিদেশীয়দিগকে প্রতাপই দান করিয়া গিয়াছেন।

সাংসারিক জীবনে প্রতাপের ন্যায় প্রেমময় পতি, স্নেহময় পিতা, সহৃদয় সুহৃদ এবং সদাশয় প্রভু জগতে একান্ত দুর্লভ। জীবনে তাঁহাকে

বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন ও বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট বহু লোকের সহিত সংসর্গ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই কখন প্রতাপের উপর বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইবার অবকাশ মাত্রও পান নাই। সারা জীবন অভাবের সহিত সংগ্রাম করিয়া দুঃখ কি তাহা তিনি বিশেষরূপেই অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার শান্ত, মধুর ও সরলতাপূর্ণ হৃদয়খানি দুঃখীর দুঃখ দূরীকরণ জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিত। প্রার্থীকে তিনি কখনই বিমুখ করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিজ জাতীয় এবং নিজ দেশীয় বহু ছাত্রকে তিনি বিনা ব্যয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন এবং অনেককে নিকটে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। নিজের জাতিটীকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং যাহাতে তাঁহার স্বজাতীয়গণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারতা বৃদ্ধি পায় এবং যাহাতে তাঁহাদের নৈতিক, মানসিক, আর্থিক ও পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হয় তৎপক্ষে তাঁহার একান্ত আগ্রহ ছিল। তিনিই প্রথমে নিজ ব্যয়ে ও নিজ বাসভবনে উগ্রক্ষত্রিয় জাতীয় সমিতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

১৮৯৬ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে প্রতাপ চন্দ্র রায় প্রকাশিত ইংরাজী অনুবাদ মহাভারতের শেষ (শততম) খণ্ড তাঁহার সাধ্বী পত্নী

প্রতাপ পত্নী সুন্দরীবালা রায়।

সুন্দরী বালা রায় কর্ত্তৃক সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়। সুন্দরী বালার বয়স তখন মাত্র ত্রয়োত্রিংশৎবর্ষঃ। পতিপুত্রহীনা সহায়-সম্পত্তিশূন্যা সুন্দরীবালা যে সৎসাহস ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা পর্দ্দানসিন্ হিন্দু রমণীর পক্ষে প্রায় দুর্লভ। এই মহীয়সী মহিলা তাঁহার স্বামীর শেষ উইল অনুসারে প্রতাপের জন্মস্থান শাকো গ্রামে গোলাপ সায়ের নামক সুবৃহৎ জলাশয় ও তত্তীরে প্রতাপেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া বিগ্রহের নিত্য সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। ১৯০১ খৃঃ অব্দের ২৮শে জানুয়ারী তারিখে সুন্দরী বালাও স্বামীর সহিত নিত্যধামে মিলিত

হইয়াছেন। প্রতাপ চন্দ্র রায় মহাশয়ের বিধবা কন্যা হরিদাসী, ইহার পর কিছুকাল জীবিতা ছিলেন। ইনি নিজ ব্যয়ে গোলাপ সায়েরের পঙ্কোদ্ধার ও মন্দির মেরামত করিয়া দিয়াছেন। হরিদাসী ১৯২৫ খৃঃ অব্দের ১২ই জুন পরলোকগতা হইয়াছেন। প্রতাপ চন্দ্র রায়ের দৌহিত্রী শ্রীমতী চণ্ডীদাসী রায় এবং তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র রায় মহাশয় জীবিত আছেন; কিন্তু ইঁহারাও নিঃসন্তান। দ্বিজেন্দ্র প্রতাপ-জীবনী সংগ্রহে আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

মহাভারত শেষে, বেদনাপূর্ণ চিত্তে সুন্দরী বালা লিখিয়াছেন—

মহাভারতের পরিসমাপ্তি।

The one object upon which my husband had set his heart is today accomplished. The last verse of the Mahabharata has been translated and published, and the translator has written the word *finis* at the conclusion of the Eighteenth *Parva.* Joy penetrates and illumines my heart. But that illumination is transient, very transient indeed! * * Where is he today that would have contemplated this completion with feelings of ineffeable bliss? The tree has today borne fruit. But where is he who had planted it with diffidence and nurtured with so much care? He saw the tree about to flower, but he was not spared to see the actual bloom. My sorrow knows no bounds! Life seems to ebb away from the body when I think of my misfortune. If he were alive—alive on even his last bed of sickness, I venture to think that the effect of joy

would have revived and renovated him !—মর্ম্মার্থ—"আমার স্বর্গীয় স্বামীর একমাত্র আন্তরিক অভিপ্রায় আজ সফল হইল। অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের শেষ শ্লোকটীর পর্য্যন্ত ইংরাজী অনুবাদ আজ সভ্যজগতে প্রচারিত হইল এবং অনুবাদক গ্রন্থ শেষে 'সমাপ্তি' কথাটি লিখিলেন। আনন্দে আমার হৃদয় আজ উচ্ছ্বসিত—কিন্তু সে আনন্দ অতি ক্ষণস্থায়ী।

* * * * *

কোথায় তিনি আজ, যিনি এই সমাপ্তি ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত ছিলেন! বৃক্ষ আজ ফলবান্—, কিন্তু কোথায় তিনি আজ, যিনি ইহাকে সযত্নে ও সস্নেহে রোপণ করিয়াছিলেন। তিনি এই স্নেহতরুটীকে মুঞ্জরিত দেখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রস্ফুটিত দেখিবার অবসর পান নাই! এই দুঃখ আমার অসীম! আমার দুর্ভাগ্য চিন্তা করিয়া আজ আমার জীবন দেহত্যাগে উদ্যত হইতেছে। যদি তিনি অন্তিম শয্যায় শায়িত থাকিয়াও তাঁহার এই সফলতা দেখিয়া যাইতে পারিতেন—আমার বিশ্বাস—তাহা হইলে, এই সফলতার আনন্দ আজ তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত ও নব বলে বলীয়ান করিয়া তুলিতে পারিত!" "মহাভারতের শেষ খণ্ড হস্তগত হইবার পর, স্যর এড্উইন্ আরনল্ড লণ্ডনের বিখ্যাত "ডেলি টেলিগ্রাফ" (২১শে জুন, ১৮৯৯ খৃঃ অঃ) সম্পাদকীয় স্তম্ভে "মৃতাত্মার বিজয়-বার্ত্তা" (A dead man's Victory)-শীর্ষকে লিখিয়াছিলেন—At last, however, to the wonder of all those scholars who can estimate the nature of the marvellous triumph atained the colossal Mahabharata has been rendered—and well and ably rendered—into English prose from its beginning to its end by the ardour and the devotion of Pratapa Chandra Ray C. I. E. He is dead, but his immense and

gallant toil was well nigh consumated before he laid down his worthy life, and his devoted widow the lady Sundari Bala Ray, has now crowned the unique glory of her husband's labour by finishing the wonderful and invaluable translation down to its last word and letter * * * Thus did Wifely Love crown learning, patriotism and devotion, and the resolute fidelity of this Hindu lady did thus fulfil for literature the splendid efforts of her consort. * * * Humblest of India's lovers, those who have themselves wondered in the golden jungles of the mighty Hindu poem,I lay this slight memorial of his life's work on Pratapa Chandra Ray's tomb like a spray of the *Asoka-tree* which puts an end to sorrow and to struggle, and brings along with its holy leaf renown, reward and repose."

মর্ম্মার্থ—"স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র রায় সি, আই, ই মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফলে,জগতের পণ্ডিত মণ্ডলীর বিস্ময়ের বস্তু বিশাল ও মহান মহাভারত আদ্যোপান্ত ইংরাজী ভাষায়, অতি সুন্দর ভাবে, অনুদিত হইল। তাঁহার এই বিপুল প্রচেষ্টার সফলতায় অল্পমাত্র কাল পূর্ব্বেই তাঁহাকে পরপারের আহ্বানে চলিয়া যাইতে হইলেও তাঁহার সাধ্বী পত্নী শ্রীমতী সুন্দরী বালা রায়, এক্ষণে তাঁহার পরিত্যক্ত এই বীরোচিত ও অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যটীর পরিসমাপ্তি করিলেন। * * পত্নী-প্রেম আজ, শিক্ষা, শ্রদ্ধা ও অনুরাগের মস্তকে সোনার মুকুট পরাইয়া দিল! এই হিন্দু মহিলার ঐকান্তিক পতিভক্তি, আজ তাঁহার পরলোকগত স্বামীর চিরপোষিত আকাঙ্খার সফলতা ও তৎসঙ্গে

সাহিত্য-জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিল। * * * ভারতের দীনাতিদীন ভক্ত এবং হিন্দু পুরাণরূপ সুবর্ণ-কাননের নগণ্য ভ্রামক, আমি আজ, স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র রায়ের জীবনব্যাপী প্রচেষ্টার প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ আমার এই তুচ্ছ স্মৃতি-ভাষণটী ক্ষুদ্র অশোক গুচ্ছের ন্যায় তাঁহার সমাধি-শিরে উৎসর্গ করিলাম। আমার ভরসা, অশোকের শোকাপহারিত্ব আজ সকল দুঃখ, সকল কষ্ট, অপসারিত করিয়া তৎস্থলে যশ, তৃপ্তি ও শান্তি আনয়ন করিবে!"

৺মদনমোহন সরকার

জন্ম— সন ১২৫০ সাল, ৬ই কার্ত্তিক, শনিবার

মৃত্যু— সন ১৩১৫ সাল, ৯ই মাঘ, শুক্রবার

কৃষ্ণনগর ও বাগাঁচড়ার সরকার-পরিবার।

সরকার পরিবারের কথা বলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বর্গীয় মদনমোহন সরকারের নাম মনে পড়ে। মদনমোহনের জন্ম-স্থান—নদীয়াজেলার শান্তিপুরের অদূরবর্ত্তী বাগাঁচড়া গ্রাম। এই গ্রাম প্রাচীন স্মৃতি-বিজড়িত; এখানে সিদ্ধপুরুষ প্রতিষ্ঠিত ৺বাগ্দেবীমাতার পীঠস্থান এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক ও জ্ঞাতি চাঁদ রায়ের আবাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ এখনও অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। মদনমোহনের ঊর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষগণ বর্দ্ধমান জেলায় বাস করিতেন। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে তাঁহারা বাগাঁচড়ায় উঠিয়া আসেন। মদনমোহন যখন বালকমাত্র, তখন তাঁহার পিতা নবীন চন্দ্র সরকার পরলোক গমন করেন। নবীনের চারি পুত্রের মধ্যে দুই জন অল্প বয়সেই মারা যান। অপর দুই পুত্রের নাম উমেশ চন্দ্র ও মদনমোহন। অল্প বয়সে পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় ইঁহারা বিশেষ কিছু লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগরে আসিয়া উমেশচন্দ্র ব্যবসায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা আরম্ভ করেন। ইঁহাদের মাতা তখনও জীবিত। ইঁহার ন্যায় ভগবদ্‌ভক্ত ও দেবভাবে অনুপ্রাণিত (inspired) মহিলা বিরল। শুনা যায়, একদা চোরে তাঁহার পুত্র-বধূর গহনা লইতেছিল। বাড়ীর লোকে তাঁহাকে এই খবর দেওয়ায় তিনি বলিলেন, "উহাকে লইতে দাও, বাধা দিও না। ও যে ঠাকুর।" কুকুর নিজেদের খাবার খাইতেছে দেখিয়া তিনি বলিতেন, "ও যে ঠাকুর, উহাকে কিছু বলিও না।" কৃষ্ণনগরে পুত্র মদনমোহনের সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া তিনি বলিলেন, "উহাকে

দেখিতে যাইবার কোন দরকার নাই , আমার ছেলে মারা যাইবে না।” সত্যই ইহা ঘটিল ; পুত্র আরোগ্যলাভ করিলেন। তিনি প্রত্যহ গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রী চণ্ডীমাতার পূজায় বিভোর থাকিতেন। প্রতিদিন তিনি একথানি নৈবেদ্য পশু পক্ষী জীব জন্তুর উদ্দেশ্যে বাহিরে রাখিয়া দিতেন। কেহ দায়গ্রস্ত হইয়া অর্থের প্রার্থী হইলে তাঁহার হাতে যদি টাকা না থাকিত, তিনি নিজের অলঙ্কার তাহাকে দিয়া বলিতেন, “বন্ধক দিয়া বা বিক্রয় করিয়া টাকা লও”। গৃহে যতক্ষণ কোন জিনিষের এক কণাও থাকিবে, ততক্ষণ কোন অতিথি বা প্রার্থীকে রিক্তহস্তে ফিরাইয়া দিবার আদেশ ছিল না। মদনমোহন এই পুণ্যবতী মাতার যোগ্য পুত্র। মদনমোহন টাকা ধার করিয়া পৃথকভাবে কৃষ্ণনগরে ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অচিরকাল মধ্যে তিনি লক্ষ্মীর অনুগ্রহলাভ করিলেন। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের উপর ব্যবসায়ের ভার দিয়া স্বগ্রামে জীবন অতিবাহিত করেন ও বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিবর্দ্ধন করেন। উমেশ ও মদনের সৌভ্রাত্র বর্ত্তমান কালে বিরল। উমেশের মাসিক খরচ, তাহার স্ত্রীর অসনভূষণ, পুত্রকন্যাগণের লেখাপড়া, বিবাহ প্রভৃতি সকল বিষয়ের ভারই মদন নিজ স্কন্ধে লইয়াছিলেন। মদন মোহন বাগাচড়ায় এবং কৃষ্ণনগরে যাহা কিছু স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি করিয়াছিলেন, প্রায় সকলেরই অর্দ্ধাংশ ভাইকে দিয়াছিলেন। এমন কি ব্যবসাও বরাবর দুই নামে ছিল। মদনের দুই বার বিবাহ হয়, প্রথম স্ত্রী অল্প দিনের মধ্যেই মারা যান। দ্বিতীয় বার তিনি নদীয়া জেলার নাটুদহ মহাজনপুর নিবাসী বিখ্যাত দেওয়ানেরবেড়ের মিত্রবংশে দার-পরিগ্রহ করেন। রায় জলধর সেন মহাশয়ও এই বংশে বিবাহ করেন। ইহারা দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের বংশধর। এই মিত্র পরিবার বহুগোষ্ঠী ও প্রধানতঃ মহাজনপুরে সুপ্রতিষ্ঠিত। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মদন মোহনের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নদীয়া জেলায় ব্যাপ্ত হইয়া

পড়ে। পাড়ার লোকে তাঁহাকে কৃষ্ণনগরের Rothschild বলিয়া সময়ে সময়ে উপহাস করিত। তাঁহার বিশেষত্ব এই যে, তিনি শুধু mammon-worshipper ছিলেন না। অর্থাৎ টাকার পিছনেই ছুটেন নাই; তিনি স্বগ্রামবাসী আত্মীয়স্বজন, দরিদ্র, অসহায় এবং বিপন্ন জনের পরম বন্ধু ছিলেন। মদনমোহন ধার্ম্মিক, দানশীল ও সামাজিক ছিলেন। তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ এরূপ সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং চতুস্পার্শস্থ ৭।৮ খানি গ্রামের দরিদ্রনারায়ণকে এরূপে তৃপ্ত করিয়াছিলেন যে, আজিও বয়োবৃদ্ধ গ্রামবাসিগণের হৃদয়ে তাহার স্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে। একদা জনৈক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে মদনমোহনের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। সহৃদয় মদনমোহন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তিন শত টাকা দান করিলেন। এই ঘটনা তাঁহার কৃষ্ণনগরস্থ বাসভবনের এক নির্জ্জন কক্ষে ঘটিয়াছিল; সুতরাং সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় ঘোষিত হয় নাই। নিজগ্রাম বাগাচড়ার পাদদেশ স্বচ্ছতোয়া গোপেয়ার বিলদ্বারা ধৌত। এই বিল ভাগিরথীতে গিয়া পড়িতেছে। ইহার জলের গতি রোধ করিতে না পারিলে পার্শ্ববর্ত্তী ৪।৫ খানি গ্রামের লোকের অত্যধিক জলকষ্ট হয়। মদনমোহন ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্র উভয়ে এই বিলের উপরে এক পাকা বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া পল্লীবাসিগণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মদনমোহন বহু দরিদ্র ছাত্রকে স্কুলের বেতন দিতেন।

মদনমোহন নিজ বুদ্ধিবলে প্রভূত উন্নতি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশের উন্নতির ভিত্তি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। ("Madanmohan was a self-made man and he was the founder of the greatness of the house of the Sarkars.") তিনি দারিদ্র্যনিবন্ধন ইংরাজী ভাষায় বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া পুত্রগণের শিক্ষা বিষয়ে অবহিত ছিলেন। শুধু স্কুলে পাঠাইয়া

এবং গৃহ-শিক্ষক (tutor) নিযুক্ত করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না; ছেলেরা যাহাতে সরলভাবে জীবন যাপন করে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। আমাদের দেশের মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণের উপদেশাবলী শৈশব হইতেই তাহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজ গ্রামকে তিনি ভাল বাসিতেন। গ্রামের বাটীতে লক্ষ্মী বিরাজমান ছিলেন;—গোলাভরা ধান, চাষীদের যাতায়াত, গরুবাছুর প্রভৃতি ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিত। প্রতি বৎসর শ্যামাপূজার সময় বাড়ী আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইত। পূজার বাদ্যে, শঙ্খ-ঘণ্টারবে, লোকজনের সমাগমে ও নানাপ্রকার আনন্দ উৎসবে পল্লী যেন তাহার হৃতশ্রী ফিরিয়া পাইত। বৎসরের মধ্যে আর একবার সরকার-বাড়ীতে আনন্দের প্রবাহ ছুটিত। সেটি হইত গ্রীষ্মের ছুটিতে আমের সময়। গ্রামে সরকারদের ১০।১২ খানি আম-বাগান। সরকার বাড়ীর ছেলের দল—একটি regiment বা বালকসৈন্যদল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—যখন বাগান হইতে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি লইয়া ফিরিত—সে, এক সুখকর দৃশ্য! কলিকাতার 'রূপেয়া মে বিশ্ ঠো' আম খাওয়ার তৃপ্তি অপেক্ষা এইরূপ আম খাওয়ার তৃপ্তি হাজার গুণ বেশী। মদনমোহনের সময়ে "The cry of back to the village"—পল্লীর দিকে ফিরিবার আহ্বান শোনা যায় নাই। কিন্তু অল্প বয়স হইতেই যাহাতে স্বগ্রামের প্রতি সন্তানগণ আকৃষ্ট হয়, সেজন্য তিনি নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। দেশের ও দশের মঙ্গল অনুষ্ঠানে তিনি উৎসাহ দিতেন। কর্তৃপক্ষ যখন কৃষ্ণনগর কলেজ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন, তখন কলেজ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যে অর্থ-সংগৃহীত হয়, তিনি চাঁদাস্বরূপ তাহার কিয়দংশ দিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন বাঙ্গালীর নূতন নূতন অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠে,

তখন তিনি বঙ্গলক্ষ্মী কটন্ মিল এবং নদীয়া স্বদেশী ষ্টোর্স্ প্রভৃতির অংশ ক্রয় করেন। রাজনীতি-বিষয়ে তিনি মধ্যপন্থী (moderate) ছিলেন।

মদনমোহনের ছয় পুত্র ও দুই কন্যা হয়। পুত্রগণ সাবালক হইবার পূর্ব্বেই তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে উনষাটি বৎসর বয়সে জ্বররোগে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার সন্তানগণের শিক্ষা অসমাপ্ত ও আদরের কন্যা দুইটিকে অবিবাহিত রাখিয়া এবং বহু আশা, আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তিনি চিরবাঞ্ছিত অমরধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী—নীরদবরণী 'ভাল মানুষ, হইলেও সতীসাধ্বী, গৃহলক্ষ্মী—উদার, দানশীল, অমায়িক, আত্মীয়পোষক ও দরিদ্রের সহৃদয় বন্ধু। এরূপ পুণ্যবতী মাতার আদর্শে এবং স্বর্গগত মহৎ পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদে পুত্রগণ প্রায় সকলেই লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া নিজেদের চরিত্রবলে এবং সমাজ ও স্বদেশ-সেবা দ্বারা দেশবাসিগণের ভালবাসা ও স্নেহ অর্জ্জন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ সরকার, এম্. ডি. (হোমিও) কৃষ্ণনগরে চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। মধ্যম শ্রীভূপেন্দ্র নাথ সরকার, বি. এ. বি. টি., শিক্ষাদানব্রত অবলম্বন করিয়া কলিকাতা হিন্দু স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয়ে যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে তিনি কৃষ্ণনগরে কলেজিয়েট স্কুলে আছেন। তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীপ্রফুল্ল কুমার সরকার এম্.এ., বি. টি. ইউরোপে শিক্ষা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া এডিনবরা ও ডবলিনে শিক্ষা বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা (Diploma in Education) পরীক্ষা এবং আরও ২।১টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন। চতুর্থ শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার, এম্. এ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। 'বিলাত যাইবার সরকারী বৃত্তি (State scholarship) ইহার পক্ষে সহজলভ্য ছিল। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই পদ ত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহোদয়ের প্রেরণায় অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং কারাবরণ করেন। ইনি নদীয়া জেলার অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (Bengal Legislative Council) স্বরাজী সদস্য নির্ব্বাচিত হন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বঙ্গীয় স্বরাজ্যদলের সহিত তাঁহার মতভেদ হওয়ায় তিনি মধ্য ভারতের দেওযাস্ নামক করদ রাজ্যের মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইয়া কিছু দিন কাজ করেন। এই পদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া তিনি বর্ত্তমানে প্রজা ও শ্রমিকদলের অন্যতম সভ্য হইয়া দেশসেবা করিতেছেন এবং জীবনবীমা সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কৃষ্ণনগর দরিদ্রভাণ্ডারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চম ভ্রাতা ইন্দুভূষণ যখন কৃষ্ণনগর কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন, তখন তাঁহার বাল্যবন্ধু স্থানীয় জমিদার রামদুলাল চেৎলাঙ্গিয়ার মৃত্যুতে ম্রিয়মাণ হইয়া বন্ধু সকাশে প্রয়াণের উদ্দেশ্যে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যা পাপজনক হইলেও বন্ধুর জন্য এরূপ মৃত্যু জগতে বিরল। স্বয়ং দেশপূজ্য সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "বেঙ্গলী" পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইহার মৃত্যু লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। "Wives have died for their husbands, sisters for their brothers, sons for their fathers; but we look in vain for a record of immolation, similar to this on the altar of loving and undying friendship. It is a loss to the community that it should be thus prematurely deprived of this splendid wealth of the purest affection. * * * " "ভারতবর্ষ", "নায়ক" প্রভৃতি পত্রিকাও ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান বিভূতিভূষণ সরকার জামালপুরে মেক্যানিকাল ও

ইলেক্‌ট্রিকাল্ এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিখিতেছেন। ইনি যোগ্যতাসহকারে B' Final পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ এখনো অবিবাহিত। অন্যান্য ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ সকলেই সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহ করিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাইগ্রামের বিখ্যাত বসুমুন্সী-জমিদার বংশে লীলাবতীর বিবাহ হইয়াছিল। লক্ষ্মী লীলাবতী এখন পরলোকে, দ্বিতীয় বোন বিভাবতীর বিবাহ নৈহাটী-মিত্র-পাড়া নিবাসী উন্নতিশীল ঘোষ মজুমদারবংশে হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্র নাথ গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরের সম্ভ্রান্ত মিত্র বংশের মেয়ে শ্রীমতী মৃণালিনীকে বিবাহ করিয়াছেন। এই মিত্র পরিবারের আদি নিবাস ছিল—হালিসহরে। বর্ত্তমানে জ্ঞানেন্দ্র নাথের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। মধ্যম ভ্রাতা ভূপেন্দ্র নাথ প্রথমে চন্দননগরের সুপরিচিত ঘোষ বংশের কন্যা স্নেহলতার পাণিগ্রহণ করেন। স্নেহলতার চরিত্রের এরূপ কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল যাহা সাধারণতঃ অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। দেড় বৎসর পরেই স্নেহলতা স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরলোক গমন করেন। কলিকাতা কুমারটুলিনিবাসী সম্ভ্রান্ত মিত্রপরিবার দুহিতা শ্রীমতি প্রমীলার সহিত ভূপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইয়াছে। প্রফুল্ল-কুমার কলিকাতাস্থ টালানিবাসী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ সেনের কন্যা শ্রীমতী সুসমাকে বিবাহ করিয়াছেন। নানা কারণে প্রফুল্লকুমার ২৪ পরগণার অন্তর্গত সুপরিচিত ঘোষ রায় চৌধুরী বংশে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই বংশ বল্লালসেনের সময় হইতে প্রতাপাদিত্যের সময় পর্য্যন্ত দক্ষিণ দেশ শাসনের সহিত সংলিষ্ট ছিলেন। পুরাকালের প্রস্তরনির্ম্মিত বুদ্ধ, বিষ্ণু ও সূর্য্য মূর্ত্তিগুলি এখনও ইহাদের বসতবাটীতে ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায়। বরিশাল বানরীপাড়ার খ্যাতনামা গুহঠাকুরতাবংশের কন্যা শ্রীমতী সুধীরাকে হেমন্ত কুমার বিবাহ করিয়াছেন। শ্রীমতী সুধীরা গ্র্যাজুয়েট। ভূপেন্দ্রনাথের

বর্ত্তমানে এক কন্যা ও এক পুত্র। প্রফুল্লকুমারের এক পুত্র ও হেমন্ত কুমারের দুই পুত্র।

কৃষ্ণনগরের সরকার-ভ্রাতৃগণ অমায়িক, হৃদয়বান, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, পরহিতব্রত, উদারচেতা ও মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত। জ্ঞানেন্দ্রনাথের অনুগ্রহে শত শত দরিদ্র রোগী বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইতেছে। ইনি স্বর্গীয় মহাত্মা ব্রজলাল অধিকারী মহাশয়ের ভক্ত-শিষ্য। ভূপেন্দ্রনাথ প্রফুল্লকুমার ও ইন্দুভূষণ ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের চেষ্টায় প্রতি রবিবারে ইঁহাদের বাড়ীতে গুরুভ্রাতৃগণের সম্মেলনে ধর্ম্মালোচনা হয়। হোমিওপ্যাথির প্রচারে ইনি সতত সচেষ্ট। কৃষ্ণনগরের দরিদ্র ভাণ্ডার ইঁহা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। নৈশ বিদ্যালয়, নবদ্বীপের মাতৃমন্দির প্রভৃতি বহু সদনুষ্ঠানের সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট। ইনি বাঙ্গালী পল্টনের Nadia Recruitment Committeeর অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। আমেরিকার বিখ্যাত "হোমিওপ্যাথিক রেকর্ডার' পত্রে (Homeopathic Recorder) জ্ঞানেন্দ্রনাথের কালাজ্বর-চিকিৎসাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া স্থানীয় সংবাদ পত্রেও ইঁহার পত্র বা প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে বাহির হয়। স্বগ্রাম বাগাঁচড়ার প্রতি ইঁহার অনুরাগ অটুট রহিয়াছে।

ভূপেন্দ্রনাথের শিক্ষকতায় একটু বিশেষত্ব আছে। তিনি ছাত্রদিগকে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া নিজের মূল্যবান সময় ও অর্থ অকাতরে বিলাইয়াছেন। ইহার ফলে স্বাস্থ্যহানি ঘটিলেও তাঁহার সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। ইনি চিন্তাশীল লেখক ও লণ্ডনের নিউ এডুকেশন্ ফেলোসিপের (New Education Fellowship London) সভ্য। শ্রীমতী বেসান্তের "Commonwealth" পত্রিকায় ইহার লিখিত "India—Her Future and her Mission" শীর্ষক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। Amritabazar Patrika, the Calcutta Review,

the Welfare, ভারতবর্ষ, শিক্ষক প্রভৃতি পত্রিকায় ভূপেন্দ্রনাথের সমবায় ও শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথিতনামা Nesfieldএর ইংরাজী ব্যাকরণের কয়েকটী ভুল প্রদর্শন করায় Macmillan company তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থায় কোন পুস্তক সম্বন্ধে অধ্যাপকের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় ইনি বিলাতে গ্রন্থকার, সাহিত্যিক ও অধ্যাপক Sir Walter Ralieghকে পত্র লিখিয়াছিলেন। গ্রন্থকার র‍্যালে ভূপেন্দ্রনাথের মতের পোষকতা করিয়াই পত্র লেখেন। গুণগ্রাহী ছাত্রবৎসল বাঙ্গালী অধ্যাপক মহাশয় উহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের অবৈতনিক নৈশ-বিদ্যালয় ও দরিদ্র ভাণ্ডারের জন্য ইনি যথেষ্ট শ্রম-স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া D. L. Roy Memorial, Nadia Economic Association, Students' Club, All Bengal Goverment School Teacher's Association প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সহিত ইনি জড়িত ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথের আদর্শ, ভালবাসা ও ত্যাগ তাঁহার ছাত্রদিগের হৃদয়ে আজিও অঙ্কিত আছে।

প্রফুল্লকুমার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে Presidency College Magazine, Bengal Literary Society প্রভৃতি অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও ধুরন্ধরস্বরূপ অধ্যাপক ও ছাত্রগণের নিকট আদৃত হইয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তাঁহার চিত্রাঙ্কনের দিকে ঝোঁক ছিল। ইতিহাস, কলাবিদ্যা, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ইনি Indian Review, Cosmopolitan, Amritabazar Patrika, Presidency College Magazine, প্রবাসী, ভারতবর্ষ ইত্যাদি পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইনি নদীয়া সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। কৃষ্ণনগরের নৈশ-বিদ্যালয়, Nadia Economic Association প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সহিত ইনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট

ছিলেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতনে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। ঐতিহাসিক তথ্য-অনুসন্ধানে ইহার খুব উৎসাহ দেখা যায়। ইনিই সরকার-বংশে সর্ব্ব প্রথম ইউরোপ গমন করেন। সেখানে আড়াই বৎসর থাকিয়া ইনি শিক্ষা-বিভাগের চর্চ্চা করেন এবং বহু শিক্ষা-অনুষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া আসিয়া স্বদেশে শিক্ষাদান কার্য্যে লিপ্ত আছেন। ওভারটুনহল প্রভৃতি যুব শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে প্রফুল্লকুমার মধ্যে মধ্যে নব শিক্ষাবিষয়ে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। প্রফুল্লকুমার বিলাত ফেরতা হইলেও দেশীয় আচারব্যবহার ত্যাগ করেন নাই। ইনি স্বর্গীয় প্রভু জগদ্বন্ধুর পরম ভক্ত; কৃষ্ণনগরে "বন্ধু আশ্রম" প্রতিষ্ঠাবিষয়ের ইনি অন্যতম উদ্যোক্তা। ইনি "Message of Hope" প্রভৃতি পুস্তকের প্রণেতা।

হেমন্তকুমার ছাত্রাবস্থা হইতেই কর্ম্মী। কৃষ্ণনগরের অবৈতনিক নৈশ-বিদ্যালয়ের (Krishnagar Working-men's Institute) ইনি প্রতিষ্ঠাতা। ছাত্রাবস্থাতেই তরুণ দেশ-নেতা শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসুর সহিত ইনি বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন। অধ্যাপক অবস্থায় হেমন্তকুমার কলিকাতায় Indian Book Club-নামক পুস্তকের দোকান স্থাপিত করেন। ইনি "Intellectual Laws of Language" নামক বাংলাভাষাতত্ত্ববিষয়ক গবেষণাপূর্ণ পুস্তক এই সময়ে রচনা করেন। এই ছাত্রের গুণে আকৃষ্ট হইয়া স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় ইহাকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর ইনি দেশবন্ধুর সহকারী বা পার্শ্বচর-স্বরূপ বঙ্গদেশ ও আসামের বহু স্থানে পরিভ্রমণ করেন ও দেশবন্ধু সম্পাদিত "বাংলার কথা" পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কাজ যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করেন। Indian Review, Forward, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বিজলী, আত্মশক্তি, নারায়ণ, জাগরণ প্রভৃতি

পত্রিকায় ভাষাতত্ত্ব, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ ইনি লিখিয়াছেন। কারামুক্ত হইয়া ইনি "বন্দীর ডায়েরী" প্রকাশ করেন। "The Revolutionaries of Bengal," "সুভাষচন্দ্র", "স্বরাজ কোন্ পথে ?" "যুগশঙ্খ," "ছায়াবাজী", "পষ্টো কথা", "ধাপার মাঠ", "সহজিয়ার স্বপ্ন" প্রভৃতি পুস্তকের ইনি রচয়িতা। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে আয়ব্যয়-আলোচনাকালে ইনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার জন্য ইনি "Statesman"-প্রমুখ পত্রেরও প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। প্রধানতঃ প্রজাদের স্বার্থ ও স্বত্ব-স রক্ষণে সচেষ্ট হওয়ায় ইনি স্বরাজ্য-দল হইতে বিচ্ছিন্ন হন। দেওয়াস্ রাজ্য ছাড়িয়া আসার পর ইনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত এবং সাপ্তাহিক "জাগরণ"-পত্রিকার পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের যে অধিবেশন হয়, ইনিই তাহার উদ্যোক্তা। Bengal Legislative Councilর কয়েক জন সভ্য ও স্বদেশপ্রেমিক কবি কাজি নজরুল ইসলাম প্রভৃতি কর্ম্মীকে লইয়া ইনি বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল গঠন করেন এবং "লাঙ্গল" পত্রিকা-প্রকাশে সহায়তা করেন। নিজে যাহা সত্য বলিয়া বুঝেন, তাহা প্রকাশ করিতে ইনি দ্বিধাবোধ করেন না। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও বাল্যবন্ধু সুভাষচন্দ্রকেও তিনি খাতির করেন নাই। স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, ত্যাগ ও কর্ম্মের দ্বারা ইনি বঙ্গদেশের অন্যতম নেতারূপে পরিগণিত হইয়াছেন। দেশ-নেতাদের বিরূপ ভাব দেখিয়া ইনি বর্ত্তমানে বিষয়-কর্ম্মের দিকেও একটু আকৃষ্ট হইয়াছেন। হেমন্তকুমার তাঁহার পিতামাতার—তথা বঙ্গজননীর একজন কৃতী সন্তান। কনিষ্ঠ বিভূতিভূষণ এখনও ছাত্র। আর-এল গিলক্রাইষ্ট, ডব্লিউ-সি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ই-এফ ওটেন, পরলোকগত অধ্যক্ষ মিঃ জেম্‌স সকলেই সরকার-ভ্রাতাদের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺অক্ষয়কুমার দত্ত, বহরমপুরের ৺রায় বাহাদুর নিত্যচরণ নাগ, অবসরপ্রাপ্ত জজ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম-এল-সি, ঢাকার উকিল শ্রীযুক্ত বিভূচরণ গুহঠাকুরতা, টালা মহিলা সমিতির সুযোগ্য সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী সেন, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ রায় বাহাদুর দীননাথ সেন, ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, রায় বাহাদুর জলধর সেন, অবসরপ্রাপ্ত কমিশনর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে, শুঁড়ার ৺বিহারীলাল চন্দ্র প্রভৃতির সহিত সরকার-পরিবারের আত্মীয়তা আছে।

সরকার-পরিবারের ছেলেমেয়েরা পূর্ব্বপুরুষদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করিয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করুন, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক কামনা।

বংশ-লতা
পরশুরাম সরকার
শুকদেব সরকার
ব্রজকিশোর সরকার
গোরাচাঁদ সরকার
হারাণচন্দ্র (উকীল)
নবীনচন্দ্র
পরাণচন্দ্র (সন্ন্যাসী)
রামচন্দ্র (সন্ন্যাসী)
লক্ষ্মণচন্দ্র (সন্ন্যাসী)
উমেশ
ভূমেশ
মদনমোহন
হরিমোহন
জ্ঞানেন্দ্র
ভূপেন্দ্র
প্রফুল্ল
হেমন্ত
ইন্দু (মৃত)
লীলাবতী (মৃত)
বিভাবতী
বিভূতি
অমিতাভ (মৃত)
লতিকা
চাঁদ
মদনকুমার
প্রণবকুমার
মানবেন্দ্র
গণেন্দ্র
উমারাণী
সাবিত্রী
কনক
গৌরী
৺মন্থ
ব্রহ্মানন্দ
বাসুদেব
কৃষ্ণকালী
গৌরীশঙ্কর

৺ষষ্ঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুলেমেল বন্দিঘাটি গঙ্গধড় স্বভাব

জিলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত পলাশডাঙ্গা গ্রামে শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতামহ অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাস করিতেন এবং বিষয়াদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কালাতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পুত্র শ্রীনাথচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন এবং গ্রাম্য পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া পিতার ন্যায় বিষয়াদি ভোগে কালযাপন করিতেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীও একটী কন্যা প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপর শ্রীনাথবাবু তৃতীয় বার বিবাহ করেন; তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে সন্তানাদি না হইলে চতুর্থ বার বিবাহ করেন। চতুর্থ বিবাহের কিছুদিন পরে তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে জগদীশ নামক এক সন্তান হয়। তিনি এক্ষণে পুলিশ কোর্টে ও আলিপুর জজকোর্টে ওকালতী করিতেছেন; জগদীশবাবুর মাতা রামকালী ও রামকুমার নামক আরও দুইটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন; উঁহারা এক্ষণে বাড়ীতেই আছেন।

শ্রীনাথবাবুর চতুর্থ পত্নীর গর্ভে সন ১২৮০ সালের ১৩ই কার্ত্তিক পলাশডাঙ্গা গ্রামে স্বনামধন্য পুরুষ শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম হয়। বাল্যাবস্থায় নিজ গ্রামে বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া তিনি নন্দীরাজপুরগ্রামে ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং ঐ বিদ্যালয় হইতে যশের সহিত ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে রাণীগঞ্জের হাই স্কুলে প্রবিষ্ট হন। দুই বৎসর কাল তথায় পড়িয়া বিশেষ কোন কারণবশতঃ পড়া বন্ধ করেন। ইঁহার মাতামহ নন্দীগ্রামে বাস করিতেন এবং তাঁহার কিছু জমিদারীও ছিল; মাতামহের পুত্র না থাকায়

শ্রীভক্ত রামকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীর নকিঙ্করবাবু মাতামহের সেই সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। ১২৯৮ সালে আষাঢ় মাসে তিনি বীরভূম শিউড়ি-স্থিত বাবু করালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শৈবলিনী দেবীকে বিবাহ করেন। অতঃপর রাণীগঞ্জ বেঙ্গল কোল কোম্পানীতে তিন বৎসর কার্য্য শিক্ষা করেন; পরে উক্ত কোম্পানীর লায়েকডী কোলিয়ারীতে রেজিং কণ্ট্রাক্টরীর কার্য্য করেন। ১৩০৩ সালে চৈত্র মাসে তাঁহার মাতামহীর মৃত্যু হইলে তিনি কোলিয়ারীর কার্য্য ত্যাগ করিয়া মাতামহের জমীদারী পরিদর্শন করেন। তাঁহার মাতার নাম ইচ্ছাময়ী দেবী। পরে নন্দীগ্রামে নন্দী কোলিয়ারীতে কার্য্যে প্রবেশ করেন। তথায় দুই বৎসরকাল কার্য্য করিয়া কয়লার দালালী আরম্ভ করেন। পরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে হইতে বেনাকুড়ি কোলিয়ারীতে কয়েক মাস রেজিং কণ্ট্রাকটরী করেন। তাহার পর কয়েক বৎসর জে. সি. মার্টিনের তরফে জেনারেল্ পাওয়ার অফ্ এটর্নী নিযুক্ত হইয়া তাঁহার কোলিয়ারীর মালি-মোকদ্দমার তত্ত্বাবধান করেন। ১৯১১ খৃঃ হইতে বেনেহিড় ষ্টাণ্ডার্ড কোল কোং লিমিটেডে তিনি রেজিং কণ্ট্রাকট রর কার্য্য করিয়েছেন।

বর্ত্তমানে ইঁহার চারি পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র সাতকড়ি রেজিং কণ্ট্রাকটরী করিতেছেন। মধ্যম বগলানন্দ জমীদারী সেরেস্তায় কাজ-কর্ম্ম করিতেছেন। তৃতীয় বিরজানন্দ বাটীতে থাকিয়া বিষয়াদি পরিদর্শন করেন। কনিষ্ঠ পূর্ণানন্দ ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছে এবং সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস হইয়াছে। প্রথমা কন্যার বিবাহ হইয়াছে বাঁকুড়া জিলার ময়নাপুর গ্রামের জমীদার এম-বি ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত; মধ্যমা কন্যার বিবাহ হইয়াছে হাওড়া শিবপুর ৪৪নং কালীকুমার মুখার্জ্জি লেন-স্থিত সবজজ ৺অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সুরনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত; সুরনাথবাবু

রায় বাহাদুর স্বর্গীয় দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সি-আই-ই মহাশয়ের দৌহিত্র এবং কলিকাতা হিন্দু স্কুলের ড্রইং মাষ্টার; কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে বাগবাজার ২৮।৪ এ, নিবেদিতা লেন-স্থিত নির্ব্বিকারচরণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সহিত; ইনি মেডিকেল কলেজে M. B. (ডাক্তারী) পড়িতেছেন।

শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিবারবর্গ

শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোরাবাদীর বাঙ্গলা (bunglow

গোরাঙ্গীর জমিদারী কার্যালয়

নন্দীতে প্রাসাদোপম বাটী

বংশ-লতা
স্বভাব ফুলে
৺ষষ্ঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
রামচন্দ্র
রামভদ্র
রামনাথ
মথুরেশ
যাদবেন্দ্র
মহাদেব
শিবরাম
পঞ্চানন
আত্মারাম
গোকুল
শ্যামচাঁদ
নয়নচাঁদ
কৃপারাম
লক্ষ্মীকান্ত
রমাকান্ত
শ্রীকান্ত
উমাকান্ত
রামকান্ত
অম্বিকাচরণ
বৈদ্যনাথ
যজ্ঞেশ্বর
গঙ্গাধর
তারাঠাকুরাণী
ঈশানচন্দ্র
রমেশচন্দ্র

- রমেশচন্দ্র
  - সতীশচন্দ্র
  - জ্যোতীশ
  - শিরীষ
    - সমীরনাথ (রায় বাহাদুর মল্লিনাথ রায়ের ভাগিনেয়)

—০—

- বৈদ্যনাথ
  - (দৌহিত্র) কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
    - পুত্র
      - কমলাপতি
      - উমাপতি
      - রমাপতি

- ঈশানচন্দ্র
  - কালীপ্রসন্ন
    - প্রমোদ
    - (ভগ্নী) গিরিবালা দেবীর পুত্র
      - বিজনবিহারী
      - বসন্তবিহারী
      - পুলিনবিহারী

—০—

- অম্বিকাচরণ
  - শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
    - জগদীশ
    - রামকালী
    - রামকিঙ্কর
      - সাতকড়ি — ৪ পুত্র
      - বগলানন্দ — ৩ পুত্র
      - বিরজানন্দ — কন্যা ২টী
      - পূর্ণানন্দ — বিবাহ হয় নাই
    - রামকুমার
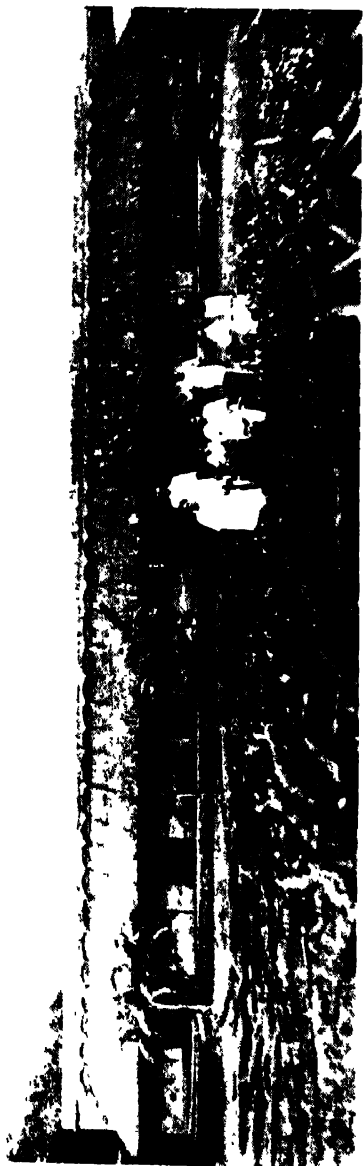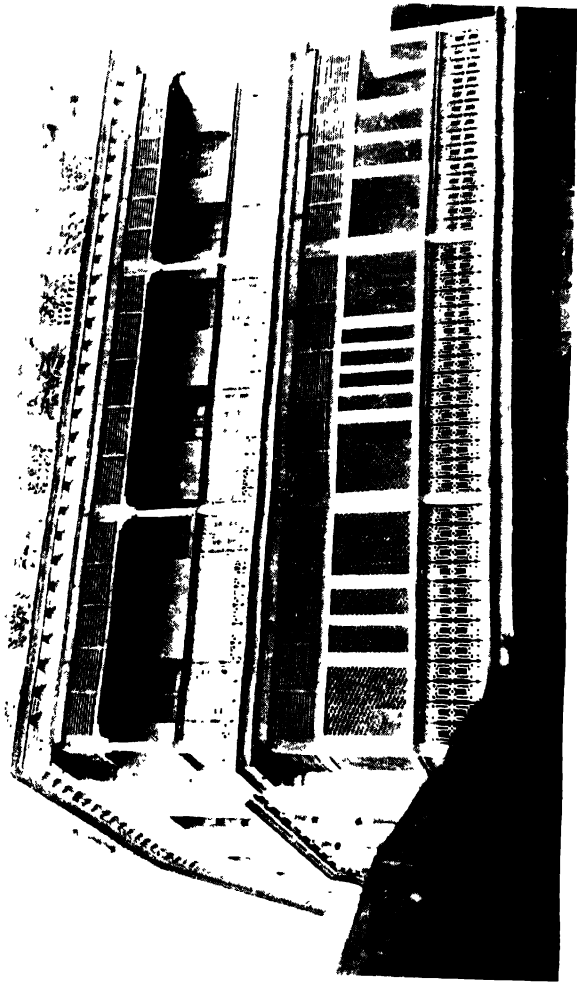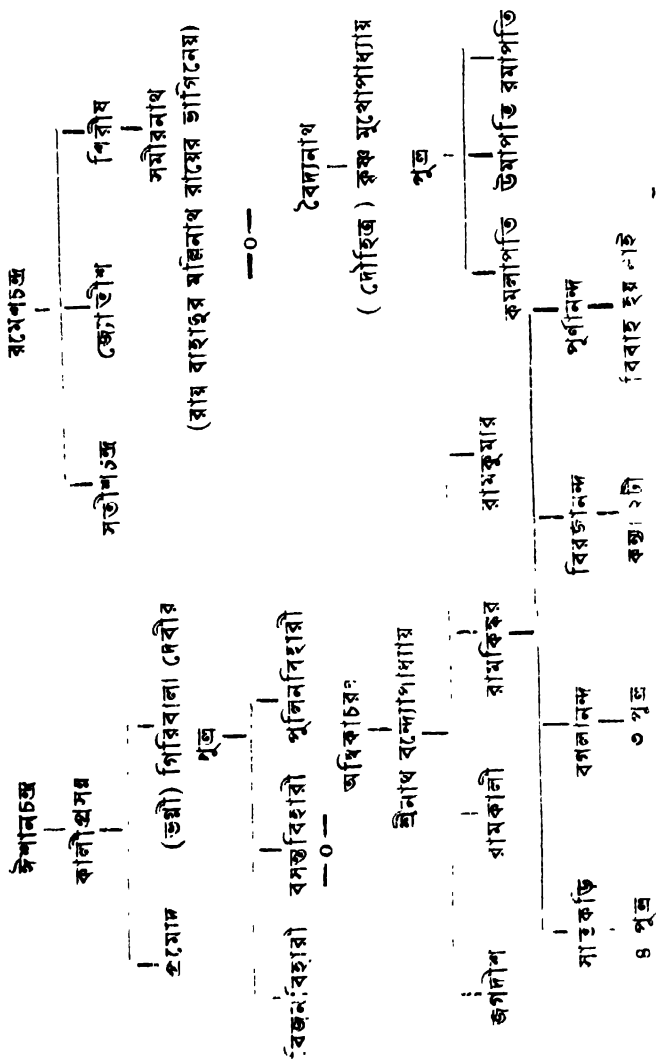
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চৌধুরী

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চৌধুরী

সন ১২৮৩ সালের ১১ই চৈত্র শুক্রবার শুভ রামনবমীর দিবস হুগলী জেলার অন্তর্গত ভাণ্ডারহাটী গ্রামে অতুলচন্দ্র চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমেশচন্দ্র চৌধুরী; মাতার নাম গিরি-বালা দেবী। অতুলচন্দ্র যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বংশ-মর্য্যাদায় সে বংশ খুব প্রাচীন ও উচ্চ। ভাণ্ডারহাটী চৌধুরী-বংশ একটী বিখ্যাত বংশ। অতুলচন্দ্রের পিতার অবস্থা তত স্বচ্ছল ছিল না; ভাণ্ডারহাটীতে সামান্য বাসভবন ও জমিজমা ভিন্ন বিশেষ আর কিছু ছিল না। তিনি কলিকাতার গোপালচন্দ্র রায় কোম্পানীর কারবারে অংশীদার ছিলেন। অতুলচন্দ্র পিতার একমাত্র পুত্র, অতুলচন্দ্রের তিনটি ভগিনী। অতুলচন্দ্রের পিতা প্রথমতঃ অতুলকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেন। অতঃপর ভাণ্ডারহাটী মাইনার স্কুলে প্রবিষ্ট হন; তাহার পর লেখাপড়া শিখিবার জন্য অতুলচন্দ্রের পিতা তাহাকে কলিকাতায় আনেন। বীণাপাণির আরাধনা করা অতুলচন্দ্রের ভাগ্যে বড় ঘটিয়া উঠে নাই। অতুলচন্দ্রের বয়ঃক্রম যখন চৌদ্দ বৎসর মাত্র তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিবার পরই হঠাৎ ১২৯১ সালের ২৮শে ফাল্গুন ইঁহার পিতা ইঁহাকে ও তিন কন্যাকে রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তখন অতুলচন্দ্র বালক মাত্র; তাঁহার জনৈক পিতৃবন্ধু ৺তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতুলচন্দ্রের সাহায্য জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাত-পুত্র অনুকূলচন্দ্র চৌধুরীকে ঐ গোপাল রায় কোম্পানীর কারবারে রাখিয়া দেন। তারাচরণ বাবুর ঐ কারবারে প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সাহায্য বেশীদিন স্থায়ী হইল না। এক বৎসর পরে তিনি অতুলের সংসার প্রতিপালন করিতে বা তাহাকে পড়াইতে অস্বীকৃত হন।

তাহাতে তারাচরণবাবু পুনরায় চেষ্টা করিয়া অনুকূলবাবুর স্থলে অতুলকে শিক্ষানবীশ-রূপে ১২৲ বেতনে ঐ কারবারে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

সেই সময় হইতেই এই বালকের উপর সংসারের সমস্ত ভার পতিত হয়। পিতার মৃত্যুর পরই আর্থিক দুরবস্থা হেতু অল্পবয়সেই পাঠ সমাপন করিয়া অতুলচন্দ্র চাকুরী করিতে বাধ্য হন। তখন কেহই জানিত না যে, কালে এই বালক দেশের মধ্যে একজন সমৃদ্ধিশালী হইয়া সংসারের অশেষ কল্যাণ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইবেন। অতুলচন্দ্র একাদিক্রমে সাত বৎসর কাল গোপালচন্দ্র রায়ের দোকানে কার্য্য করেন। এই কার্য্য করিতে করিতেই তিনি হুগলী জেলার বহবমপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী রাখাল দাসী দেবীর শুভ পাণিগ্রহণ করেন। তখন ইঁহার বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। এই বিবাহেই প্রকৃত পক্ষে অতুলচন্দ্রের লক্ষ্মীলাভ হয়। যখন অতুলচন্দ্র চাকুরীতে নিযুক্ত সেই সময়ে ইঁহাকেই তিনটি ভগিনীকে পাত্রস্থ করিতে হইয়াছিল; তখন সংসারের মধ্যে অতুলচন্দ্র, তাঁহার পিতামহী, মাতাঠাকুরাণী, তিনটি ভগিনী ও পত্নী ছাড়া আর কেহই ছিল না। আজিও সেই লক্ষ্মীস্বরূপিণী পত্নীকে লইয়া হিন্দু গৃহস্থের গার্হস্থ্যাশ্রমপালনে এক অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। অতুলবাবুর পত্নীর উদারহৃদয়তা, দান ও স্নেহমমতার তুলনা নাই। ২২ বৎসর বয়সে গোপাল রায়ের কার্য্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। পরে এখানকার দুই চারিজন বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শানুযায়ী ও মহাজনদিগের সাহায্যে খিদিরপুর গার্ডেন রীচ রোডে—উপস্থিত যেখানে Cox and King এর অফিস বর্ত্তমান—সেই স্থানে একটী ঘর ভাড়া করিয়া দরমার দোকান খুলিয়া বসেন। এই সময় ইঁহাকে নিজেকে রাঁধিয়া খাইতে হইত; সময় সময় হোটেলেও খাওয়া-দাওয়া করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। এই দরমার

বি. এম. ইন্সটিটুসন স্কুল বোর্ডিং

দোকান হইতে বালক অতুলচন্দ্রের জাহাজে মাল-সরবরাহকের কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয়। Stevedorএর কার্য্য আরম্ভ করিবার অব্যবহিত পরেই পিতামহী, মাতাঠাকুরাণী ও স্বীয় পত্নীকে লইয়া আসিয়া একটী বাসাবাটী ভাড়া করিয়া তথায় বসবাস করিতে থাকেন। এই কার্য্য করিতে করিতে ভাগ্যলক্ষ্মী ইঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হন। সেই সময় পদ্মপুকুর ষ্ট্রীটে উপস্থিত যাহাকে হেমচন্দ্র ষ্ট্রীট বলে—সেই রাস্তার উপরে সামান্য কিছু জমি মাসিক ভাড়াটিয়া প্রজা-হিসাবে লইয়া একটী দ্বিতল বাটী নির্ম্মাণ করেন। সেই বাটীতেই নীচে আফিসের কার্য্য চলিত আর তাহার উপরে ইঁহারা থাকিতেন। এই বাটী হইতে কমলার কৃপায় অতুলচন্দ্রের বেশ কার্য্যোন্নতি হয়। আজ তাঁহার সৌভাগ্যে সেই স্থানটী খরিদ করিয়া এক দ্বিতল আফিস-বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব জন্মের বহু সুকৃতি না থাকিলে কয়েক বৎসরের মধ্যে এরূপ উন্নতি লাভ করা যায় না। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং কর্ম্মক্ষেত্রে যশস্বী হইয়া উঠেন। তিনি আজ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন সমস্তই স্বকৃত। পৈত্রিক বলিতে কিছুই ছিল না। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার স্বকৃত উপার্জ্জনে নানা স্থানে জমিদারী ও ১৫।১৬ খানি বাটী তৈয়ারী করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই অতুলচন্দ্র অত্যন্ত সরল, লোকপ্রিয়, মিষ্টভাষী ও ভক্তিমান পুরুষ। মাতৃভক্তি ইঁহার জীবনের একটী প্রধান সামগ্রী। মাতৃদেবীর বিনা অনুমতিতে ইনি কোনও কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না। জগদীশ্বরের অনন্ত কৃপায় ও ইঁহার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে আজ অতুল বাবুর আটটি পুত্র ও তিনটি কন্যা বর্ত্তমান। তিনটি কন্যারই বিবাহ হইয়া গিয়াছে—

১মা কন্যা— কমলাবালার বিবাহ বালিগ্রামে হইয়াছে; জামাতা শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় এম-বি ডাক্তার (Captain)।

২য়া কন্যা।— বিমলাবালার বিবাহ হইয়াছে বীরভূম জেলার কীর্ণহার-গ্রামবাসী জমিদার-বংশে। জামাতা জয়ন্তকুমার সরকার। দুর্ভাগ্যক্রমে এই কন্যাটি বিধবা। ইঁহার একটি কন্যা ও একটি পুত্র বর্ত্তমান।

৩য়া কন্যা।— সরলাবালার বিবাহ হইয়াছে হুগলী জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগর নিবাসী ৺রাজা রামমোহন রায়ের বংশে। জামাতা শ্রীযুক্ত শচীপতি রায়, বি-এল। এক্ষণে ইনি Attorneyship পড়িতেছেন।

১ম পুত্র — শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বি-এস-সি। পুত্র ও কন্যার মধ্যে ইনি জ্যেষ্ঠ।

২য় পুত্র— শ্রীমণীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

৩য় পুত্র— শ্রীফণীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

৪র্থ পুত্র— শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

৫ম পুত্র— শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

৬ষ্ঠ পুত্র— শ্রীশচীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

৭ম পুত্র— শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

৮ম পুত্র— শ্রীশঙ্করীনাথ চৌধুরী।

উপস্থিত তিনটি পুত্রের বিবাহ হইয়াছে।

১ম পুত্র— শ্রীঅমরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে চাপদানী-নিবাসী ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বংশে; ইঁহারা অতুলবাবুর সমব্যবসায়ী ও বিখ্যাত বংশ।

২য় পুত্র— শ্রীমণীন্দ্রনাথের দ্বারভাঙ্গা মহারাজার ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রীর সহিত বিবাহ হইয়াছে।

৩য় পুত্র— শ্রীফণীন্দ্রনাথের বিবাহ বড়বাজারের প্রাচীন ও বিখ্যাত গাঙ্গুলী-বংশে হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র চৌধুরীর প্রাসাদোপম বাটী

অতুলবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বংশের মধ্যে প্রথম লেখাপড়া শিখিয়া বি-এসসি উপাধি লইয়া পিতার ব্যবসায়ে নামিয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতা ফণীন্দ্রনাথ এই দুই ভাই উপস্থিত Stevedoring কার্য্য-পরিচালনের যাবতীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, ইনি ভ্রাতাদের লইয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করুন এবং পিতার মত জনহিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিয়া দেশের ও দশের নিকট সুখ্যাতি অর্জ্জন করুন।

২য় পুত্র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ও ৪র্থ পুত্র শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ Order supply এবং Import Export এর কার্য্য করিতেছেন। ৫ম পুত্র শ্রীযুক্ত বারেন্দ্রনাথ Presidency College এ আই-এ পড়িতেছেন। তাহার পর সকলেই স্কুলে পড়িতেছে। অতুলবাবু যৌবনে কার্য্যোন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি আজ এরূপ উন্নত।

ভাণ্ডারহাটী গ্রামে (পৈত্রিক বাসস্থান) নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্য করিয়া ভাণ্ডারহাটী ও তৎপার্শ্বস্থ বহু গ্রামের মধ্যে যশস্বী হইয়াছেন। ভাণ্ডারহাটীতে তিনি সাধারণের জন্য একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া দিয়াছেন, তাহাতে একজন সুদক্ষ ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। ইহাতে ভাণ্ডারহাটী গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের শত শত লোক বিনামূল্যে প্রত্যহ ঔষধ লইয়া আরোগ্য লাভ করিতেছে। এমন কি, যাহাদের পথ্যের সংস্থান নাই তাহাদিগকে পথ্যের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। হুগলি জেলা বোর্ডের, লোক্যাল বোর্ডের ও জেল কমিটির ইনি একজন সদস্য। ইঁহারই ঐকান্তিক যত্নে ও চেষ্টায় রাস্তার উন্নতি হইয়াছে। দেশবাসীর পানীয় জলের জন্য নানাস্থানে নলকূপ করিয়া দিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়া দেশের লোকের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ভাণ্ডারহাটী গ্রামে বিধুমণি ইনষ্টিটিউসন্ নামীয় একটী পুরাতন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে; ইহার

স্থাপনকর্ত্রী ৺বিধুমণি দাসী। মধ্যে এই বিদ্যালয়ের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। যদি সেই সময় অতুলবাবু এই স্কুলে হস্তক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এতদিনে স্কুলটির অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ। অতুলবাবুই উক্ত বিদ্যামন্দিরটির সংস্কার সাধন করিয়া বহুদূরবর্ত্তী ছাত্রদের থাকিবার সুবিধার জন্য বিদ্যালয়-সংলগ্ন নূতন কয়েকখানি পাকা ঘর তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে থাকিয়া অনেক বালক বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। ইনিই এক্ষণে এই বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী। অর্থের দ্বারা এবং নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও আন্তরিক চেষ্টায় যে ভাবে এই স্কুলটী রক্ষা করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহা ভাণ্ডারহাটী-বাসীর অবিদিত নাই। ইঁহারই ঐকান্তিক যত্নে বিদ্যালয়টি ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কি স্বদেশে, কি খিদিরপুর কর্ম্মস্থলে অতুলবাবুর সমান প্রতিপত্তি। খিদিরপুরে থাকিয়া ইনি সাধারণের নানা প্রকার সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করিতেছেন। ইঁহার বাড়ী হইতে কোন অতিথিকে বিফলমনোরথ হইয়া রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইতে দেখা যায় না। কত গরীব, কত ব্রাহ্মণ, কত পুরোহিত মাসিক ও বার্ষিক বৃত্তি-ভোগী তাহা বলিতে পারা যায় না। ইনি বহু সদনুষ্ঠানে বহু অর্থ দান করিয়াছেন ও করিতেছেন। কত অনাথ বালক, কত দুঃস্থ বিদ্যার্থী ইঁহার অর্থে শিক্ষা লাভ করিয়া মানুষ হইতেছে তাহা অনেকেই জানেন। ইনি নিজ গ্রামের স্বজাতীয়দের এখানে লইয়া আসিয়া এক এক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাদের থাকিবার ও খাইবার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। যাহাতে দেশের লোক কষ্ট না পায় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ইঁহাদের বংশের পূজা বহুকালের। পুরুষ-পরম্পরাক্রমে একই স্থানে মহামায়ার পূজা যে কতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কিছুদিন পূর্ব্বেও পূজার চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালা কাঁচা ও খড়ের তৈয়ারী ছিল। ইঁহারই অর্থে ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে পূজার

বি. এম. ইন্সটিটুসন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

দালানটী পাকা হয়। ৪।৫ বৎসর হইল আটচালাটী ভাঙ্গিয়া সেখানেও পাকাদালানের সংলগ্ন একটী বৃহৎ দ্বিতল নাটমন্দির তৈয়ার করিয়া দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। দেশে যেস্থান ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে ভীষণ অরণ্যসঙ্কুল বলিয়া লোকে যাইতে ভয় করিত সেই স্থানের জঙ্গল কাটাইয়া তাহাতে বাগান ও বৃহদাকার সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তাহার সম্মুখভাগে শৈলেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখন সেই স্থানটী দেখিলে স্বতঃই মন বড় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। ঐ স্থান কিছুদিন পূর্ব্বে ভাণ্ডারহাটী-বাসীর অব্যবহার্য্য বলিয়া পরিত্যক্ত ছিল আজ জগদীশ্বরের অপার করুণায় অতুলবাবু দ্বারা সেই স্থান নন্দনকাননে পরিণত হইয়াছে। গরীবের সন্তান হইয়া আজ তিনি কমলার কৃপায় যশস্বী, দাতা এবং ধনী। এত ধনের অধীশ্বর হইয়াও ইঁহার হৃদয়ে অহঙ্কারের লেশমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাই অতুলবাবুর জীবনের বিশেষত্ব। খিদিরপুর স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় কমিটির ইনি একজন সভ্য ও নেতা। সম্প্রতি ইনি খিদিরপুর স্নানঘাটে সাধারণের সুবিধার জন্য একটি ঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। আজকালকার দিনে অতুলবাবুর মত আশ্রিতবৎসল ও বহুজন-প্রতি-পালক সংসারে বড়ই বিরল। ইঁহার অধীন কর্ম্মচারীরা কোনও দিনই ইঁহার প্রভুত্ব-শক্তির পরিচয় পান নাই। সকল কর্ম্মচারীর উপরেই পুত্রবৎ ও বন্ধুবৎ আচরণ করেন এবং কর্ম্মচারীরাও ইঁহাকে ঠিক পিতার মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন। অতুলবাবুর কৃষিকার্য্যের উপর বড়ই লক্ষ্য, যাহাতে দেশে সকলেই কৃষিকার্য্যে সফলতা লাভ করেন তাহার বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল। অতুলবাবু বংশের সৎকীর্ত্তিসকল যাহাতে স্থায়িভাবে বর্ত্তমান থাকে তাহার উপায়বিধানকল্পে তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট। দেব সেবা যাহাতে সুচারুরূপে পরিচালিত হয় তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। অতুলবাবুর মাতাঠাকুরাণী অতুলবাবুর সমস্ত উন্নতি ও কীর্ত্তিকলাপ

দেখিয়া গিয়াছেন। অতুলবাবুর পরমারাধ্যা মাতৃদেবী ১৩৩৯ সালে ২৬শে অগ্রহায়ণ সোমবার খিদিরপুর-বাটীতে ৭৭ বৎসর বয়সে পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, প্রপৌত্রদিগকে রাখিয়া সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। অতুলবাবু মাতৃদেবীর তিরোধানে বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে তিনি দেশের বাটীতে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী বহুগ্রামের জনসাধারণকে পরিতোষ-রূপে ভোজন করাইয়াছিলেন। ২০০।৩০০ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক বিদায় করিয়াছিলেন। প্রায় ৫ সহস্র দরিদ্র নর-নারীকে নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরিতোষ-সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন।

ভগবান অতুলবাবুকে দীর্ঘজীবন দান করুন। তিনি পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, দৌহিত্র এবং আত্মীয়গণকে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করুন, দীনদুঃখীদের দুঃখ বিমোচনের জন্য সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত থাকুন। দিন দিন তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হউক, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের ঐকান্তিক কামনা। মা কমলা ইঁহার কোনও বাসনাই অতৃপ্ত রাখেন নাই; ধন, যশ মান সমস্তই তিনি পাইয়াছেন ও পাইতেছেন।
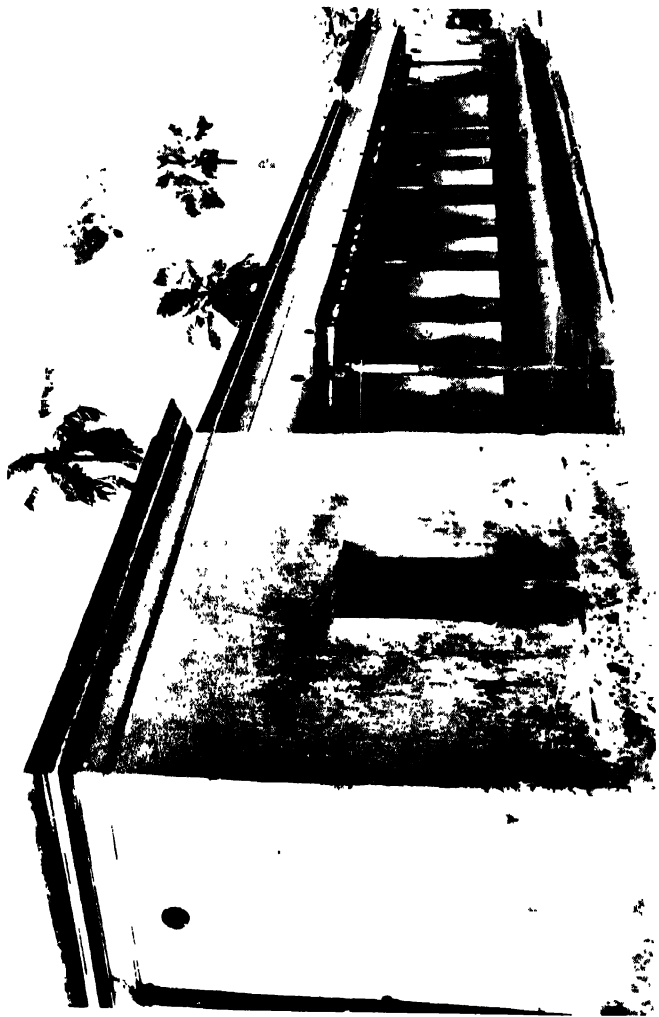
দাতব্য চিকিৎসালয়

মেদিনীপুর জেলার পিঙ্গলাগ্রামের বসুবংশ

মেদিনীপুর জেলার মধ্যে পিঙ্গলা একটী সুবিখ্যাত সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। ইহা সদর মহকুমার অন্তর্গত ও মেদিনীপুর সহর হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পিঙ্গলাক্ষী গ্রাম্যদেবতার নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। পিঙ্গলাক্ষী দেবীর ভৈরব শ্রীশ্রী৺মহারুদ্রজীউ নামে স্বয়ম্ভুলিঙ্গও ঐ গ্রামে বিরাজ করিতেছেন। কথিত আছে, শ্রীশ্রী৺পিঙ্গলাক্ষীদেবী হড়বংশীয় তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। এই বংশের ষোড়শ পুরুষ বর্ত্তমান থাকায় এই দেবী প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন অনুমিত হয়। এই গ্রাম বৃহদায়তন এবং অনেক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ এই গ্রামের অধিবাসী। এই গ্রামে ম্যাট্রিকুলেশন বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয়, পোষ্ট অফিস, রেজেষ্ট্রী অফিস প্রভৃতি অবস্থিত। এই গ্রামের মধ্যে দক্ষিণপাড়ার বসুবংশ বিদ্যা, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য-গৌরবে গরীয়ান।

এই বসুবংশের আদিপুরুষ দশরথ বসু কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার প্রপৌত্র হংসানন্দের অন্যতম পুত্র মুক্তিরাম মাইনগরে বাস করেন। মুক্তিরামের পুত্র দামোদর। তাঁহার পুত্র অনন্তরাম। অনন্তরামের পুত্র গুণাকর। তাঁহার পুত্র মাধব; তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ; তাঁহার তনয় নারায়ণ। নারায়ণের পুত্র স্থির; স্থিরের পুত্র উগ্রকণ্ঠ। তাঁহার পুত্র শ্রীনাথ মুখ্য কুলীন ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রূপরাজ বসু কনিষ্ঠভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র চক্রপাণি "ছভায়া" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র চাঁদ; তৎপুত্র দেবীদাস মধ্যাংশ গরিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার পুত্র ভগবতী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বাজিৎ-

পুর আহারবেল্মা নামক গ্রামে বাস করিতেন। ভগবতীর পাঁচ সন্তান ছিল. তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শম্ভুরাম প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে কনিষ্ঠ সহোদরগণকে পৈতৃক বাসভবনে রাখিয়া রাজকীয় কর্ম্মোপলক্ষে মেদিনী-পুরে আগমন করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে তিনি বহুকাল যশের সহিত কানুনগোর কার্য্য করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি কুলীন ও ধনবান থাকায় উপর্য্যুপরি তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং শ্বশুরের অনুরোধে পিঙ্গলাগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তিনি বিজ্ঞ ও স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন। তিনি যে শারদীয়া মহাপূজার অনুষ্ঠান করি-য়াছিলেন অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ তাহা সুসম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন।

শম্ভুরাম বসুর চারি পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। কন্যাগণকে তিনি সৎপাত্রে বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়া গৃহ-সমীপে বাস করাইয়াছিলেন। পুত্রগণের মধ্যে কাশীরাম জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার পুত্র কানুরাম একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। তৎপুত্র যাদব নানাসদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন, তজ্জন্য তিনি সাধারণতঃ "শূদ্রমুনি" নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার পুত্র বারাণসী পারস্যভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন এবং যৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তৎকালে তিনি নাটোরাধিপতির পক্ষ হইতে ইংরাজ দরবারে উকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও মুক্তহস্তে সমস্ত ব্যয় করিয়াছিলেন।

বারাণসীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কৈলাসেশ্বর বসু ১২০৯ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তিনি সুকবি ছিলেন এবং অদ্ভুত রামায়ণ ও মহাভাগবত পুরাণ পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অন্যান্য অনেক কবিতা আছে। দুঃখের বিষয়, সেই সকল গ্রন্থ এতাবৎ প্রচারিত হয় নাই। তাঁহার রচিত অনেক পুস্তক এক্ষণে সাহিত্য পরিষৎ পুস্তকালয়ে

রক্ষিত আছে। তিনি স্বীয় বংশ-বিবরণ সুললিত ছন্দোবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষায় স্তবরচনাও করিয়াছিলেন। শাস্ত্রালোচনায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং পিঙ্গলা গ্রামে লুপ্তপ্রায় সংস্কৃত-চতুষ্পাঠী অর্থসাহায্যে পরিরক্ষণ করিয়াছিলেন। কৈলাসেশ্বর কৌতুকপ্রিয় ও ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত শ্রীশ্রী ৺পিঙ্গলাক্ষীদেবীর জীর্ণ মন্দির বহুব্যয়ে মেরামত করাইয়া দিয়াছিলেন এবং তুলামেরু, জলাশয়-খননাদি নানা পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি ১২৯২ সালে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

বারাণসীর কনিষ্ঠ পুত্র জগদীশ্বর বসু শৈশবে পিতৃহীন হইয়া মাতুল নবীনকিশোর নাগের আশ্রয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি আরবী, পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং বিদ্বান্ ও ভাবুক বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। ১২৫০ সালে তিনি এক পুরশ্চরণ সম্পন্ন করিয়া গুরুদক্ষিণাস্বরূপ যথাসর্ব্বস্ব গুরুকে দান করিয়াছিলেন এবং সস্ত্রীক কটীবস্ত্রাবৃত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন। তাঁহার গুরুদেব শিষ্যের ভীষণ ব্রত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সামান্য কর দিয়া নিজ গৃহে বাস করিবার আদেশ করেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি সেই কর প্রদান করিয়া আসিতেছেন। জগদীশ্বর হিজলীতে নিমকির দারোগা হইয়া ও পরে দেওয়ান-স্বরূপে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি অশেষ পুণ্যসঞ্চয় করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পার্ব্বতীচরণ দেশহিতৈষী ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গ্রামবাসীর সুবিধার জন্য একটী হাট বসাইয়াছিলেন। মধ্যম কুমেদাচরণ সরকারী চাকরী করিতেন। তাঁহার বিধবা পত্নী তুলামেরু ও শিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং কয়েকজন বালককে অন্ন দিয়া বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। পার্ব্বতীচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র লালমোহন শিক্ষিত ও উন্নতহৃদয় ছিলেন এবং কনিষ্ঠ কিশোরীমোহন ডাকবিভাগে

চাকরী করিয়া উচ্চপদারূঢ় হইয়া কিয়ৎকাল পেন্সন ভোগ করেন। উভয় ভ্রাতাই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

কৈলাসেশ্বর বসুর পুত্র বগলাচরণ ১২৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রগাঢ় বিষয়বুদ্ধিবলে তাহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন এবং ধনশালী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ১২৭৮ সালে জ্ঞাতিভ্রাতা মহেশচন্দ্রের ও অবিনাশচন্দ্রের নেতৃত্বে একটী শুভকরী সভা স্থাপিত হইলে তিনি তাহাতে যোগদান করেন। এই সভা হইতে গ্রামের পথ নির্ম্মাণ ও সংরক্ষণ, দরিদ্র রোগীগণকে বিনামূল্যে ঔষধ-বিতরণ, দরিদ্র ছাত্রগণকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ও নিঃসহায় বিধবাগণকে সাহায্য প্রদান করা হইত। এই মহৎ কার্য্য চতুষ্টয় মুষ্টিভিক্ষা দ্বারা সম্পন্ন করা হইত। এই সভার সংশ্লিষ্ট একটী সাধারণ পুস্তকাগারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বগলাচরণ পিতার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং গ্রামস্থ বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতির সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ঘাটাল নিমতলা সংস্কৃত সমিতির ও মেদিনীপুর জমিদার সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত ৺পিঙ্গলাক্ষীদেবীর মন্দির পুনঃ সংস্কার করিয়াছিলেন, এবং বৃক্ষ ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, অযুত হোম, যজ্ঞ, জলসত্রদান, তুলামেরু প্রভৃতি নানা পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি পুরীতে গমন করিয়া তথায় বহুসংখ্যক দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ভোজন করাইয়াছিলেন। ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ থাকায় বগলাচরণ অষ্টধাতুময়ী শ্রীশ্রী৺হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের নিত্য-সেবাদির জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি পিঙ্গলাগ্রামে জনসাধারণের হিতার্থে দাতব্য ঔষধালয়-স্থাপনকল্পে প্রভূত অর্থদান করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, বগলাচরণ উক্ত ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ১৩০৯ সালে পরলোকগমন করেন। বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর মহোদয় তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া তদীয় পুত্রকে চিঠি লিখিয়াছিলেন।

বগলাচরণের পুত্র ভুবনমোহন ১২৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাধ্যমত পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর পূর্ব্বোক্ত দাতব্য ঔষধালয়-প্রতিষ্ঠাকল্পে ভুবনমোহন আরও অনেক টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ প্রবল। পিঙ্গলা কৃষ্ণকামিনী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহিত তিনি বহুকাল সংশ্লিষ্ট আছেন। পিঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়ের পরিপুষ্টি-সম্বন্ধে তাঁহার যত্ন রহিয়াছে। তিনি কয়েকজন ব্রাহ্মণ-সন্তানকে বিদ্যাশিক্ষায় অর্থসাহায্য করিয়াছেন এবং গ্রামে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী-স্থাপন ও রক্ষা-কল্পে বিস্তর চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন। তিনি কয়েক জন বিদ্যার্থীকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেছেন। ভুবনমোহন কয়েক বৎসর যাবৎ মেদিনীপুর লোকাল বোর্ডের সদস্যরূপে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন ও সম্প্রতি ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং বর্দ্ধমান বিভাগের কৃষিসভার সদস্য হইয়াছেন। পিঙ্গলা সমবায়-ঋণ-দান-সমিতির পরিপুষ্টিকল্পে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ঐ গ্রামে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধ-কল্পে সমিতি স্থাপন করিয়া গ্রামের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। ভুবনমোহন পিঙ্গলা সমবায় ধান্যবিক্রয় ও সরবরাহ সমিতির সভাপতি, পিঙ্গলা সমবায় তত্ত্বাবধায়ক ইউনিয়নের সভাপতি এবং কিয়ৎকাল মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্কের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। এইরূপে দেশের ও দশের হিতসাধন জন্য তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত কানুরাম বসুর অন্যতম পুত্র রামানন্দের বংশধরগণের মধ্যে প্রিয়নাথ বসু মোক্তারী-কার্য্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং আদিত্যনাথ এম-এ, বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতীতে যশ অর্জ্জন করিতেছেন।

শম্ভুরাম বসুর মধ্যম পুত্র বিজয়ের রুদ্রেশ্বর নামে এক পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গাধর সংস্কৃতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন থাকায় "সরস্বতী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র উমাপ্রসাদ কটকনগরে থাকিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া "প্রসাদদাস" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শম্ভুরামের তৃতীয় পুত্র ঘাসীরামের তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শোভারামের মধুসূদন নামে পৌত্র ছিল। তিনি ধনশালী লোকের সন্তান হইলেও কালে তাহা সকলই হারাইয়াছিলেন। তাঁহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু অন্নবস্ত্রের অভাবে তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট পুত্রগণের মধ্যে জগন্মোহন সাতিশয় মেধাবী ছিলেন। এই মহাপুরুষ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অশন-বসনাভাবে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াও বিদ্যানুরাগ পরিত্যাগ করেন নাই। পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়া তিনি প্রচলিত পারস্যভাষা অধ্যয়ন জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন। কিন্তু বেতন দিয়া সুশিক্ষিত শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাঁহার এক প্রতিবেশী বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে খিদিরপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি পারস্যভাষায় ব্যুৎপন্ন থাকায় জগন্মোহন তাঁহাকে অনুনয়পূর্ব্বক প্রস্তাব করেন, "যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পারস্যভাষা অধ্যয়ন করান তাহা হইলে আমি বিনা বেতনে আপনার আবাসে থাকিয়া পাকাদিকার্য্য সম্পন্ন করিব।" তাঁহার প্রতিবেশী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে জগন্মোহন তাঁহার সহিত খিদিরপুরে গমন করেন। তিনি তথায় দুইবেলা পাকাদিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রভূত অধ্যবসায়সহকারে অবসরকালে পারস্যভাষা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে জগন্মোহন নিতান্ত অল্পবয়স্ক, অধিক লোকের পাককার্য্য সম্পন্ন করিয়া, অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া, অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন জন্য কিয়ৎকাল

পরে তিনি বিষম জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। এইরূপে তিনি স্বীয় প্রভুর কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইলে তাঁহার নির্ম্মম প্রভু তাঁহাকে পাথেয়াদি কিছুমাত্র না দিয়া দেশে প্রতিগমন করিবার আদেশ করেন। জগন্মোহনের কিছুমাত্র সম্বল না থাকায় ও দেশে প্রতি-গমনের পথ না জানায়, বিশেষতঃ শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়ায় তিনি প্রভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার নির্দ্দয় প্রভু জগন্মোহনের গাত্র হইতে শীতবস্ত্র কাড়িয়া লইলেন এবং তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। নিরুপায় জগন্মোহন জ্বরার্ত্তগাত্রে অনাবৃতদেহে পৌষমাসের দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে খিদিরপুরের পোলের উপর উপবেশন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার স্বদেশবাসী এক ধনশালী মহাজন অল্পবয়স্ক বালককে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহাকে নিজ নৌকায় আরোহণ করাইয়া লইলেন এবং দেশে পৌছাইয়া দিলেন। এইরূপে সে যাত্রা জগন্মোহনের প্রাণরক্ষা হইল।

এত কষ্ট পাইয়াও জগন্মোহন লেখাপড়া শিক্ষাবিষয়ে ভগ্নোদ্যম হয়েন নাই। এইবার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় নূতন উদ্যমে ও অসীম উৎসাহে বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার বাসভবন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে ঘোড়ামারা গ্রামে মাণিক মিঞা নামে এক বিচক্ষণ বিদ্যোৎসাহী মুসলমান বাস করিতেন। তিনি মেদিনীপুর আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন, কিন্তু বার্দ্ধক্যবশতঃ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পৈতৃক বাসভবনে বাস করিতেছিলেন। জগন্মোহন তাঁহার নিকট পারস্যভাষা-অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। পিঙ্গলা ও ঘোড়ামারা—এই উভয় গ্রামের মধ্যে এক খাল আছে, বর্ষাকালে ঐ খাল ও মাঠ জলে এরূপ প্লাবিত হইত যে, ডোঙ্গা ব্যতীত কেহ পারাপার হইতে সমর্থ হইত না। প্রত্যহ পয়সা দিয়া ডোঙ্গায় পার হইবার জগন্মোহনের সঙ্গতি

ছিল না। অগত্যা তিনি গাত্রমার্জ্জনী পরিধান করিয়া, পুস্তক ও পরিধেয় বস্ত্র মস্তকে বন্ধন করিয়া, নির্ভয়চিত্তে সন্তরণ করিয়া ঐ খাল অতিক্রম করিতেন। এদিকে বৃদ্ধ জনক-জননীর, সহোদর ও নিজের দিন-নির্ব্বাহের উপায় না থাকায়, তিনি প্রায় সমস্ত রাত্রিজাগরণপূর্ব্বক তৎকালীন পাঠশালায় প্রচলিত পুস্তক-গঙ্গাবন্দনা, দাতাকর্ণ ও শিশুশিক্ষাদি স্বহস্তে লিখিয়া প্রাতে কৃষকপল্লীতে বিতরণ করিতেন এবং তদ্বিনিময়ে যে তণ্ডুল প্রাপ্ত হইতেন তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এইরূপ অসামান্য উৎসাহ ও অপ্রতিহতউদ্যমসহকারে কিয়ৎকালমাত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি পারস্যভাষায় বিশিষ্টরূপে ব্যুৎপন্ন হইলেন।

অতঃপর জগন্মোহন স্বীয় পরিবারবর্গের অন্নবস্ত্রের অভাব দূরীকরণ-মানসে উপার্জ্জন করিবার অভিলাষ করিয়া মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন। তৎকালে কালেক্টরীর দেওয়ানের পদ অতি গৌরবের ছিল। অধিক কি, মহানুভব রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাপুরুষগণ কালেক্টরীর দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইয়া সাধারণের নিকট অতীব যশস্বী হইয়াছিলেন। তজ্জন্য জগন্মোহন উক্ত পদপ্রাপ্তির আশায় কালেক্টরীর কার্য্যাবলী শিক্ষার জন্য অভিলাষী হইলেন। তিনি পিঙ্গলাগ্রামবাসী এক প্রতিবেশীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করেন। ঐ ব্যক্তি কালেক্টরীর একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। জগন্মোহন তৎসূত্রে তাঁহার নিকট কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন এবং কিয়ৎকাল পরে মাসিক ৫৲ টাকা বেতনে ফৌজদারী আদালতে এক সামান্য পদে নিযুক্ত হয়েন। ক্রমশঃ কার্য্যদক্ষতা ও অসামান্য প্রতিভাবলে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে উন্নীত হইয়া অবশেষে অভিলষিত দেওয়ান-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি কিয়ৎকালের জন্য দক্ষিণ মাজনা প্রভৃতি পরগণার তহশীলদারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কাঁথি তাঁহার প্রধান কার্য্যস্থল ছিল। যে স্থানে তাঁহার কাছারী হইত তাহা জগন্মোহন

বাগিচা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহাকে তৎকালে ভূমির কর-নিরূপণের কার্য্য করিতে হইত। এই কার্য্য অতিশয় দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া তিনি গভর্ণমেণ্ট ও প্রজাগণের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। অদ্যাপি তৎপ্রদেশের বৃদ্ধলোকেরা কৃতজ্ঞতা-সহকারে তাঁহার নামোচ্চারণ করিয়া থাকেন। দেওয়ান-পদ হইতে তিনি ডেপুটি কালেক্টরের পদে উন্নীত হইয়া অবশেষে পেন্সন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জগন্মোহন অত্যন্ত সাধুপ্রকৃতি লোক ছিলেন। তিনি যতকাল দেওয়ান-পদে নিযুক্ত ছিলেন, ততদিন পরিচিত লোকের সম্পত্তি বাকী রাজস্বের জন্য নীলামে আসিত না; জগন্মোহন স্বয়ং বা অন্যের নিকট ঋণ করিয়া বাকী রাজস্ব দিয়া ঐ সকল লোকের বিষয় রক্ষা করিতেন। তিনি ধনলোভী হইলে ঐসকল লোকের সম্পত্তি ক্রয় করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারিতেন। তিনি কখনও নিজ পদের গৌরব করিতেন না। তৎকালে দলিলসকল পারস্য ভাষায় লিখিত হইত। জগন্মোহন পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন থাকায় দলিল ও অভিযোগপত্রাদি লিখনে সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। ভূম্যধিকারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাহার দ্বারা আবেদনপত্রাদি রচনা করাইয়া লইতেন এবং তাঁহার সহিত আইনের তর্ক ও পরামর্শ করিয়া অভিযোগ বা বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন। এই কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট আয় হইত।

জগন্মোহন অতি দুঃখীর সন্তান ছিলেন এবং বাল্যকালে দারুণ অন্নকষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য অপরিমিত ধান্যসঞ্চয় করিয়াছিলেন। একবার বিষম দুর্ভিক্ষে দরিদ্রগণ অন্নাভাবে কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল দেখিয়া দয়ার্দ্রচেতা জগন্মোহন তাঁহার বহুবর্ষের সঞ্চিত যাবতীয় ধান্য পিঙ্গলা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী দরিদ্রগণের দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া স্বয়ং প্রত্যেক পরিবারে অকাতরে বিতরণ করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার ধান্যোৎপাদন না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি

ধান্য বিতরণ করিয়া বহুলোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপে স্বগ্রামে এক অতিথিশালা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐ অতিথিশালায় বহু অভুক্ত অতিথি ও অভ্যাগত ভোজন করিত। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রতি বৎসর জগন্নাথের ও গঙ্গাসাগরের শত শত সন্ন্যাসী যাত্রীদিগকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে বস্ত্র, কম্বল, জলপাত্র ও কিছু কিছু পাথেয় প্রদান করিতেন।

তিনি মেদিনীপুরে স্বীয় আবাস-ভবনে অন্যান্য ত্রিশজন দরিদ্রসন্তানকে অন্নদান করিয়া লেখাপড়া শিক্ষা দিতেন এবং তাহারা শিক্ষিত হইলে উপযুক্ত চাকরী করিয়া দিয়া তাহাদের অন্নসংস্থান করিয়া দিতেন। তিনি স্বসম্পর্কীয় দরিদ্র ব্যক্তিগণকে সাংসারিক কষ্টনিবারণার্থ যথেষ্ট সাহায্য করিতেন এবং সাধারণের জলকষ্ট-নিবারণমানসে স্থানে স্থানে অনেক সরোবর খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপকগণকে বিশেষ সম্মান করিতেন এবং তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া অর্থ প্রদান করিতেন। তিনি অন্যান্য চারিশত দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকগণের বাৎসরিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার দত্ত ভূসম্পত্তি হইতে অনেকে পুরুষানুক্রমে ঐ বৃত্তিভোগ করিতেছেন। কন্যাদায়গ্রস্ত ও পিতৃমাতৃহীন ব্যক্তি যে জাতীয়ই হউন, জগন্মোহনের নিকট গমন করিলে তিনি অকাতরে তাঁহাদিগকে অর্থসাহায্য করিতেন। তৎকালে ডাক্তারী চিকিৎসার প্রচলন ছিল না। তিনি স্বীয় ভবনে বিচক্ষণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকোবিদ সুচিকিৎসক রাখিয়া সমাগত ব্যক্তিগণের বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করাইতেন এবং দূরদেশাগত রোগীদিগকে বাটীতে রাখিয়া পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন ও তাঁহারা আরোগ্যলাভ করিলে পাথেয় দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিতেন।

জগন্মোহন অত্যন্ত উদারহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সামান্য উপকৃত হইলে তাহা আজীবন বিস্মৃত হইতেন না। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিয়

প্রভু তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অসদাচরণ করিলেও, তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রকে লালন-পালন করিয়া তাঁহার অন্নসংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন এবং স্বীয় ভাগিনেয়ীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

এই উন্নতচেতা বদান্যবর মহাপুরুষ তিন বৎসরকাল পেন্সন ভোগ করিয়া, সাত পুত্র রাখিয়া ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার জীবনচরিত ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা ৺শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত "চরিতমালা" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে ও সুবিখ্যাত "বিশ্বকোষ" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

জগন্মোহনের মধ্যম পুত্র মহেশচন্দ্র ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবীণ বয়সেও তাঁহার যে অসাধারণ মেধা দেখিয়া উদ্যমশীল নবীন যুবকগণও বিস্মিত হইত শৈশবেই তাহার প্রস্ফুরণ হইয়াছিল। মহেশচন্দ্র একবার যাহা শুনিতেন অনায়াসেই তাহা অভ্যাস করিতেন। দারুণ দুর্দ্দৈববশতঃ শৈশব হইতে মহেশচন্দ্রের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ছিল। নিশাকালে তিনি বর্ণমালা একেবারেই দেখিতে পাইতেন না, দিবাভাগেও অতি যত্নে নিরীক্ষণ করিয়া পাঠাভ্যাস করিতে হইত। এইরূপ অবস্থায় প্রায়ই তাঁহার তৃতীয় সহোদর পুস্তক পাঠ করিতেন ও তিনি শ্রবণমাত্র অভ্যাস করিয়া লইতেন। এতাদৃশ ক্লেশেও পাঠ্যগ্রন্থ আয়ত্ত করিয়া তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল (আধুনিক "হেয়ার স্কুল") হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। মহেশচন্দ্র সেখানে প্রগাঢ় অধ্যবসায়সহকারে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি অতঃপর হাইকোর্টে ব্যবহারাজীব হইয়া স্বীয় প্রতিভাবলে সেখানে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। তদানীন্তন জজেরা সকলেই মহেশ-চন্দ্রের যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তাঁহার অনুরোধেই জজেরা তাঁহার তৃতীয় সহোদরকে একেবারে স্থায়িভাবে মুন্সেফ নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কিন্তু কে অবশ্যম্ভাবী দৈবের দ্বার রুদ্ধ করিতে পারে ? ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মহেশচন্দ্রের ক্ষীণদৃষ্টিশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইল এবং তিনি ব্যবহারাজীবের কার্য্য চালাইতে অসমর্থ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এবার তিনি জীবনের অবশিষ্টাংশ বাগ্‌দেবীর আরাধনায় ও ঈশ্বরচিন্তায় উৎসর্গ করিলেন। তিনি মেদিনীপুর জেলার প্রথম সংবাদ-পত্র "মেদিনীপুর সমাচারে"র একজন প্রধান লেখক ছিলেন এবং উপরোক্ত সংবাদপত্র "মেদিনী"তে পরিণত হইবার পরও তাঁহার স্বলেখনীপ্রসূত রচনাবলী "মেদিনী"র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। মহেশচন্দ্র সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষাতেই অধিক মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং অচিরেই সার্ব্বভৌম পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ জ্ঞান দেখিয়া দেশবিশ্রুত নৈয়ায়িকপ্রবর ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয়ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বেদান্ত, উপনিষৎ ও গীতা আদ্যোপান্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল এবং গীতার পদ্যানুবাদ করিয়া "পন্থা" নামক মাসিকপত্রে প্রকাশ করিতেছিলেন। যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা-প্রচলন-সম্বন্ধে প্রথম আন্দোলন উপস্থিত হয় তখন সাহিত্যপরিষৎ মহেশচন্দ্রের মত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁহার বিশেষ সম্মান করিতেন। তিনি প্রিয়দর্শন ছিলেন। তাঁহার মুখবিনিঃসৃত সুললিত ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিতে প্রদোষকালে অনেকেই সমাগত হইত। জীবনের শেষভাগে তিনি যোগাভ্যাস করিতেন এবং সর্ব্বদা পূজা ও জপে নিরত থাকিতেন। অবশেষে তিনি গত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে পাঁচ পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

জগন্মোহনের তৃতীয় পুত্র হেমাঙ্গচন্দ্র বসু বাঙ্গালা ১২৫০ সনের ২৩শে মাঘ (ইং ১৮৪৪ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী) তারিখে রবিবার প্রাতে বেলা ৯টা ১৩ মিনিটের সময়ে মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে পিঙ্গলাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অধিকসময়ে কার্য্যব্যপদেশে সুদূর মেদিনীপুর সহরে বাস

স্বর্গীয় হেমাঙ্গমোহন বসু

করায় তিনি মাতার স্নেহে ও যত্নে বাল্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। অষ্টমবর্ষ বয়সে মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি মেদিনীপুরে আগমন করিয়াছিলেন এবং তত্রত্য বিদ্যামন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। প্রায় এই সময় তাঁহার পিতা স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া কাঁথি অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। হেমাঙ্গচন্দ্র বিদ্যা-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া মনোনিবেশসহকারে পাঠাভ্যাস করিতেন এবং তাঁহার সুশীলতা, বিনয়, সচ্চরিত্রতা ও অভিনিবেশ দর্শন করিয়া তাঁহার শিক্ষকগণ অত্যন্ত প্রীত হইতেন। শ্রদ্ধাপদ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই সময়ে উক্ত বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি হেমাঙ্গচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাকে চরিত্রবিষয়ক এক প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি কখনও কাহাকেও উক্তপ্রকার প্রশংসাপত্র দেন নাই।

হেমাঙ্গচন্দ্রের দ্বিতীয়াগ্রজ মহেশচন্দ্র বসু এই সময়ে পাঠাভ্যাস জন্য কলিকাতা গমন করায় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে হেমাঙ্গচন্দ্রও মেদিনীপুর ত্যাগ করিয়া তথায় গমন করেন ও তৎকালে প্রসিদ্ধ কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তৎপরেই চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় হেমাঙ্গ-চন্দ্র মেডিকাল কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। তথায় তিনি মাসিক ৮৲ আট টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু তাঁহার মাতা উক্ত কলেজে পাঠে অসম্মতি প্রকাশ করায় তিনি উক্ত বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। তিনি উক্ত বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেও কলিকাতায় অবস্থান করিয়া বিদ্যানুশীলন এবং "মুসলমান জাতির অভ্যুদয়-বিবরণ" নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া-ছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সহকারী রেজিষ্ট্রার রায় ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের যুক্তিমতে হেমাঙ্গচন্দ্র আইন পরীক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন।

তৎকালে আইনসংক্রান্ত সদর-কমিটি পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। উল্লিখিত সদর-কমিটির পরীক্ষা তৎকালে একটি সংসদ্ দ্বারা পরিচালিত হইত। বর্দ্ধমান জেলার জজ বর্দ্ধমান বিভাগের সংসদের সভাপতি ও উক্ত জেলার কলেক্টর ও উক্ত বিভাগের কমিশনর অপর দুই জন সভ্য ছিলেন। হেমাঙ্গচন্দ্র প্রথমতঃ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পরীক্ষায় জুনিয়র গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েন এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৪শে অক্টোবর তারিখে উপযুক্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েন। এই সময় তাঁহার মাতা ও তাঁহার পিতা পরলোক গমন করায় হেমাঙ্গচন্দ্র পিতৃমাতৃশোকে বিমূঢ় হইয়া পড়েন এবং বিষয়াদি সম্বন্ধে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

হেমাঙ্গচন্দ্র ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সিনিয়র গ্রেড কমিটি পরীক্ষা দেন। এই সময়ে যে অদ্ভুত উপায়ে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করিলে বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। বর্দ্ধমান জেলার জজ বাহাদুর ঐ সময়ে বিলাত গমন জন্য নিতান্ত আগ্রহান্বিত থাকায় সমূহ প্রশ্ন একদিবসে উত্তর দিবার জন্য নির্দ্ধারিত করেন। হেমাঙ্গচন্দ্র অসামান্য ধৈর্য্যসহকারে প্রাতে বেলা ৯টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত অনবরত একাসনে বসিয়া অনশনে সমূহ প্রশ্নের উত্তর লিখিয়াছিলেন। কয়েক জন পরীক্ষার্থী যাঁহারা কালে গণ্যমান্য উকীল হইয়াছিলেন তাঁহারাও উক্ত পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইয়া কিয়ৎকাল পরে বিরক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। উক্ত বৎসরে উক্ত পরীক্ষায় হেমাঙ্গচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়া মেদিনীপুর জজ-আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন।

এই সময়ে শ্রদ্ধাস্পদ ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ভ্রাতা ৺দুর্গানারায়ণ বসু মেদিনীপুরের পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক ছিলেন। তিনি হেমাঙ্গচন্দ্রের প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। তজ্জন্য হেমাঙ্গচন্দ্র উক্ত পাঠাগারে নিয়মিতরূপে গমন করিতেন এবং তত্রস্থিত যাবতীয় গ্রন্থ

অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত পাঠাগারের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া স্থানীয় ভদ্রলোকগণের নিকট স্বয়ং গমন করিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সেই অর্থের দ্বারা অনেক পুস্তক ক্রয় করিয়া ঐ পাঠাগারের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা উক্ত পাঠাগারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; কিন্তু হেমাঙ্গচন্দ্রের যত্নে উক্ত পাঠাগারের স্থায়িত্ব সুদৃঢ় হয়।

পিঙ্গলাগ্রামে ৺জগন্মোহন বসু সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য এক পাঠশালা স্থাপন করিয়া ছিলেন। কিন্তু উক্ত পাঠশালা উত্তমরূপে পরিচালিত হইত না এবং তাহার উপযুক্ত গৃহাদিও ছিল না। ৺জগন্মোহন বসুর মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পর পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র ৺পার্ব্বতীচরণ বসু ও তৎপরে প্রসিদ্ধ লেখক ৺ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় উক্ত পাঠশালার অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করেন। উক্ত পাঠশালার দুরবস্থা দর্শন করিয়া অবশেষে হেমাঙ্গচন্দ্র উহার ভারগ্রহণ করেন। তিনি উক্ত পাঠশালাকে ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ে পরিণত করেন এবং সুশিক্ষকগণ নিযুক্ত করিয়া বিদ্যাশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। তৎকালে তিনি অদম্য অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে পদব্রজে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, অর্থসংগ্রহ করিয়া, উক্ত বিদ্যামন্দিরের উপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণ করেন। এই গৃহনির্ম্মাণ ও বিদ্যামন্দির-স্থাপনসময়ে হেমাঙ্গচন্দ্রকে স্বগ্রামস্থ ব্যক্তিগণের নিকট অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সহস্র বাধা-বিঘ্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া লক্ষ্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদকতা-সময়ে উক্ত বিদ্যালয় বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। অনেক সময়ে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ জেলার ও বিভাগের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিত। তাঁহার এইরূপ তীব্র বিদ্যানুরাগিতা ও নীরব স্বদেশভক্তি দেখিলে বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়।

অতঃপর হেমাঙ্গচন্দ্র মুন্সেফপদপ্রার্থী হইয়া হাইকোর্টে আবেদন করেন এবং তাঁহার নাম পদপ্রার্থীগণের তালিকাভুক্ত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজস্বসংক্রান্ত নূতন আইন প্রচলিত হওয়ায় রাজস্বসংক্রান্ত মকদ্দমাসমূহ ফৌজদারী আদালতে বিচারিত না হইয়া দেওয়ানী আদালতে বিচারিত হইতে লাগিল। তজ্জন্য অধিকসংখ্যক মুন্সেফ নিয়োগ করা প্রয়োজন হইল। সেই সময়ে তদীয় দ্বিতীয়াগ্রজ মহেশচন্দ্র হাইকোর্টে ব্যবহারাজীব ছিলেন। তাঁহার অনুরোধে হাইকোর্টের ইংলিস বিভাগের জজ শ্রীযুক্ত কেম্প সাহেব ও প্রধান বিচারপতি স্যর বার্ণেস পীকক্ মহোদয় হেমাঙ্গচন্দ্রকে একবারে স্থায়ী মুন্সেফ নিয়োগ করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল তারিখে তিনি মাসিক ২৫০৲ টাকা বেতনে আলিপুরের অন্যতম মুন্সেফপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

শুভক্ষণে হেমাঙ্গচন্দ্র মুন্সেফপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কারণ এই সময়ে তাঁহাদের পারিবারিক অবস্থা বিশেষ অসচ্ছল হইয়াছিল। নানা মকদ্দমাতে অনেক অর্থব্যয় ও পৈতৃক সম্পত্তি অনেক বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ অল্পবয়সে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়াগ্রজ দৃষ্টিক্ষীণতাবশতঃ বিষয়াদি কার্য্য-তত্ত্বাবধানে একান্ত অসমর্থ হইয়াছিলেন। হেমাঙ্গচন্দ্র স্বয়ং কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অন্য ভ্রাতাগণও বিষয়ানভিজ্ঞ থাকায় এবং বয়সের অল্পতানিবন্ধন বিষয়-পরিদর্শনে অক্ষম হওয়ায়, বিশৃঙ্খলাবশতঃ সম্পত্তি-সমূহ ক্রমশঃ হস্তচ্যুত হইতে লাগিল। তাঁহার পঞ্চম ভ্রাতা প্রবোধচন্দ্র ও তাঁহার কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা কলিকাতাতে অধ্যয়ন করিতেন। হেমাঙ্গচন্দ্র চাকরী গ্রহণ করিলে এই বৃহৎ পরিবারের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। তিনি ভ্রাতৃগণের বিদ্যাধ্যয়নজন্য ও পারিবারিক ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ মাসিক রীতিমত অর্থ প্রেরণ করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিতান্ত অপরিণতবয়স্ক পুত্রগণকে রাখিয়া পরলোক গমন করায় তাহাদের ভরণ-

পোষণ জন্য ও বিদ্যাধ্যয়ন জন্য রীতিমত সাহায্য করিতেন। তাঁহার মধ্যমাগ্রজ দৃষ্টিহীনতাবশতঃ ওকালতী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে তিনি তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য রীতিমত অর্থ প্রেরণ করিতেন। ফলতঃ তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায়, স্বার্থত্যাগে ও অর্থানুকূল্যে পরিবারস্থ কোনও ব্যক্তিই কষ্টানুভব করে নাই এবং উত্তরকালে সকলেই শিক্ষিত হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

হেমাঙ্গচন্দ্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জুলাই তারিখে তাৎকালিক ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত দুর্গম সাতক্ষীরা নামক চৌকীতে বদলী হইয়াছিলেন। সেই স্থানে হেমাঙ্গচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। পরে ১৮।৯।৭৬ তারিখে তিনি ময়মনসিংহ জেলার অন্তঃপাতী পিংলা চৌকিতে বদলী হইয়াছিলেন। তৎপরে বাঁকুড়াজেলার অন্তর্গত খাতড়া চৌকিতে, বরিশাল জেলার অন্তর্গত ভোলানামক স্থানে, আলিপুর প্রভৃতি স্থানে কর্ম্ম করিয়া ২৮।১।৮৫ তারিখে কুমিল্লাতে অস্থায়ীভাবে সবজজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে ১৮৮৭ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে তিনি স্থায়ী সবজজ নিযুক্ত হয়েন। তিনি হুগলী, যশোহর ও বাঁকিপুরে সবজজের কার্য্য করিয়া প্রথমশ্রেণীর সবজজ-পদে উন্নীত হইয়া অবশেষে ১৯০২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পূর্ণ পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

হেমাঙ্গচন্দ্র সর্ব্বত্রই অতীব গৌরবের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বিচারে পক্ষগণ, উকীলগণ ও উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন। পক্ষগণ তাঁহার নিকটে মকদ্দমার বিচার করাইবার জন্য চেষ্টিত হইতেন। বিলাতের তাৎকালিক মহামান্য লর্ড চ্যান্সেলর কলিকাতাতে আসিয়া হাইকোর্ট পরিদর্শন করিয়া দেশীয় বিচারপতির বিচার দেখিতে চাহিলে, মহামান্য হাইকোর্টের বিচারকগণ হেমাঙ্গচন্দ্রের বিচারপ্রণালী দেখাইবার মানস করিয়া,হাইকোর্টের প্রথিতনামা জজ স্যর

হেন্‌রি প্রিন্সেপ সমভিব্যাহারে লর্ড চ্যান্সেলর মহোদয়কে হুগলীতে প্রেরণ করেন। উল্লেখিত লর্ড চ্যান্সেলর হেমাঙ্গচন্দ্রের বিচার-প্রণালী দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হয়েন এবং তাঁহার সম্বন্ধে বিলাতে মন্তব্য প্রকাশ করিবেন বলিয়া যান। তিনি তৎকালে বলিয়াছিলেন যে, দেশীয় বিচারকগণ এরূপ সুন্দরভাবে বিচার করিতে পারেন তাহা তাঁহার ধারণা থাকে নাই। আইনে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ও অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইতেন। তাঁহার ধৈর্য্য, বিচক্ষণতা ও ব্যবহারে ব্যবহারাজীবগণ সকলেই তাঁহার পক্ষপাতী ছিলেন। ভূতপূর্ব্ব এডভোকেট-জেনেরাল স্যর চার্লস পল, স্যর গ্রিফিথ ইভান্স ও মিঃ উডরফ অনেক সময়েই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ৺ সারদাচরণ মিত্র তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। এমন কি, স্বলিখিত রায়ের সম্বন্ধে হেমাঙ্গচন্দ্রের অভিমত কি তাহা তাঁহার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি পেন্সন গ্রহণ করিলে সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "অমৃতবাজার পত্রিকা"য়--তিনি হাইকোর্টের বেঞ্চে বসিলে তাহা অলঙ্কৃত করিতেন— এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

হেমাঙ্গচন্দ্র কর্ম্মোপলক্ষে যেখানে যাইতেন সেইখানেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বা বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন করিয়া তদ্দেশবাসীর বিদ্যা-লাভের পথ সুগম করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি যৎকালে খাতড়া গ্রামে গমন করেন তৎকালে সেস্থানে বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘিকা খনন ও কূপ খনন করাইয়া পানীয় জলের অভাব দূর করিয়াছিলেন। সমস্ত দেশহিতকর কার্য্যেই তাঁহার সহানুভূতি ছিল।

নানা দেশে ভ্রমণ করিলেও হেমাঙ্গচন্দ্র একমুহূর্ত্তও জন্মভূমিকে বিস্মৃত হয়েন নাই এবং তিনি তাহার উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। পিঙ্গলাগ্রামে হেমাঙ্গচন্দ্র যে ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তিনি তাহাকে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মাইনার স্কুলে পরিণত

করেন। উক্ত বিদ্যালয় মাইনার স্কুলে পরিণত হইবার পর বহুবার পরীক্ষায় মেদিনীপুর জেলায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। বালিচক হইতে পিঙ্গলা পর্য্যন্ত গমনাগমনের বিশেষ অসুবিধা থাকায় হেমাঙ্গচন্দ্র প্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মাণ করাইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার চেষ্টায় ও পরে গ্রামস্থ সুসন্তানগণের চেষ্টায় এক্ষণে তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহারই উপদেশমত তদীয় ভ্রাতা চেষ্টা করায় সবঙ্গে সেরিকালচারাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহারই চেষ্টায় ও যত্নে পিঙ্গলা, সতীর হাট ও হরিহরপুর প্রভৃতি স্থানে কূপখনন হইয়া উপযুক্ত পানীয় জলের অভাব দূরীকৃত হইয়াছে।

অতিরিক্ত পরিশ্রমবশতঃ ও নানা অস্বাস্থ্যকর স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া হেমাঙ্গচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হয়েন। তৎকালে প্রবীণ চিকিৎসক ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও তাঁহার ভাগিনেয় মহামহোপাধ্যায় ৺বিজয়রত্ন সেনের সুচিকিৎসায় কতক আরোগ্য লাভ করিলেও তিনি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন নাই। সেজন্য রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার একবৎসর পরেই তাঁহাকে ভীষণ হৃদ্রোগ আক্রমণ করিয়াছিল। তিনি চিরকালই সংযত ছিলেন এবং নিয়মিতরূপে আহার ও ব্যায়াম করিতেন বলিয়া তাদৃশ রোগান্বিত হইয়াও অন্যান্য কার্য্যে যোগদান করিতে সমর্থ হইতেন।

কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া হেমাঙ্গচন্দ্র ভগবচ্চিন্তায় ও দেশের কল্যাণকামনায় কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গীতা তাঁহার প্রিয়তম পাঠ্যগ্রন্থ ছিল। তিনি প্রতি রবিবার শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রবণ করিতেন। যখন "ভগিনী নিবেদিতা" মেদিনীপুরে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি অবসর হইলেই হেমাঙ্গচন্দ্রের সহিত গীতালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং হেমাঙ্গচন্দ্রের শান্ত প্রকৃতি ও সরল ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী হইলেও কোরাণ ও বাইবেল পুঙ্খা-

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি Rationalistগণ-প্রকাশিত পুস্তক-নিচয় ও বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহ সমান আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন এবং Theosophical Society হইতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। চিত্তসমুন্নতিই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি মনকে সম্যকরূপে সংযত করিয়াছিলেন। তাঁহার উদারতা ও ক্ষমাগুণ দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইতেন।

মেদিনীপুরে আগমন করিয়া হেমাঙ্গচন্দ্র ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের মেম্বার হইয়াছিলেন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শরীরের অসুস্থতা-নিবন্ধন শেষোক্ত পদ পরিত্যাগ করেন। ভীষণ রোগে প্রপীড়িত হইলেও তিনি দেশ-সেবাব্রত একবারে পরিত্যাগ করেন নাই। মেদিনীপুরের উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ সকলেই তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি নির্ভীক ভাবে তাঁহাদের কার্য্যের সমালোচনা করিতেন। তিনি সাধারণের অভাবের বিষয় রাজপুরুষের গোচর করিতেন এবং রাজপুরুষের মতামত সাধারণকে জ্ঞাপন করিতেন। তিনি স্থানীয় চিকিৎসালয় সমিতির ও ৺রামনারায়ণ রায়ের স্থাপিত চতুষ্পাঠী-সমিতির সদস্য ছিলেন এবং মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের বে-সরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ লাভের জন্য সকলেই তাঁহার নিকট আগমন করিতেন।

উদারপ্রকৃতি পিতামাতার সন্তান হইয়া হেমাঙ্গচন্দ্র অনন্যসাধারণ গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার শান্ত ও গম্ভীর আকৃতি দেখিলে মনে শ্রদ্ধার উদয় হইত। তাঁহার আলাপ শ্রবণ করিয়া কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনি নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং বিদ্যার অত্যন্ত সমাদর করিতেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং পারস্যভাষাও তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে সাহিত্য পরিষদের সভ্য হইয়াছিলেন

ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র বসু এল-এম-এস
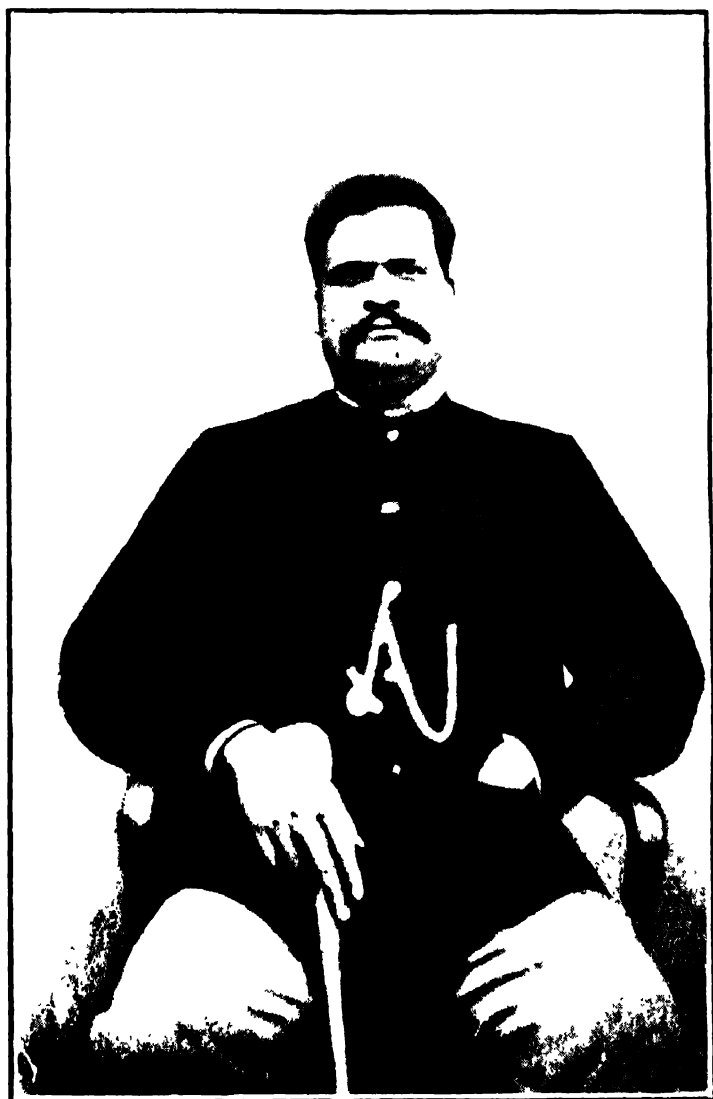
এবং প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ছিলেন। তিনি বঙ্গমহামণ্ডলের সভ্য ছিলেন এবং দুর্ভিক্ষাদি-নিবারণকল্পে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী নানা সদ্-গুণের অধিকারিণী ও নিতান্ত ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন এবং বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, মন্দির প্রতিষ্ঠাদি বহু পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছিলেন।

এই মহাত্মা ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ তারিখে পাঁচটি কৃতবিদ্য পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পত্নী ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে পরলোকগত হইয়াছেন।

৺জগন্মোহনের পঞ্চম পুত্র প্রবোধচন্দ্র ১২৫৭ সালের বৈশাখ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে পিতৃমাতৃবিয়োগ হওয়ায় বাল্যকালে তাঁহার পাঠের অনেক বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। প্রবোধচন্দ্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তথা হইতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। কিয়ৎকাল জন্মভূমিতে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া অবশেষে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গভর্ণমেণ্টের চাকরী গ্রহণ করেন। তিনি যেস্থানে গমন করিতেন সেস্থানের সমস্ত অধিবাসী তাঁহার চিকিৎসাগুণে ও রোগনির্ণয়ের প্রণালীতে মুগ্ধ হইত। তাঁহার ন্যায় সুচিকিৎসক বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি নানাস্থানে কর্ম্ম করিয়া অবশেষে বীরভূমের সিভিল সার্জ্জন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পেন্সন গ্রহণ করেন; কিন্তু হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ও ভীষণ বাতরোগে তাঁহার চলৎ শক্তি ক্রমশঃ লুপ্ত হওয়ায় তিনি জীবনের শেষাংশে সংসারের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া নীরবে ঈশ্বরারাধনায় কালযাপন করিতেন। তিনি উপযুক্ত তিন পুত্র রাখিয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পরলোক গমন করিয়াছেন।

৺জগন্মোহনের ষষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্দ্র ১২৫৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে নানা রোগে পীড়িত হওয়ায় তিনি তৎসময়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ না হইলেও, যৌবনে ও প্রৌঢ়

বয়সে নিজ চেষ্টায় নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সব রেজিষ্ট্রারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যকালের অধিকাংশ তিনি স্বগ্রামে যাপন করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা দেশের ও দশের শুভানুষ্ঠানে নিরত ছিলেন। গ্রামে শুভকরী সভা-প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহার ও তদীয় মধ্যমাগ্রজ মহেশচন্দ্রের চেষ্টা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনিই উহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন ও প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। পিঙ্গলার মধ্য ইংরাজী স্কুল উচ্চ ইংরাজী স্কুলে পরিণত হইবার পর ইনি তাহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। পিঙ্গলা দাতব্য ঔষধালয়ের ইনি অন্যতম উদ্যোগী। রেশমের চাষ পুনরুদ্ধার-কল্পে ইনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। পিঙ্গলা ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহে সমবায় সমিতিসমূহ অবিনাশচন্দ্রেরই চেষ্টায় ও যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইনি পিঙ্গলা সমবায়-তত্ত্বাবধায়ক ইউনিয়নের ও পিঙ্গলা সমবায় ধান্যবিক্রয় ও সরবরাহ সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং বহুকাল মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অন্যতম সুযোগ্য পরিচালক ছিলেন। এইসকল নানা হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানজন্য ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "রায় সাহেব" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি অতিশয় ধর্ম্মপ্রবণ ও পাঠানুরাগী ছিলেন। শেষ বয়সে ঈশ্বরচিন্তায় কালযাপন করিয়া অবিনাশচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

৺জগন্মোহনের কনিষ্ঠ পুত্র অঘোরচন্দ্র ১২৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি মহকুমার ব্যবহারাজীব ছিলেন এবং উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেছিলেন। দারুণ দুর্দ্দৈববশতঃ ভীষণ গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি অকালে ১৩০২ সালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন।

রায় বাহাদুর মন্মথনাথ বসু

৺জগন্মোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অমরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের সুবিখ্যাত ব্যবহারাজীব বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে পাঠাদি বিষয়ে নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পরে তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অনেক ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার যত্নে মেদিনীপুর সহরে হিন্দু স্কুল নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পিঙ্গলা গ্রামে মাইনর স্কুল তাঁহার মাতার নামে কৃষ্ণকামিনী ইংরাজী বিদ্যালয় হইয়া ম্যাট্রিকুলেশন স্কুলে পরিণত হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গালা ১৩১৩ সনে ৪৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা সতীশচন্দ্র ওভারসিয়ার-রূপে বহুকাল গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী করিয়া কিয়ৎকাল পেন্সন ভোগ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপেন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্টের অধীনে সব্-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন-রূপে খ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন।

মহেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপ্রমথনাথ বসু ১৮৬৮ সালের মার্চ্চ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেদিনীপুরে ব্যবহারাজীবের কার্য্য সুখ্যাতির সহিত সম্পন্ন করিতেছেন এবং স্থানীয় তত্ত্ববিদ্যাসমিতির সভাপতি হইয়াছেন। তাঁহার চতুর্থ ভ্রাতা প্রকৃতিনাথ সব্ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও Asst. Settlement Officer হইয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন; উদরী রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি অকালে লোকান্তর গমন করিয়াছেন।

হেমাঙ্গচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্মথনাথ ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর তারিখে পিঙ্গলাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়স হইতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সকলে মুগ্ধ হইত। তাঁহার

পিতাকে মুন্সেফী অবস্থায় নানাস্থানে বদলী হইতে হওয়ায় মন্মথনাথের পাঠে অনেক বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। তিনি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত খাতড়াগ্রামের মধ্যবৃত্তি ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে মধ্যবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইবার অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালীন নিয়মানুসারে তাঁহার পিতা মুন্সেফ হওয়ায় তাঁহাকে বৃত্তি প্রদত্ত হয় নাই। তিনি কলিকাতা হিন্দু স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায়, হুগলী কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় ও মেট্রোপলিট্যান ইন্‌সটিটিউসন হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি আইন-ব্যবসায় অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক হইলেও বি-এল পড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। তথায় অসামান্য প্রতিভাবলে শীঘ্রই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব বলিয়া পরিগণিত হয়েন। তাঁহার আইন-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও ব্যবহার-পরিচালনা-সম্বন্ধে খ্যাতি সুদূরবিস্তৃত হইয়াছে। হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। তাঁহার সমুজ্জ্বল প্রতিভা কেবলমাত্র ওকালতীতে স্ফুরিত হইয়া ক্ষান্ত হয় নাই। তিনি মেদিনীপুরে সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিতই সংশ্লিষ্ট। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সের অধিবেশন-সময়ে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি খ্যাতনামা ৺কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের দক্ষিণহস্তস্বরূপ সমুদয় কার্য্য করিয়াছিলেন এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে উক্ত কন্‌ফারেন্সের অভ্যর্থনা-সমিতির বিশিষ্ট সদস্য থাকিয়া সর্ব্ববিষয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি সদর লোকাল বোর্ডের সদস্য ও ভাইস্‌-চেয়ারম্যান এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্যরূপে ১৯০৯ হইতে ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত নানা প্রকার দেশহিতকর কার্য্য করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। পরে গত ১৯৩০ সালে পুনরায় ডিষ্ট্রিক্ট

বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের বেসরকারী পরিদর্শক ও মেদিনীপুর হাসপাতাল সমিতির সহকারী সভাপতিস্বরূপ তিনি জেল ও হাসপাতালের উন্নতির যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি পিঙ্গলা কৃষ্ণকামিনী বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক সমিতির সভাপতিস্বরূপ এবং টাউন স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক সমিতির সহকারী সভাপতিস্বরূপ বিদ্যালয় দুইটীর যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি মেদিনীপুর হিন্দু স্কুলে সভাপতিরূপে কার্য্য করিয়াছেন এবং মেদিনীপুর কলেজের শাসন-সমিতির অন্যতম সদস্য ও সহকারী সভাপতি-স্বরূপে কলেজের অনেক হিতসাধন করিয়াছেন। ১৯১৩।১৯২ ।১৯২২।১৯২৩ ।৯২৬।১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের বন্যাপীড়িত জনসঙ্ঘের হিতসাধন জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল তাহার সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষস্বরূপ তিনি সাধারণের প্রভূত উপকার করিয়াছেন ও সরকার হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। গত ১৯২১ সালে H. R. H. Prince of Walesএর Visit Celebration Committeeর কোষাধ্যক্ষস্বরূপ তিনি সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া দীনদুঃখীদিগকে নিজে চাল, পয়সা ও কাপড় বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি গত ১৯২৯ সাল হইতে Midnapore Standing Embankment Committeeর সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। বর্দ্ধমান মেডিক্যাল স্কুলের Selection Committeeর সদস্যরূপে ১৯৩৩ সালের জুনমাসে কার্য্য করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সম্পাদকস্বরূপ মেদিনীপুরে সমবায়-সমিতিসমূহের অদ্ভুত প্রসার করিয়াছেন এবং উক্ত ব্যাঙ্ককে সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কে পরিণত করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল, তিনি উক্ত ব্যাঙ্কের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বোম্বাই হইতে প্রকাশিত Co-operation in India নামক পুস্তকের ৪৭৩ পৃষ্ঠায় তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"Chairman, Central

Co-operative Bank Midnapore. An able and successful lawyer, keenly interested in the co-operative movement, mainly instrumental in raising the Midnapore Central Co-operative Bank to its present position." তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী সমিতির কিছুদিন চেয়ারম্যান ছিলেন এবং পরিচালকস্বরূপ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

মেদিনীপুরে Bengal Home Industries Associationএর শাখা স্থাপিত হইলে তিনি উহার কোষাধ্যক্ষ হয়েন ও জেলার কুটীর-শিল্পের উন্নতিকল্পে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি-অভাবে উক্ত সমিতি স্থায়ী হয় নাই। তিনি মেদিনীপুর বয়ন-(Spinning and Weaving School) বিদ্যালয়ের Managing Committeeর সদস্য ও Auditor-স্বরূপে উক্ত স্কুলের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন ও নিজের পুত্রকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছিলেন। এই সকল ও অন্যান্য নানা জনহিতকর কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তিনি পারিবারিক জীবনে পিতৃবৎসল, মাতৃবৎসল ও ভ্রাতৃবৎসল। তাঁহার চিত্ত সরল, উদার, মহীয়ান, স্বাধীন ও দানপ্রবণ। তিনি নাম অর্জ্জন করিবার অভিপ্রায়ে কোনও কার্য্য করেন না।

তিনি ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর, ১৯২৮ সালের মার্চ্চ ও ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে মেদিনীপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়া সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতেছেন। ১৯২৫।২৬ সালের ও তৎপরবর্ত্তী সরকারী Administration Report-এ উত্তম মিউনিসিপাল কার্য্যের জন্য তাঁহার নাম বিশেষরূপে উল্লেখিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী Mr. R. N. Reid মহোদয় মেদিনীপুর হইতে চলিয়া আসিবার সময় ১৯২৭ সালে ৩১শে মার্চ্চ তাঁহাকে যে পত্র লিখেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"I want to write personally and thank you for your ready help in this connection and for the care and attention with which you did this work (Flood Relief Work). And may I add how much I appreciated during my stay here the wise advice on all sorts of matters that you have always been so ready to give."

সর্ব্বজন-পরিচিত বর্দ্ধমান বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনর S. W. Goode মহাশয় মেদিনীপুর-ত্যাগ-কালে গত ৭।১০।২৮ তারিখে তাঁহাকে নিম্ন-লিখিত পত্র লিখেন :—

" Before I leave Midnapore I should like to thank you very sincerely for the advice and help which you have been so ready to give when I asked for them. Your work in connection with the Co-operative Banks and the Municipality and your other public activities take up a great deal of your time which you have always given ungrudgingly. I would like once more to thank you very sincerely for your public services and your loyal co-operation with me during my time at Midnapore."

হেমাঙ্গচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র মোহিনীনাথ মেট্রোপলিটান ইনস্‌টিটিউসন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা, প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ-এ, বেহার নেশানল কলেজ হইতে বি-এ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং মেট্রোপলিটান ইনস্‌টিটিউসন হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ব্যবহারাজীব হইয়াছিলেন। তিনি যোগ্যতার সহিত উক্ত কার্য্য সম্পাদন করায় অল্পদিনেই হাইকোর্টের জজদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। হাইকোর্টে ষ্ট্যাম্প-

রিপোর্টার-পদের সৃষ্টি হইলে একজন সুযোগ্য ব্যবহারাজীবকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার কথা হয়। তৎকালে মাননীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মোহিনীনাথকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া মোহিনীনাথকে ঐ পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। মোহিনীনাথ তাহাতে অনিচ্ছুক থাকিলেও, অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, ত্যাগ স্বীকার করিয়াও উক্ত পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন। তিনি তদবধি উক্তপদে থাকিয়া অতীব যোগ্যতা ও খ্যাতির সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। তিনি কোর্টফিস্ ও ষ্ট্যাম্প সম্বন্ধে যে দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহা ভারতের সর্ব্বত্র তৎসম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

হেমাঙ্গচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র মালতীনাথ মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসন হইতে সম্মানের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া পাটনা কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। তথা হইতে এফ-এ পরীক্ষায় মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তথায় কিছুকাল পরে দারুণরোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্টে আরোগ্যলাভ করতঃ হুগলী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তৎপরে বি-এল পরীক্ষায় পাস হইয়া ওকালতী করিবার জন্য মেদিনীপুর-বারে যোগদান করেন। তথায় অল্পদিন মধ্যেই তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। কিন্তু পিতৃনির্দেশবশতঃ তিনি ওকালতী ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া মুন্সেফী চাকরী গ্রহণ করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ইনি মুন্সেফ-পদে স্থায়ী হইয়া তদবধি কার্য্য করিয়া আসিতেছেন এবং পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন।

হেমাঙ্গচন্দ্রের চতুর্থ পুত্র মনীষিনাথ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ২১শে মার্চ্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে ইঁহার পাঠবিষয়ে প্রগাঢ় আসক্তি পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং শৈশব হইতে মেধাবী ছাত্র বলিয়া

পরিগণিত হয়েন। ইনি কঠিনরোগগ্রস্ত অবস্থায় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিটান ইনস্‌টিটিউসন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে অধ্যয়নার্থ পাটনা কলেজে গমন করিয়া এফ-এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে দুইটী অনাসের সহিত বি-এ পরীক্ষা দিয়া সম্মানের সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি ও সুবর্ণ-পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাকে যদিও গভর্ণমেণ্ট হইতে ষ্টেট স্কলাসিপ দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল কিন্তু নানাকারণে তাহা হইয়া উঠে নাই। পরে অত্যন্ত রোগগ্রস্ত হইলেও সংস্কৃত ভাষায় এম-এ পাশ করিয়া তিনি একটি রৌপ্য পদক ও "সরস্বতী" উপাধি লাভ করেন। তিনি পরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য পরীক্ষা দিয়াছিলেন; কিন্তু পরীক্ষার সময়ে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ায় এবং অন্যান্য বিশেষ কারণে তিনি বৃত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-প্রমুখ তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন; তৎপরে মনীষিনাথ বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেদিনীপুরে ব্যবহারাজীবের কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন ও অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি ব্যবহারাজীবের কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত থাকিলেও সাহিত্যচর্চ্চা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার গভীর জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা, অনুসন্ধিৎসা ও শান্তস্বভাবের জন্য তিনি সম্মানিত হইয়া থাকেন। তিনি মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি ও পরে সভাপতিরূপে বৃত হইয়া বহুকাল কার্য্য করিয়া আসিতেছেন এবং উক্ত শাখা-পরিষদ্ এক্ষণে সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাখারূপে পরিগণিত হইয়াছে। তিনি উক্ত শাখা-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত "মাধবী" নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক

এবং তাঁহার রচনাসমূহ গবেষণা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত তিনি স্থানীয় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সহকারী সম্পাদক এবং পরে সম্পাদক হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ উন্নত করিয়াছেন। তিনি মেদিনীপুর হিন্দু স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক সমিতির সহকারী সভাপতিরূপে অনেকদিন কার্য্য করিয়াছেন এবং পিঙ্গলা স্কুল-সমিতির সভাপতিরূপে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি লণ্ডন রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর মেম্বার হইয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীন গৌরব-রক্ষার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান ইন্দুবিকাশ কিছুকাল হইল মেদিনীপুরে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছেন।

হেমাঙ্গচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র মুক্তেশনাথ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাঁকিপুর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে হুগলী কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। তথা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা সহরে চিকিৎসকের কার্য্য করিতেছেন। তথায় তিনি বিচক্ষণতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

প্রবোধচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র সরোজনাথ মেদিনীপুরে ব্যবহারাজীবের কার্য্য করিয়া যশোলাভ করিতেছেন। প্রবোধচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র অম্বুজ-নাথ গত ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা ও মেদিনীপুর কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। তথা হইতে গৌরবের সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং "গুডিভ"-বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং উক্ত কলেজের হাউস সার্জ্জেন হয়েন। পরে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহাসমর আরম্ভ হইলে তিনি সৈনিক বিভাগের চিকিৎসক-পদ গ্রহণ করিয়া ব্রাইটনে প্রেরিত হয়েন। সেখান হইতে কিয়ৎকাল পরে

দক্ষিণ আফ্রিকা, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি নানাস্থানে কার্য্যোপলক্ষে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে অম্বুজনাথের কৃতিত্ব-দর্শনে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে স্থায়িভাবে গ্রহণ করেন। এই সার্ভিসে থাকিয়া তিনি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়াছেন। চাকরীর মধ্যে অবসর গ্রহণ করিয়া অম্বুজনাথ ইংলণ্ডে গমন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা দিয়া অবশেষে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম পরীক্ষায় সম্মান-সহ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি কৃতবিদ্য কর্ম্মচারী বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকায় পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইলে তাঁহাকে নিদানের অধ্যাপক-রূপে গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি উক্ত কলেজ-প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি "মেজর"-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বাঁকিপুরে সর্ব্বসাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

শম্ভুরামের কনিষ্ঠ পুত্র রসিকরামের পৌত্র শিবরামের প্রপৌত্র শ্রীনিবাসচন্দ্র একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি নিজ চেষ্টায় ও পরিশ্রমে প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া ও পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া লোকান্তরিত হইলে তদীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথ পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া গ্রামের হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

এইরূপে পিঙ্গলার বসু-বংশ সুসন্তানগণের চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে গৌরব-মণ্ডিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য পিঙ্গলাগ্রামও বিশেষ উন্নত হইয়াছে।

রায় শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দত্ত বাহাদুর

রায় শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দত্ত বাহাদুর ১৮৭১ খৃঃ অব্দের ৮ই জুলাই মেদিনীপুর (তৎকালীন হুগলী) জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণার পার্শ্ববর্ত্তী কিয়াগড়ে নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺দ্বারকানাথ দত্ত মহাশয় সেটেলমেণ্ট-কানুনগোর কার্য্য করিতেন। ঐ কার্য্যে তিনি সাতিশয় যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া সরকারের প্রশংসাভাজন হন ও কালে সাব ডেপুটীর পদে উন্নীত হন; কিন্তু নিয়তির বৈগুণ্যে ঐ পদ তাঁহাকে অধিক কাল ভোগ করিতে হয় নাই। অল্প বয়সেই তিনি পরলোক গমন করেন। ফলে রায় বাহাদুর শম্ভুচন্দ্র মাত্র একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃহীন হন।

তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত মেহারা ফকিরপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। অদ্যাপি ঐ বংশের একটি শাখা তথায় বসবাস করিতেছে। যে সময়ে ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচারে তাঁহাদের কুলগুরু কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেশ ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে আগমন করতঃ তাঁহার সভাকবিরূপে বসবাস আরম্ভ করেন, তাহার অনতিকাল পরেই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ গুরুর পশ্চাদনুসরণ করিয়া চন্দ্রকোণায় আগমন করেন। তথায় তিনি রাজসরকারে সামরিক বিভাগে কার্য্য করিয়া বক্সী উপাধি লাভ করেন। তদবধি তদীয় বংশধরগণ বক্সী-উপাধিতেই অভিহিত হইয়া থাকেন। রায় বাহাদুরের পিতামহ ৺তারাচাঁদ দত্ত মহাশয় একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ, সাধুভাষী ও সজ্জন ব্যক্তি বলিয়া দেশ মধ্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃহীন হইয়া তিনি ঘোর দুঃখে পতিত হন। যোগ্য অভিভাবক-অভাবে অধিকাংশ পৈত্রিক সম্পত্তি বিনষ্ট হয়।

রায় শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দত্ত বাহাদুর

ফলে ঐ বয়স হইতেই সংসারচিন্তা তাঁহাকে পীড়ন করিতে থাকে। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে ইনি চন্দ্রকোণা জিরাট স্কুল হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ১৮৯০ সালে মেদিনীপুর কলেজ হইতে ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষা পাশ করেন।

ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি সংসার প্রতিপালনের নিমিত্ত চাকুরির অনুসন্ধান করেন। এই সময় প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয়-লাভের সৌভাগ্য ঘটে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে তিনি প্রথমে বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ে ও পরে কলিকাতা মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতা করিবার কালে অর্থাভাবে তাঁহাকে অশেষ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। গৃহে সংসার প্রতিপালন ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার শিক্ষার জন্য তাঁহার প্রায় সমূহ অর্থ ব্যয় হইয়া যাইত; স্বয়ং কোনও প্রকারে কলিকাতায় কালাতিপাত করিতেন। ঐ সময় তিনি বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। অতীব অধ্যবসায়-সহকারে সকল প্রকার দুঃখ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াও তিনি ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ঐ বৎসরই তিনি ইতিহাস-অধ্যাপকের পদ লাভ করিয়া মেদিনীপুরে আগমন করেন ও মেদিনীপুর কলেজে কিছুকাল কার্য্য করেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি সুনিপুণ অধ্যাপনা ও সহৃদয়তার জন্য ছাত্রসমাজে ও জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। অধ্যাপনা-কালে তিনি ভারত সরকারের দপ্তরে চাকুরি-লাভের আশায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেন ও প্রথম স্থান অধিকার করিয়া যথাকালে চাকুরী লাভ করিয়া সিমলা যাত্রা করেন।

১৮৯৫ সালে চাকুরি লাভ করিয়া তিনি ভারত সরকারের মিলিটারি বিভাগে যোগদান করেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি একজন সুযোগ্য

রাজকর্ম্মচারী বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার প্রতিভার একটি মূলসূত্র তাঁহার ইংরাজী সাহিত্যে অনন্যসাধারণ ব্যুৎপত্তি। বিশেষ যোগ্যতার সহিত তিনি অচিরকাল মধ্যেই উচ্চ রাজপদে সমাসীন হন। বিগত মহাসমরের সময় তিনি এরূপ কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করেন যে, ভারত সরকার তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া ১৯১৯ সালের বিশিষ্ট সংখ্যা ইণ্ডিয়া গেজেটে তাঁহার নামোল্লেখ করেন এবং স্যর চার্লস্ মনরো ও লর্ড রলিনসন প্রধান সেনাপতিদ্বয় তাঁহাকে প্রশংসাপত্র দান করেন। ১৯২১ খৃঃ অব্দে চীফ কণ্ট্রোলার অফ সারপ্লাস্ ষ্টোরস্ অফিসের চীফ সুপারিনটেনডেণ্ট-রূপে বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্য্য করার জন্য তিনি ভারত সরকার কর্তৃক রায় সাহেব উপাধিতে বিভূষিত হন। ঐ বৎসরই তাঁহার স্বাস্থ্য অতিশয় ভগ্ন হওয়ায় তিনি উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের আশা পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘ অবকাশ গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন ও পরে ১৯২৩ সালের শেষভাগে অকালে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

স্বদেশে প্রত্যাগমন অবধি তিনি নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করেন। ১৯২২ খৃঃ অব্দে তিনি ঘাটাল লোক্যাল বোর্ডের সভ্য মনোনীত হন। অদ্যাবধি তিনি ঐ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ঐ বৎসরই মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের সভ্য মনোনীত হন। ১৯২৩ সালে প্রারম্ভে তিনি শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর সহরে আসিয়া বসবাস করেন। পর বৎসর তিনি মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার মনোনীত হন। এ যাবৎ অক্ষুণ্ণভাবে কমিশনরের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ১৯২৬ সালে তিনি পুনরায় জেলাবোর্ডের সভ্য মনোনীত হন। অদ্যাপি তথায় বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। ১৯৩০ সালে মেদিনীপুর জেলাবোর্ড অতিশয় ঋণগ্রস্ত হইলে গভর্ণমেণ্ট তদানীন্তন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জেমস পেড্ডি, সি-আই-ই মহাশয়কে জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। মিঃ পেডির

অনুরোধে ও সকল সভ্যের বাসনা-অনুসারে তিনিই ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই সমূহ ঋণভার পরিশোধ করিয়া বোর্ডের শ্রীবৃদ্ধি করেন। তাঁহার কৃতিত্বের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯৩১ সালে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দান করেন।

আজিও তিনি জেলাবোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান-পদে অধিষ্ঠিত আছেন ও দেশের নানাবিধ মঙ্গলজনক কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার মাত্র দুই বৎসর কার্য্যকালের মধ্যেই তিনি সমূহ ঋণভার পরিশোধ করিয়াও তিনটি নূতন দাতব্য চিকিৎসালয় ও দুই তিনটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দেশের বহু মঙ্গলজনক কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি মেদিনীপুর নগরোপকণ্ঠে কংসাবতী নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টিত আছেন।

তিনি ১৯২৬ সালে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন ও ছয় বৎসর কার্য্য করিবার পর ১৯৩২ সালে জেলাবোর্ডের কার্য্যাধিক্য ও শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ঐ পদ ত্যাগ করেন।

কেবল কার্য্যকুশলতার জন্যই তিনি সকলের প্রশংসাভাজন নহেন। তাঁহার সাহিত্যানুরাগও প্রশংসনীয়। ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার ব্যুৎপত্তি অনন্যসাধারণ। আজীবন কার্য্যের অবকাশে যখনই সময় পাইয়াছেন সাহিত্যালোচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা লক্ষিত হয়। আজিও দর্শন ও উপনিষদের চর্চ্চা তাঁহার অবসর বিনোদন করিয়া থাকে। তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব অনারেবল মেম্বার স্যর টমাস্ হল্যাণ্ড কে-সি-এস-আই, কে-সি-আই ই এফ-আর-এস মহোদয় তাঁহাকে একখানি বেদান্তের পুস্তক উপহার দেন।

মানুষ স্বীয় চেষ্টায় কিরূপে বড় হইতে পারে তাঁহার জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবন ও অটুট স্বাস্থ্য দান করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করুন।

তাঁহার এক কন্যা ও দুই পুত্র। তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু সিমলায় ভারত গভর্ণমেণ্টের মিলিটারী বিভাগে চাকুরী করেন। দুই পুত্র—অমূল্যকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ দত্ত। অমূল্যকৃষ্ণ এম-এ, বি-এল পড়েন এবং বিজয়কৃষ্ণ আই-এ পড়িতেছেন।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দে

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দে

মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দে ইংরাজি ১৮৮০ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমার অন্তঃপাতী সারপুরগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গীয় রামদুলাল দে এই বংশের আদিপুরুষ ছিলেন। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র দে—অতুলবাবুর পিতা একজন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। অতিথি-অভ্যাগত ব্যক্তির সেবা করা তাঁহার জীবনে আনন্দ-দায়ক কার্য্য ছিল। তিনি সাধ্যমত অনাথা ও বিধবা স্ত্রীলোককে অর্থ-সাহায্য করিতেন। কোনও প্রার্থী তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হয়েন নাই। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং শিক্ষার্থিগণকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন। তিনি মেদিনীপুর জেলার স্বর্গীয় করালীচরণ বসুর তৃতীয়া কন্যা স্বর্গীয়া প্রসন্নময়ী দাসীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রথমা কন্যা গিরিবালার সহিত মেদিনীপুরের স্বনামধন্য ব্যবহারাজীব বাবু নব-কুমার মিত্রের বিবাহ হইয়াছিল। গিরিবালা এক্ষণে তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ হেমন্তকুমার মিত্রসহ পুণ্যভূমি কাশীধামে বসবাস করিতেছেন।

অতুলচন্দ্র দের বাল্যকালে ও পঠদ্দশায় তাঁহার পিতা ১৮৯৬ সালের নভেম্বর মাসে পরলোকগত হয়েন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি নিজ চেষ্টায় ও যত্নে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ১৯০৪ সালে মেদিনীপুর জজ আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং ঐ সময়ে কটকের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত বনবিহারী পালিতের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী কমলপাণি দাসীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

অতুলবাবুর মাতা ১৯১২ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে পরলোক গমন করেন।

অতুলবাবু অতি যত্নসহকারে মক্কেলের কার্য্য করেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সূক্ষ্মদর্শী এবং তাঁহার মানসিক শক্তি ও স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। তিনি কখনও কোন বিচারপতি বা সমব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত ঝগড়া করেন না। ঝগড়া করা বা কাহারও প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি মিষ্টভাষী, স্থির ও, বিনয়ী। কখনও কোন ব্যক্তি তাঁহাকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে দেখেন নাই। তিনি সর্ব্বদা হাস্যমুখে কথা বলেন।

তিনি যে মকদ্দমায় উকিল নিযুক্ত হয়েন সেই মকদ্দমার জন্য তিনি প্রাণপণে পরিশ্রম করেন। তাঁহার common sense and presence of mind অতুলনীয়। তিনি মকদ্দমার argument-কালে দৃঢ় অথচ ধীরভাবে যুক্তিতর্ক উত্থাপন করিয়া এবং আইন ও নজিরের বিশ্লেষণ করিয়া নিজ মত বিচারকের নিকট প্রকাশ করেন এবং মক্কেলের স্বত্ব ও স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষভাবে যত্ন করেন। মকদ্দমা-পরিচালনার রীতি-নীতি-সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা অসীম।

মক্কেলের সহিত তাঁহার ব্যবহার উচ্চ আদর্শের। মক্কেলগণকে পীড়ন করিয়া অর্থ শোষণ করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যে মক্কেল একবার ইঁহার দ্বারা মকদ্দমা চালাইয়াছেন বা যে ব্যক্তি ইঁহার মকদ্দমা চালনা করিবার রীতি-নীতি দর্শন করিয়াছেন তিনিই ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন।

অতুলবাবু এক্ষণে মেদিনীপুর জেলা-আদালতের একজন প্রধান ও উচ্চ শ্রেণীর উকিল। তিনি নিজ গুণে ও পরিশ্রমে বহু মক্কেলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

তিনি যে সময় ওকালতি আরম্ভ করেন সেই সময় Undefended খুনের মকদ্দমায় সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক আসামীর পক্ষ সমর্থন জন্য উকীল নিযুক্ত হইবার নিয়ম ছিল না। কিন্তু সেসন জজ সাহেব

বাহাদুর ঐ সময় জুনিয়র উকিল বা উকিলগণকে Undefended Murder case defend করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। একটি ঐরূপ Undefended case তিনি defend করেন। ঐ দায়রার মকদ্দমা কয়েকদিন চলিয়াছিল। সেসন জজ সাহেব বাহাদুরের বিচারে আসামী খালাস পায় এবং জজ সাহেব বাহাদুর অতুলবাবুর মকদ্দমা চালাইবার প্রণালীতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু ঐ মকদ্দমা চালাইতে সুরু করার সময় হইতে রায় প্রকাশের সময় পর্য্যন্ত তিনি অত্যন্ত anxiety ভোগ করেন। তাঁহার সর্ব্বদা এইরূপ ভাব মনে উদয় হইত যে, যদ্যপি আসামী নির্দ্দোষ হয়, তাঁহার জেরা বা argumentএর ত্রুটিতে যদ্যপি assessors (সে সময় মেদিনীপুরে Jury System introduced হয় নাই) আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং সেসন জজ সাহেব বাহাদুর assessorগণের মতের সহিত একমত হয়েন এবং আসামীর দণ্ড হয়, তাহা হইলে তাঁহার ত্রুটি-বিচ্যুতি-বশতঃ একটি নিরপরাধ লোক দণ্ডিত হইবে। ইহাতেই তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান কত গভীর তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঐ দায়রা-মকদ্দমার পর তিনি ফৌজদারী মকদ্দমায় ওকালতি করিবেন না—সঙ্কল্প করেন এবং এই সঙ্কল্পের পর হইতে আর তিনি ফৌজদারী মকদ্দমায় ওকালতি করেন নাই।

কোন মকদ্দমায় তাঁহার অপেক্ষা Senior উকিলের সহিত তিনি নিযুক্ত হইলেও তিনি Senior উকিলের উপর নির্ভর করিয়া নিজ কর্ত্তব্যের অবহেলা করেন নাই। তাঁহার সহিত Senior উকিল উপস্থিত হইলে, Senior উকিল অধিকাংশ সময় তাঁহার উপর মকদ্দমা চালাইবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন এবং তিনি যত্নের সহিত মকদ্দমা চালাইয়া তাঁহার কৃতিত্ব ও যোগ্যতা প্রদর্শন করেন।

তাঁহার সহিত যে ব্যক্তি আলাপ করিয়াছেন তিনিই তাঁহার ব্যবহারের গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন।

তিনি বিদ্যোৎসাহী এবং শিক্ষার্থী দুঃস্থ বালকগণকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া আনন্দ লাভ করেন। তিনি ঐরূপ সাহায্যের কথা কাহাকেও জানাইতে কুণ্ঠা বোধ করেন।

তিনি মেদিনীপুর সহরে নিজ বাসোপযোগী বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা জীবিত আছে।

পুত্রগণ—	কন্যাগণ—
১। শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ দে বি-এস-সি।	১। শ্রীমতী গৌরীবালা
২। শ্রীঅমলকৃষ্ণ দে, বি-এস-সি।	২। কুমারী উমাসুন্দরী
৩। শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ দে	৩। কুমারী মায়াসুন্দরী
৪। শ্রীঅনিলকৃষ্ণ দে	৪। কুমারী নীলিমাসুন্দরী
৫। শ্রীঅজিতকৃষ্ণ দে	৫। কুমারী নমিত সুন্দরী

বংশলতা
রামকানাই দে
(পত্নী যমুনাময়ী)
নবীনকিশোর দে
(পত্নী ব্রহ্মময়ী)
লক্ষ্মীকান্ত
(পত্নী হীরামণি)
ঈশ্বরচন্দ্র
(পত্নী প্রসন্নময়ী)
আশুতোষ
(মৃত্যু ১৩৩০ সাল)
(পত্নী সত্যেশ্বরী)
পুলিনবিহারী
(মৃত্যু ১৩২১ সাল)
(পত্নী সরলাসুন্দরী)
অতুলচন্দ্র
(পত্নী কমলপাণি)
অমিয়কৃষ্ণ
অমলকৃষ্ণ
গৌরীবালা
স্বামী শ্রীসুনীলকুমার মিত্র
উমাসুন্দরী
(কুমারী)
অমৃতকৃষ্ণ
অনিলকৃষ্ণ
মায়াসুন্দরী
(কুমারী)
অজিতকৃষ্ণ
নীলিমা
সুন্দরী
নমিতা
সুন্দরী

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি এল,

মেদিনীপুরের এডভোকেট

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সুবিখ্যাত আকনার ঘোষ-বংশে ইঁহার জন্ম।, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মেমারী ষ্টেশন হইতে একক্রোশ দূরবর্ত্তী বাহাবপুর গ্রামে ইঁহার নিবাস।

এই বংশের অষ্টাদশ পুরুষ ৺রামমোহন ঘোষ সুপণ্ডিত ও সর্ব্বগুণান্বিত সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। স্বীয় ক্ষমতাবলে তিনি সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর অধিকারী হন এবং আনুমানিক ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি উক্ত বাহাবপুরকে একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত করেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তন্তুবায়, ক্ষৌরকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার প্রভৃতি সকল জাতি স্ব স্ব অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তথায় বসতি করিতে থাকে। স্বনামধন্য রামমোহন নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনি পূর্ব্বপুরুষের আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির সেবা-পূজার স্থায়ী ব্যবস্থা ও পাকা ঠাকুর-বাড়ী ও অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার সুপরিচালনার জন্য বিস্তর সম্পত্তি পৃথক নিয়োজিত রাখিয়া গিয়াছেন। ঐ ঠাকুরবাড়ীর অন্য অংশে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ঠাকুরের নিত্যসেবা ও অতিথি-ভোজন আজিও ঐ বংশের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। প্রত্যেক বৎসর পুরীর যাত্রীরা হাঁটা রাস্তা দিয়া পদব্রজে তীর্থভ্রমণে যাইবার সময় ঐ অতিথিশালায় আশ্রয় গ্রহণ করে ও তথায় ২।১দিন থাকিয়া ক্লান্তি বিনোদন করতঃ পুনরায় অগ্রসর হয়। বৈষ্ণব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকায় ঐ গ্রামে কোনও পূজায় প্রাণীবলি একেবারে নিষিদ্ধ। এই বংশের সকলেই বৈষ্ণবমতাবলম্বী। স্বীয় কীর্ত্তি-কলাপে, সৌজন্যে ও প্রতিভা-প্রভাবে এই বংশের পূর্ব্বপুরুষেরা সর্ব্বত্র

সমাদৃত হইতেন। নবাব-সরকার হইতে তাঁহারা চৌধুরী উপাধিদ্বারা সম্মানিত হয়েন। আজিও এই বংশের সকলেই চৌধুরী আখ্যায় অভিহিত।

উক্ত রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বাহাবপুরে থাকিয়া পৈত্রিক কীর্ত্তিকলাপ বজায় রাখিতে থাকেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী মুন্দীপুর গ্রামে গিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র; রাধাবল্লভ, কমলাকান্ত, ও হরিচরণ যথাক্রমে বড়বাড়ী, মেজবাড়ী ও ছোটবাড়ী নামে পরিচিত হয়েন। ঐ তিন সংসার একই প্রাচীরের ভিতর রাজ-অট্টালিকা-তুল্য পৃথক বসতবাটীতে পরম সদ্ভাবে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। এইসকল অট্টালিকার প্রহরীর কার্য্যের জন্য ঐ গ্রামে বাগ্দীদের বাস করান হয়। তাহারা শারীরিক বল-বিক্রমে অতুলনীয় ছিল। বিবাহ-বাসরে বা কোনও প্রদর্শনীতে তাহাদের অদ্ভুত লাঠিখেলা ও কুস্তি ইত্যাদি কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গৌরবের বিষয় ছিল। তাহারা থাকায় ঐ গ্রামে কাহারও বাড়ীতে কখনও ডাকাতি হয় নাই। ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ও অর্থাভাবে বাগ্দী জাতি এখন লুপ্তপ্রায় বলিলেই হয়।

উক্ত রাধাবল্লভের বংশে জ্ঞানেন্দ্রনাথের জন্ম। জ্ঞানেন্দ্রনাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ ব্যবসায়-উপলক্ষে পাটনায় গিয়া কিছুকাল বসবাস করেন ও তথায় প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং দেবালয়াদি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও পাটনারা বলিয়া খ্যাত। জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতামহ বংশমর্য্যাদানুযায়ী দেবদ্বিজে ভক্তিসম্পন্ন ও সর্ব্বজনপ্রিয় জমীদার ছিলেন। প্রজাগণ সকলে জমী-দারকে পিতৃতুল্য মনে করিত ও জমীদারও প্রজাদিগকে সন্তানের ন্যায় যত্ন করিতেন এবং তাহাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিতে সদাই সাধ্যমত চেষ্টিত থাকিতেন। এই বংশের প্রায় সকলেই সংস্কৃত ও ফার্শি ভাষায়

বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য সদাই যত্নবান ছিলেন। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভেই গ্রামে পোষ্ট অফিস, ডাক্তারখানা, স্কুল স্থাপিত হয় এবং আজিও উহারা এই বংশের খ্যাতি ও সমৃদ্ধি ঘোষণা করিতেছেন। গ্রামের ভিতরে বৃহদাকার জলাশয়সকল, নানাবিধ ফলফুলের বাগান, দেবমন্দিরাদি এখনও ইঁহাদের উন্নতির ও গৌরবের পরিচয় দিতেছে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ শান্তস্বভাব ও বিশেষ মেধাবী ছিলেন। কালধর্ম্ম-অনুসারে তিনি দেশে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষা শেষ করিয়া ইংরাজী ভাষা শিখিবার জন্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠ করেন এবং পরে তাঁহাদের জমীদারীর কার্য্যে তাঁহার পিতাকে সাহায্য করেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে, ন্যায়নিষ্ঠায় ও লোকহিতকর অনুষ্ঠানের সহায়তায় তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হন। তিনি বৈঁচী দক্ষিণপাড়া-নিবাসী ৺কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা প্রসাদ-কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিধায় বিবাহে কুলকর্ম্ম করেন এবং কোনও যৌতুক গ্রহণ করেন নাই। এই সময় বর্দ্ধমান জেলায় ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ হয়। সহরে ও পল্লীগ্রামে অনেকে প্লীহা, যকৃৎ ও জরে ভুগিয়া অকালে প্রাণ হারাইলেন। বিস্তর গ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়িল, অনেকে বাসস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইলেন। ঐ রোগ এখনও Burdwan fever নামে অভিহিত। জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতাও সেই সময় অসুস্থ হইয়া পড়েন ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বেহার অঞ্চলে বায়ু-পরিবর্ত্তনে যান। সেখানে কিছুদিন থাকার পর তিনি Tirhut State Railwayতে গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রতিভাবলে ও আদর্শ চরিত্রে তিনি শীঘ্রই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও উন্নতি করেন। চাকরী উপলক্ষে তিনি East Coast State Railway ও North Western

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী

Railwayএর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়া গত ১৯১৩ সালে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও পেনসন পান। তিনি নিজ গ্রামে আত্মীয়-স্বজন ও প্রজাবর্গের মধ্যে বাস করিবার অভিলাষে নিজ পৈত্রিক গৃহের সংলগ্ন স্থানে এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু দেশের জলবায়ু তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। নূতন বাড়ীতে দেবপূজাদি দ্বারা গৃহপ্রবেশ করতঃ একদিন মাত্র তাহাতে বাস করিয়া চিকিৎসকের পরামর্শমতে তিনি বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য সুদূর পঞ্জাব প্রদেশে গমন করেন। তথায় যাইয়া তাঁহার শরীর আরও খারাপ হয় এবং অল্পদিন ভুগিয়াই তিনি ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে ৫৬ বৎসর বয়সে তাঁহার স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক বিধবা কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

১৮৮৭ সালে যখন জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ কর্ম্মসূত্রে মজঃফরপুর জেলায় অবস্থান করিতেছিলেন তৎকালে ৫ই মে, বৃহস্পতিবার, রাত্রি ৫।২০ মিনিটের সময় সরাই নামক স্থানে জ্ঞানেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তিনি তাঁহার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। শান্তস্বভাব প্রিয়দর্শন জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাল্য-কালেই বংশের সকল প্রকার সদ্‌গুণাবলীর অধিকারী হয়েন। তিনি খুব মেধাবী ছিলেন এবং প্রথমে তাঁহার পিতার নিকটেই লেখাপড়া আরম্ভ করেন। কিছুদিনের জন্য তাঁহার মাতুলালয় বৈঁচিতে থাকিয়া তথাকার স্কুলে লেখাপড়া করেন। সেই সময় তাঁহার পিতা East Coast State Railwayতে বদলি হইয়া যাওয়ায় তিনি তাঁহার পিতা-মাতার সহিত জাহাজ ও গরুর গাড়ী করিয়া পুরী যান। তখন কলিকাতা হইতে পুরী যাইবার রেলপথ নির্ম্মাণের কার্য্য শেষ হয় নাই। পুরীর জেলা স্কুলে কিছুদিন পড়িয়া তিনি দেশে চলিয়া আসেন ও ১৮৯৮ সালে মেমারী বিদ্যাসাগর মেমোরিয়েল স্কুলে ভর্ত্তি হন। তাঁহার পিতাকে চাকরী-উপলক্ষে নানা স্থানে যাইতে হইত বলিয়া বাল্যাবস্থায় জ্ঞানেন্দ্র-

নাথের লেখাপড়ার ক্ষতি হইতেছিল। সেইজন্য তাঁহার পিতা ১২ বৎসর বয়সের সময় হইতেই তাঁহাদের আত্মীয় মেমারীর জমীদার শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সরকার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে রাখেন ও মেমারী স্কুলে পড়ান। স্কুলে ও বাসায় ভিন্নপ্রকৃতির অনেক ছাত্রের সহিত তাঁহাকে মিশিতে হইত কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই নিজ লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন ও অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করিতেন। শিক্ষকেরা সকলেই তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন এবং তাঁহার লেখাপড়ায় ও ব্যবহারে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। ১৬ বৎসর বয়সে ১৯০৩ সালে তিনি উক্ত মেমারি স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে Entrance পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ১৯০৫ সালে বর্দ্ধমান রাজ কলেজ হইতে F. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০৲ মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে কলিকাতা Ripon College হইতে যথাক্রমে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে B. A. ও ১৯১০ খৃষ্টাব্দে B. L. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাহার এক বৎসর পরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে Presidency College হইতে ইংরাজী সাহিত্যে M. A পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। B. A পাশের পরেই ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর কলেক্টরির ভূতপূর্ব্ব Superintendent ৺হরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলিনীর সহিত জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। কিন্তু দুই কন্যা ইন্দুপ্রভা ও লাবণ্যপ্রভা এবং এক পুত্র হীরেন্দ্রনাথকে রাখিয়া তাঁহার প্রথমা পত্নী ১৯২২ খৃষ্টাব্দে টাইফয়েড রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপরে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় কলিকাতা হাইকোর্টের আপীল বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত খেলাৎচন্দ্র দে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা মনোরমার পাণিগ্রহণ করেন এবং এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে ইঁহার এক পুত্র যোগীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত কন্যা দুইটিরই যোগ্য পাত্রে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রথম জামাতা শ্রীমান্ সুধীর-চন্দ্র রায়, এম-বি, চন্দননগরের ডাক্তার এবং দ্বিতীয় জামাতা শ্রীমান্

স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী

তপনকুমার মিত্র, এম-এ, বি-এল কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ এম-এ ও বি-এল পাশ করিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন। অত্যল্পকালের মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে সহকারী Public Prosecutorএর কাজ করেন। তৎপরে একাধিক বার তিনি Public Prosecutorএর অনুপস্থিতিকালে তৎপদে কার্য্য করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি Bengal Nagpur Railway Companyর, রাজা হৃষীকেশ লাহা C.I.E. মহাশয় প্রভৃতি অনেক জমীদারের ফৌজদারী মকদ্দমার উকীল। এই বিশ বৎসর কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত প্রধানতঃ ফৌজদারী বিভাগে তিনি ওকালতী করিয়া আসিতেছেন। আইন-ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তাঁহার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত।

তদ্ভিন্ন তিনি যেমন মিষ্টভাষী ও সদালাপী তেমনি পরোপকারী। মকদ্দমা মীমাংসা করিয়া দিয়া পক্ষগণের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপনের জন্য নিজ ক্ষতি স্বীকার করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন না। সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানেই তাঁহার বিশিষ্ট আসন তাঁহার কর্ম্ম-কুশলতা ও সর্ব্বজনপ্রিয়তার পরিচয়-দায়ক। যেমন এদিকে Junior উকীলদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতে তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট তেমনিই অন্য সকল ক্ষেত্রেও কেহ কখনও কোন প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট বিফলমনোরথ হয় নাই। তাঁহার ধর্ম্মে বিশ্বাস ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাও প্রগাঢ়। তাঁহার পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার পৈত্রিক বাসভবন বাহাবপুর গ্রামে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের দেবতা শ্রীধর জীউকে স্থাপন করিয়া একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহত্ত্বের পুরস্কার আছেই। তাঁহার সাফল্যের নিদর্শনস্বরূপ মেদিনীপুর সহরের কেরাণীটোলাস্থিত "অগস্তি হাউস" নামে সুপ্রসিদ্ধ বিরাট অট্টালিকা ও তৎসংলগ্ন

সুবিশাল উদ্যানভূমি যাহার মূল্য লক্ষাধিক টাকা হইবে আজ তাঁহার অধিকারে আসিয়া ইন্দ্রপুরীতে পরিণত হইয়াছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানেন্দ্রনাথ Advocate হন এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে এই অট্টালিকা ক্রয় করিয়া তাহা বহুমূল্য আসবাবপত্রে সুসজ্জিত করিয়া এবং অট্টালিকা-সংলগ্ন ভূমিতে অতি মনোরম বিচিত্র উদ্যান রচনা করিয়া তাহাতে নূতন শ্রী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। উদ্যান-রচনায় তিনি অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছেন এবং তাহাতে যে অপূর্ব্ব শোভা-সম্পদ সৃষ্ট হইয়াছে তাহা যথার্থই অমূল্য।

জ্ঞানেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ ফণীন্দ্রনাথ North Western Railwayতে চাকরী করেন ও সেই সূত্রে পঞ্জাবে থাকেন। তাঁহার পুত্রেরা জ্ঞানেন্দ্রনাথের নিকট থাকিয়াই লেখাপড়া করে। তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া পাশ করিয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ নিজ বাড়ীতে অনেক নিঃস্ব ছাত্রকে রাখিয়া শিক্ষা দেন ও দরিদ্র ছাত্রদের অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। বাল্যজীবনে তিনি স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বংশের সহিত বিশেষ পরিচিত হন ও তদবধি তিনি স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের জন্য যত্নবান হন। তাঁহার কন্যাদ্বয়কে তিনি উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা দেন ও বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া স্থানীয় মিশন বালিকা বিদ্যালয়কে হাই স্কুলে পরিবর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হন। সর্ব্বতো-মুখী প্রতিভাবলে তিনি একাধারে স্থানীয় উকীল লাইব্রেরির সহকারী সম্পাদক, মিউনিসিপাল কমিশনার, সেণ্ট্রাল জেলের বে-সরকারী পরিদর্শক, মিশন বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সভার সভ্য, মেদিনীপুর কো-অপারেটিভ People's Bankএর ডিরেক্টর, Town Clubএর প্রতিষ্ঠাতা ও Vice President, College governing bodyর সভ্য ও
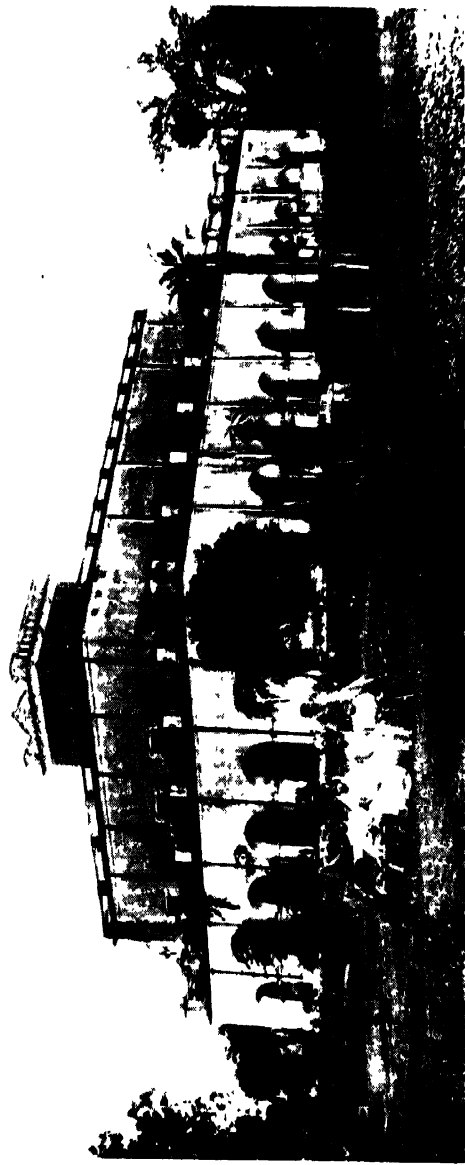
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরীর প্রাসাদোপম বাটী

হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় ও Hardinge Schoolএর Managing Committee ও সদর হাঁসপাতাল কমিটির সভ্য। কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্যও তিনি সদাই যত্নবান। তিনি স্থানীয় Agricultural Associationএর সভ্য। দেশের উন্নতিকল্পে তিনি সর্ব্বদাই সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাহা এই যে, এইরূপ নানা বিষয়ে নানাবিধ কার্য্যের মধ্যেও কখনও তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা নষ্ট হয় না।

বংশ তালিকা
রামমোহন ঘোষ (১৮)
কৃষ্ণচন্দ্র (১৯)
বৃন্দাবনচন্দ্র (সুন্দীপুর গিয়া বাস করেন)
রাধাবল্লভ (২০) (বড়বাড়ী)
কমলাকান্ত (মেজবাড়ী)
হরিচরণ (ছোটবাড়ী)
গোকুলানন্দ (২১)
জগদানন্দ
ব্রজানন্দ অপুত্রক
ভোলানন্দ
বৃন্দাবন (২২)
নিত্যানন্দ অপুত্রক
রাজীবলোচন
মধুসূদন (২৩)
বিপিনবিহারী
রাসবিহারী
ক্ষুদীরাম অপুত্রক
কৃষ্ণবিহারী
দেবেন্দ্রনাথ (২৪)
তুলসীচরণ
উপেন্দ্রনাথ
ললিতমোহন
জ্ঞানেন্দ্রনাথ (২৫)
ফণীন্দ্রনাথ
হীরেন্দ্রনাথ
যোগীন্দ্রনাথ
মণীন্দ্রনাথ
বীরেন্দ্রনাথ
নরেন্দ্র
ধীরেন্দ্র
সত্যেন্দ্র

স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার বন্দোপাধ্যায়

হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে সুবিখ্যাত কুলীন বংশে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ঈশানচন্দ্রের পিতা পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পূজা, পাঠ ইত্যাদিতে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিতেন। ঈশানচন্দ্র পিতার সর্ব্বগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মাদি পরম নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। তিনি এরূপ সদাচারী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন যে, তৎকালীন ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহার উচ্চ কুলমহিমা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। ঈশানচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার ন্যায় স্বধর্ম্মপরায়ণ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। নবগোপালের গুণে ও বংশগরিমায় আকৃষ্ট হইয়া কলিকাতার ভবানীপুরস্থ হাইকোর্টের তৎকালীন সুবিখ্যাত উকিল রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর সি-এস-আই তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী চন্দ্রজ্যোতিঃ দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। তৎকালীন কলিকাতা-সমাজে জগদানন্দের এরূপ যশঃ ও প্রতিপত্তি ছিল যে, আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে ভারতে পদার্পণ করিলে তিনি জগদানন্দের গৃহে অতিথি হইয়া সমগ্র বঙ্গবাসীকে ধন্য ও সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক বড়লাটগণ ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃবৃন্দ সকলেই তাঁহার গৃহে বহুবার অতিথি হইয়াছিলেন এবং সকলেই জগদানন্দকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। বর্দ্ধমানাধিপতি, হাতোয়া, ডুমরাও প্রভৃতি তৎকালীন রাজন্যবর্গ তাঁহার সহিত বিশেষ সখ্যতাপন্ন ছিলেন। জগদানন্দের পাঁচ পুত্র কামিনীকুমুদ, শ্যামাকুমুদ, কমলাকুমুদ, উমাকুমুদ ও গৌরীকুমুদ এবং চারি কন্যা

চন্দ্রজ্যোতিঃ, ক্ষীরদাসুন্দরী, কাশীশ্বরী ও কাদম্বরী। তৃতীয়া কন্যা কাশীশ্বরী দেবীর দ্বিতীয় পুত্র রায় ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর বর্ত্তমানে কলিকাতা পুলিশের ডেপুটী কমিশনার-পদে উন্নীত হইয়াছেন এবং তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের একজন সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার।

স্বদেশে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া-প্রকোপ হেতু এবং কর্ম্মোপলক্ষে, নবগোপাল বাঁকুড়া সহরে আসিয়া বসবাস করেন। তখন বাঁকুড়ায় রেল হয় নাই; জল-হাওয়া খুব স্বাস্থ্যকর ছিল এবং বাসোপযোগী সকল সুবিধাই ছিল। চতুষ্পার্শ্বস্থ বনানীবেষ্টিত নদী ও পর্ব্বতমালা-ভূষিত ক্ষুদ্র বাঁকুড়া সহরটী তৎকালে বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। নবগোপাল বাঁকুড়ায় আসিয়া নিজ অধ্যবসায়গুণে ক্রমে ক্রমে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার-পদে নিযুক্ত হন। তিনি এতাদৃশ জনপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁহাকে উপর্য্যুপরি পাঁচ ছয়বার মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান্-পদে বাঁকুড়ার অধিবাসিবৃন্দ মনোনীত করিয়াছিলেন। তিনি দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন। তৎকালীন ছোটলাট তাঁহাকে একটী সনদ দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। পূর্ত্তকার্য্যাদির জন্য সরকারী ও বেসরকারী সভাবৃন্দের নিকট তিনি প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী চন্দ্রজ্যোতিঃ দেবী পরম বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তিনি সেই সময়ের বাঁকুড়া-সমাজের নেত্রীস্বরূপা ছিলেন। দান, পরোপকার ইত্যাদি নানাপ্রকার সৎকর্ম্মে তিনি সর্ব্বদা ব্যাপৃতা থাকিতেন।

নবগোপালের তিন পুত্র ও এক কন্যা; জ্যেষ্ঠ স্বনামধন্য প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট কৃতী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই কর্ত্তব্যপরায়ণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, পিতৃমাতৃভক্ত ও পরম ধার্ম্মিক-প্রকৃতি ছিলেন। তিনি

স্বর্গীয় নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পিতামহী স্বর্গীয়া চন্দ্রজ্যোতি দেবী

স্বর্গীয়া কালী দেবী

বাল্যকাল হইতেই অশ্বারোহণে ও সন্তরণে বিশেষ পটু ছিলেন এবং তাঁহার তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার জন্য সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। অল্পবয়সে সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও বিহারের অনেক জেলাতে তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত রাজকীয় কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি এতাদৃশ উন্নতমনা ও অমায়িক প্রকৃতির ছিলেন যে, তিনি যে যে স্থানে কর্ম্মোপলক্ষে গিয়াছিলেন সেই সেই স্থানের লোকেরা তাঁহার স্মৃতিকে অদ্যাপি সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সরকারী কর্ম্মে বিশেষ যোগ্যতার জন্য তৎকালীন রাজকর্ম্মচারীবৃন্দের নিকট হইতে বহু প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন। গত উড়িষ্যা-জরীপে তিনি এরূপ যোগ্যতার সহিত সুদীর্ঘ নয় বৎসর কাল কার্য্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সময়ের সকল রাজকর্ম্মচারীই তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও অধ্যবসায়ের শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি আবগারী বিভাগের হাকিম-পদে দীর্ঘকাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ৩১ বৎসর বিশেষ সম্মানের সহিত সরকারী কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ১৯১৮ সালে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক বাঁকুড়ায় বহু জনহিতকর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। অচিরেই মিউনিসিপ্যাল কমিশনার-পদে মনোনীত হ'ন এবং বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা দ্বারা দোষ দেখাইয়া বাঁকুড়াবাসীর প্রভূত মঙ্গল সাধন করেন। তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় ও তৎকালীন জনপ্রিয় জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহোদয়ের সহযোগিতায় বাঁকুড়ার চাষীদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য সর্ব্বপ্রথম Co-operative Industrial Bank স্থাপিত হয়। ইহা ছাড়া তিনি সহরের বহু জনহিতকর কর্ম্মে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবন কর্ত্তব্যপরায়ণতার জীবন্ত ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৯২৫ সালে ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ

করেন। বাঁকুড়াবাসী স্থানীয় Edward Memorial Hallএ তাঁহার একটী প্রতিকৃতি রক্ষা করিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তৎকালীন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হার্ট প্রসন্নকুমারের জীবনী-সম্বন্ধে বহু প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা দেন এবং সহরের বিশিষ্ট লোকেরা সকলেই তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছিলেন।

প্রসন্নকুমার বর্দ্ধমান জেলার ন্যামৎপুর গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত দক্ষিণা-রঞ্জন চক্রবর্ত্তীর মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী কালিদাসী দেবীকে বিবাহ করেন। কালিদাসী পরম ধর্ম্মপরায়ণা ও অতীব অমায়িক প্রকৃতির নারী ছিলেন। স্বামী, পুত্র, কন্যা, আতুর, অভ্যাগতদের সেবা, ব্রতপালন ইত্যাদি সকল কর্ম্মেই তাঁহার মঙ্গলহস্ত সর্ব্বদাই প্রসারিত থাকিত। তিনি সংসারে লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন এবং তাঁহার কোমল প্রকৃতি ও স্বতঃনিঃসৃত স্নেহ-ধারার স্মৃতি অদ্যাপি হৃদয়ে ব্যথা প্রদান করে।

প্রসন্নকুমারের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। তাঁহার জীবিত অবস্থায় দুই কন্যা স্বর্গারোহণ করেন ও তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ নন্দপ্রসাদ অকালে মারা যান।

রায় বাহাদুর হরিপ্রসাদ

প্রসন্নকুমারের প্রথম পুত্র রায় হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের নাম অতুলনীয় বদান্যতার জন্য বিশেষ সুপরিচিত। হরিপ্রসাদ বাল্যকাল হইতে খুব সাহসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁহার উদার হৃদয় ও অমানুষিক উদ্যমশীলতা দেখিয়া সকলেই অনুমান করিত যে, কালে ইনি একজন প্রতিভাশালী ও যশস্বী লোক হইবেন। অল্পবয়সেই হরিপ্রসাদ কয়লার খনিতে কর্ম্মশিক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁহার উদ্যম ও সাহস দেখিয়া তৎকালীন উচ্চপদস্থ সাহেব কর্ম্মচারীরা তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। হরিপ্রসাদ স্বকীয়

রায় শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর

অধ্যবসায়-গুণে অল্পদিনের মধ্যেই কয়লাখনির উচ্চপদে উন্নীত হয়েন। তিনি এতাদৃশ জনপ্রিয়, প্রিয়দর্শন ও পরোপকারী ছিলেন যে, তিনি যে-খানেই যাইতেন সেখানকার লোকেরা তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িত। কিন্তু যে হৃদয় বৃহত্তর জীবনের আশা করে সে কখনও স্বল্প গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। জীবনকে প্রসারিত করিবার আহ্বান হরি-প্রসাদের মর্শ্মে আঘাত দিতে লাগিল। চাকরীর মোহ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। তাই তিনি ভগবানের অভীষ্টপথে ব্যবসা-ক্ষেত্রে ভাগ্যপরীক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইলেন। প্রথমেই তাঁহাকে ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়, অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতা ও সকলের উপর তাঁহার সরল উদার হৃদয়ের উপর বিজয়-লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল। হরিপ্রসাদ কয়লার খনির কন্ট্রাক্টর-পদ লইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং অচিরেই দান-শীলতা এবং উদারতার জন্য স্বনামধন্য হইয়া উঠিলেন। তিনি আজ বাঙ্গলা ও বিহারে সর্ব্বত্র সুপরিচিত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া-ছেন। নিজ ব্যবসা-কার্য্য ছাড়া তিনি প্রত্যেক জনহিতকর কর্ম্মে প্রভূত পরিশ্রম করিয়া থাকেন এবং লোক-মঙ্গলার্থে অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। বিলাত হইতে Labour Commission Coal field-এ আসিলে তিনি তাঁহাদিগকে নিজ কর্ম্মস্থানে লইয়া যান এবং শ্রম-জীবীদের অভাব-অভিযোগ তাঁহাদের গোচর করেন। তিনি তাঁহার কর্ম্মস্থলে প্রত্যেক বৎসর শ্রমজীবীদের জন্য পুরস্কার ও নানা প্রকার আমোদের ব্যবস্থা করেন। বিহারের ভূতপূর্ব্ব লাট Sir Hugh Stephenson তাঁহার সহিত বিশেষ সখ্যভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার কন্যার বিবাহে এবং বর্ত্তমান গভর্ণর স্যর জন সিফটনের কন্যার বিবাহে রায় বাহাদুর নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সরকারী ও বেসরকারী সকল কার্য্যেই তিনি তাঁহার সংগঠন-শক্তি এবং অভিনব কর্ম্মপদ্ধতি বহুবার

দেখাইয়া সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছেন। সরকার বাহাদুর তাঁহার কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" খেতাবে ভূষিত করিয়াছেন। হরিপ্রসাদের হৃদয় খুবই উচ্চ প্রকৃতির। দরিদ্র, আতুর, অভ্যাগতদের প্রতি এবং প্রত্যেক জনহিতকর কর্ম্মে তাঁহার বদান্যহস্ত সর্ব্বদাই প্রসারিত থাকে। তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষার্থে বাঁকুড়া Medical School-এ Prasanna Kumar Memorial Operation Theatre নামে একটী শস্ত্রোপচার-গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-প্রচারার্থ বাঁকুড়ার Public Libraryতে বহু পুস্তক দান করিয়াছেন এবং ঝরিয়া সহরে বালকদের শিক্ষার জন্য বঙ্গ বিদ্যালয় নামে একটী বিদ্যালয় বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ভারত সেবাশ্রমের হস্তে গয়াতে সেবাশ্রম-নির্ম্মাণার্থে এবং গৌড়ীয় মঠের হস্তে নবদ্বীপে বিশ্রামাগার নির্ম্মাণের জন্য বহু অর্থদান করিয়াছেন। তাঁহার মাতুলালয়ে (শ্যামৎপুর গ্রাম জেলা বর্দ্ধমান) পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর স্মৃতি-রক্ষার্থে প্রসন্নেশ্বর ও কালীশ্বর নামে দুইটী শিবলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক স্থানীয় জনসাধারণের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন এবং নিজ বংশকে কীর্ত্তিমান্ করিয়াছেন। হরিপ্রসাদ বর্দ্ধমান জেলার নন্দীগ্রাম-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত সুধাকৃষ্ণ নায়কের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অভয়াসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্র শ্রীমান সাতকড়ি স্কুলে পড়াশুনা করিতেছে। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মহামায়া দেবীর বহুবাজারের দেওয়ান-জি-হাউস-নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে এবং কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বীণাপাণি দেবীর সহিত ঘাটভোগ (খুলনা)-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে।

সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী অভয়াসুন্দরী দেবী

রায় বাহাদুর হরিপ্রসাদ একজন ভাল শিকারী। বেহার-উড়িষ্যার মাননীয় গভর্ণর স্যর হিউ ষ্টিফেনসন, বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং রাজা-মহারাজার সহিত তিনি শিকার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

রায় বাহাদুর হরিপ্রসাদ সৌম্যকান্তি, সুদর্শন পুরুষ। তিনি বিদ্যোৎসাহী এবং সাহিত্যসেবীগণের পরম বন্ধু। তিনি স্বয়ং সাহিত্যানুরাগী এবং অপরকে সাহিত্য-চর্চ্চায় উৎসাহিত করিয়া থাকেন।

প্রসন্নকুমারের দ্বিতীয় পুত্র রাধিকাপ্রসাদ ১৮৯৩ সালে বাঁকুড়া সহরস্থ "নবগোপাল লজে" জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার স্কুলের লেখাপড়া বাঁকুড়া জেলা স্কুলে ও বর্দ্ধমান মিউনিসিপাল স্কুলে হয়। বাঁকুড়া কলেজ হইতে আই-এ পাশ করেন এবং স্কটিসচার্চ্চ কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন। ছাত্রজীবনে পড়ায় ও খেলায় কৃতিত্ব লাভ করেন। প্রিনসিপাল মিচেল, প্রিনসিপাল ব্রাউন, প্রিনসিপাল আরকুহার্ট ও ডাক্তার ষ্টিফেন ইঁহার লিখিত ইংরাজি রচনাগুলির সুখ্যাতি করিয়া প্রশংসা পত্র দিয়াছিলেন। রাধিকাবাবু যখন এম-এ, বি-এল, পড়েন সেই সময় তাঁহার কঠিন পীড়া হয় এবং সেইজন্য তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। রাধিকাবাবু ডেপুটী কলেক্টরের পদের জন্য কয়েকবার সিভিলিয়ান হুক্, সিভিলিয়ান মার্ সিভিলিয়ান ভাস্ ও সিভিলিয়ান গুরুসদয় দত্ত কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছিলেন। সরকার তাঁহাকে সবডেপুটী পদ দেন কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি কিছুদিন বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েটে কাজ করেন। পরে প্রচর অর্থ উপার্জ্জনের জন্য চাকুরী ত্যাগ করিয়া ব্যাবসায়-কার্য্যে প্রবেশ করেন। রাধিকাবাবু নিজ ব্যবসা কার্য্য ছাড়া নানা জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। কলিকাতা সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির ও বাঁকুড়া সম্মিলনীর ইনি সম্পাদক। কলিকাতা শিশির কুমার ইন্‌ষ্টিটিউট, বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুল ও কলিকাতা শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্যকরী সমিতির

ইনি অন্যতম সভ্য। রাধিকাবাবু অমৃতবাজার পত্রিকায় নারীমঙ্গল ও পল্লীস গঠন বিষয়ে প্রায়ই নানাবিধ প্রবন্ধ লিখেন। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় গোলাপলাল ঘোষ ইঁহার প্রবন্ধগুলির বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। রাধিকাবাবু সিউড়ীর জমিদার মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ৺ জ্ঞানদা কিঙ্কর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা দেবীকে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করেন।

প্রসন্নকুমারের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত ব্যবসা করিয়া অর্থোপার্জ্জন ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি খুব অমায়িক প্রকৃতির এবং সাংসারিক সকল কার্য্যে তাঁহার মঙ্গল-হস্ত সর্ব্বদাই প্রসারিত থাকে। তাঁহার পাঁচ পুত্র—দিলীপকুমার, সুনীলকুমার, সুধীরকুমার, পবিত্রকুমার এবং অরুণকুমার; ছেলেগুলি বুদ্ধিমান ও প্রিয়দর্শন। তিনি নদীয়া জেলার সীমহাট-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী বীণাপাণি দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন।

প্রসন্নকুমারের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ পাশ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন এবং কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি নদীয়া জেলার মুড়াগাছা গ্রাম-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী সোনালী দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন।

প্রসন্নকুমারের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীর সহিত শিবপুর-নিবাসী বিখ্যাত ডাক্তার রায় বাহাদুর ৺দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত চুণীলাল মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি-এল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবাহ হইয়াছিল। প্রথমা কন্যার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শান্তেশ্বরী দেবীর সহিত চুণীলালের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। তাঁহার

শ্রীমতী মহামায়া দেবী (জ্যেষ্ঠা কন্যা)

শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, কনিষ্ঠা কন্যা

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত নিৰ্ম্মলপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ. ও তিনকড়িবাবুর পুত্রগণ

মিঃ রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

উভয় পক্ষে অনেকগুলি পুত্র-কন্যা বিদ্যমান। পুত্রগুলি সংপ্রকৃতির ও বেশ বিদ্বান।

প্রসন্নকুমারের মধ্যমা কন্যা ভুবনেশ্বরী দেবীর নদীয়া জেলার সাঁমহাট-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত প্রবোধনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি-এর সহিত বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কন্যাটির মৃত্যু হইয়াছে। জামাতা পুনরায় বিবাহ করেন নাই। তিনি এক্ষণে Calcutta Police Training Collegeএর Chief mental Instructor। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ প্রণবকুমার ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়েন।

নবগোপালের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ-বিভাগে যোগ্যতার সহিত কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক বাকুড়াতেই বরাবর ছিলেন। তিনি খুব অমায়িক প্রকৃতির এবং পিতৃমাতৃ-ভক্ত ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং জ্যেষ্ঠের স্বর্গারোহণের অল্পদিন পরেই স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র বিদ্যমান। জ্যেষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদ। মধ্যম জানকীপ্রসাদ ব্যবসা করেন. কনিষ্ঠ জ্ঞানদাপ্রসাদ পুলিসের একজন যোগ্য ইন্সপেক্টর। জানকীপ্রসাদ গত যুদ্ধে বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করিয়াছিলেন।

নবগোপালের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমারের তিন পুত্র বিদ্যমান,। মধ্যম রামপ্রসাদ ও কনিষ্ঠ নিশিকান্ত বাকুড়ার আদালতে কর্ম্ম করেন। দুই ভ্রাতাই বেশ বিনয়ী ও সংপ্রকৃতির।

নবগোপালের একমাত্র কন্যা ছিল; তাঁহার একটি পুত্র শ্রীযুক্ত ভবতোষ মুখোপাধ্যায় অল্পবয়সে অনেকগুলি পুত্র-কন্যা রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ভবতোষ সুগায়ক ছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রবোধগোপাল মুখোপাধ্যায়

ইনি হাওড়া জেলার Public Prosecutor এবং নদীয়া জেলার অতি সম্রান্ত বংশসম্ভূত। এই বংশের সহিত নদীয়া রাজবংশের বিবাহসূত্রে সম্বন্ধ ও আত্মীয়তা।

ইঁহাদের আদি নিবাস নদীয়া জেলার বীরনগর (উলা) গ্রামে। ইঁহার জ্যেষ্ঠ খুল্লপিতামহ ৺রামগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় নদীয়া জেলার Government Pleader ছিলেন এবং তৎসূত্রে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে প্রথমে অস্থায়ী পরে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে (বাঃ ১২৬৩ সালে বীরনগর মহামারী-বিধ্বস্ত হইতে আরম্ভ হইলে ক্রমশঃ স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। রামগোপাল বাবু নদীয়া রাজ-সরকারেরও উকীল ছিলেন এবং মহারাজা সতীশচন্দ্রের বিশেষ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। রামগোপালের অন্যতম পুত্র ৺বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় Detective Departmentএর কৃতী ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন।

রামগোপালের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রবোধ-গোপাল বাবুর পিতামহ। কৃষ্ণবিহারী জ্যেষ্ঠ রামগোপালের পুত্রের বয়সী এবং জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া কর্ত্তৃক পুত্রস্নেহে পালিত হয়েন। ইনি প্রথমে উকীল হইয়া কৃষ্ণনগরে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতাসূত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বাকবিতণ্ডা করিলে সেকালে জ্যেষ্ঠের প্রতি দেয় সম্মানের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়,—বিবেচনা করিয়া তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটী করিতে গিয়া একদা বেত্রদণ্ডের আদেশ দিয়া বেত্রাঘাত-জর্জ্জরিত আসামীকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় এরূপ ব্যথিত হয় যে, তিনি

রায় সাহেব স্বর্গীয় আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া Executive Branch হইতে Judicial Branch-এ বদলী হইয়া মুন্সেফী গ্রহণ করেন।

রামগোপাল ও কৃষ্ণবিহারী উভয় ভ্রাতাই মুক্তহস্তে দান করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে যে, রামগোপাল বাহিরের ঘরে বসিয়া মক্কেল-পরিবৃত হইয়া কার্য্য করিতেছেন; ভিক্ষুক আসিয়া বস্ত্র প্রার্থনা করিল; পাছে বাটীর ভিতর কাপড় চাহিতে পাঠাইলে গৃহিণী বিরক্তি প্রকাশ করেন এইজন্য রামগোপাল ফরাসের চাদর অথবা আলোয়ানে গাত্র আবৃত করিয়া পরণের কাপড় ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুককে দিয়া কার্য্য করিতে থাকিলেন।

কৃষ্ণবিহারীও জ্যেষ্ঠের উপযুক্ত ভ্রাতা ছিলেন। তিনি যখন যে স্থানে কার্য্য করিতেন তাঁহার আদালতের সেরেস্তাদার হইতে চাপরাসী পর্য্যন্ত সকলের আহারের ব্যবস্থা তাঁহার বাসায় নির্দ্দিষ্ট ছিল। কর্ম্মচারীগণ কেবলমাত্র শয়নের স্থান ঠিক করিয়াই নিশ্চিন্ত হইত।

কৃষ্ণবিহারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় সাহেব আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। ইনি বাঙ্গালার রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের Inspector of Registration, Bengal) ইন্‌সপেক্টর ছিলেন; এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়া নিজ গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরস্থ বাটীতে বাস করিতেছেন। আনন্দগোপাল বাবুর মধ্যম সহোদর রায় বাহাদুর প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় পোষ্টাল বিভাগের ডেপুটী (Deputy Post Master General, Bengal) পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ছিলেন। ইনিও অবসর গ্রহণ করিয়া ৺বৈদ্যনাথধামে গুরু শ্রীমান্ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমের সন্নিকটে বাস করিতেছেন।

প্রবোধগোপালবাবু আনন্দগোপাল বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রথমে কৃষ্ণনগরে ওকালতী আরম্ভ করিয়া ১৯১৯ সালে হাওড়ায় আসেন এবং ১৯২৯ সালের শেষভাগ হইতে Public Prosecutor নিযুক্ত হয়েন।

প্রাণগোপালবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বপোগোপাল মুখোপাধ্যায় পোষ্টাল সুপারিনটেনডেণ্ট। তিনি বর্ত্তমানে গয়ায় আছেন।

প্রবোধগোপালবাবুর একমাত্র পুত্র প্রশান্তগোপাল কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে। ইঁহার জামাতা প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় Calcutta Corporationএর Motor Vehicles' Depotর Engineer-in-charge।

আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম নৈষধ-কাব্যপ্রণেতা ভরদ্বাজ-গোত্র-সম্ভূত শ্রীহর্ষ হইতে প্রবোধগোপাল বাবু ৩১ পুরুষ। সদাচারী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া এই বংশ খ্যাত। প্রবোধগোপালবাবু দেশপূজ্য শ্রীশ্রীহরিগুরু স্বামীর আশ্রিত।

কলিকাতা হলওয়েল লেন-নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীনাথ রায় ও রায় বাহাদুর মল্লীনাথ রায় মহাশয়দ্বয়ের পিতা ৺রায় বাহাদুর ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায় ৺কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পুত্র।

শ্রীযুক্ত প্রবোধগোপাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত প্রবোধগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

বংশলতা

১। শ্রীহর্ষ

|

১০। উৎসাহ
(প্রথম কুলীন)

⋮

২১। শিবাচার্য্য

⋮

২৩। যজ্ঞেশ্বর

|

২৬। উদয়নারায়ণ

|

২৭। কৃষ্ণজীবন

⋮

২৮। বৈকুণ্ঠজীবন

|

২৯। রামগোপাল — কৃষ্ণবিহারী — অন্যান্য পুত্রকন্যা

কৃষ্ণবিহারীর সন্তান:
৩০। আনন্দগোপাল — কুমুদিনী — ঈশানী — প্রাণগোপাল — কাত্যায়িনী — ললিত — প্রমোদ — নন্দরাণী

ললিত: নির্ম্মল
প্রমোদ: দুইপুত্র

আনন্দগোপালের সন্তান:

৩১। প্রথমা স্ত্রী: ননাবালা — প্রবোধগোপাল (নির্ম্মলা দেবী) — সুভাষিণী — সুবেশনন্দিনী — সুধীরগোপাল

৩২। প্রবোধগোপালের সন্তান: মাধুরী (স্বামী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়) — প্রশান্তগোপাল — লাবণ্য — প্রতিভা — মনীষা — রেবা

দ্বিতীয়া স্ত্রী: সুশীল — হরিদাসী — অনিল — রেণু — সুনীল — সুহৃদ — প্রিয় — পারুল

শ্রীযুক্ত হরিগোপাল চট্টোপাধ্যায়,

শ্রীমান ভূদেব চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যা

শ্রীযুক্ত হরিগোপাল চট্টোপাধ্যায়

নদীয়া জিলার অন্তর্গত কাঁচকুলি গ্রামের প্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায়-বংশে শ্রীযুক্ত হরিগোপাল চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ জিলা ২৪ পরগণা-স্থিত ভট্টপল্লী গ্রামে বাস করিতেন। শ্রীযুক্ত হরিগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই প্রায় অধ্যাপক ছিলেন। নদীয়ার দানশীল মহারাজা স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহোদয় এই বংশের কাহারও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া প্রচুর নিষ্কর সম্পত্তি দান করিয়া কাঁচকুলি গ্রামে বাস করান; তদবধি এই বংশ কাঁচকুলি গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছেন। এই বংশের ঊর্দ্ধতন পুরুষের মধ্যে সন্তোষ-কুমার ভট্টাচার্য্যের নাম পাওয়া যায়। সন্তোষকুমারের পুত্র এবং পৌত্রের নাম জানা যায় নাই। তাঁহার প্রপৌত্রের নাম রামকান্ত। ৺সন্তোষকুমারের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র নদীয়া জিলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ থানার অধীন ফরিদপুর নামক গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার নাম পরেশনাথ ভট্টাচার্য্য। পরেশনাথ মেটিয়ারীর প্রসিদ্ধ জমীদার ৺রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর দৌহিত্রীর কন্যা রঘুমণি দেবীকে বিবাহ করেন। রঘুমণি ইং১৯১৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরবর্ত্তী তিথিতে পরলোক গমন করেন। পরেশনাথ বাবুর চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ নৃসিংহ দেব, মোক্তার ছিলেন, ১৯২১ সালের ৮ই চৈত্র ইঁহার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় শ্রীহরিগোপাল বি-এ বি-এল্; তৃতীয় শ্রীজটীলগোপাল, এবং চতুর্থ শ্রীসত্যগোপাল।

পরেশনাথবাবুর দ্বিতীয় পুত্র মালদহের উকিল শ্রীযুক্ত হরিগোপাল চট্টোপাধ্যায়। ইনি সন ১২৮৭ সালে ১১ই চৈত্র বুধবার মেটিয়ারী গ্রামে

জন্মগ্রহণ করেন। ১৩০১ সালে স্থানীয় এম-ই স্কুল হইতে মাইনর পাশ করিয়া বৃত্তিলাভ করেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ স্কুল হইতে কেহ কখনও বৃত্তিলাভ করিতে পারে নাই। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জঙ্গীপুর হাই স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী কলেজ হইতে এফ-এ পাশ করিয়া রাণী মনোমোহিনী বৃত্তি লাভ করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ঐ কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া মেটিয়ারী এম-ই স্কুল হাই-স্কুলে পরিণত হইলে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে রিপন কলেজ হইতে ইনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মালদহ সদর কাছারীতে ওকালতী আরম্ভ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে বর্দ্ধমান জিলাস্থিত ঝালডাঙ্গা-নিবাসী ৺শিবচন্দ্র রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মনোরমা দেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ নন্দগোপাল বি-এ পাশ করিয়া আইন পড়িতেছে। মধ্যম শ্রীমান্ বিনয়গোপাল প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী, কনিষ্ঠ শ্রীমান্ কৃষ্ণগোপাল নিম্ন শ্রেণীতে পড়িতেছে। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অমিয়বালা দেবীর সহিত বহরমপুরের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে। কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কমলাবালা দেবীর সহিত পাঁচথুপী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে।

হরিগোপাল বাবুর বংশ লতা
৺সন্তোষ কুমার দেবশর্ম্মা ভট্টাচার্য্য
৺রামকান্ত দেবশর্ম্মা
৺কৃষ্ণদাস
৺দীননাথ কাঁচলি
মথুরানাথ
৺পরেশনাথ
৺রামযত্ন
জগপতি
মদারা ফরিদপুর থানা কালীগঞ্জ
৺নৃসিংহদেব
মালদহ
শ্রীহারগোপাল
মালদহ
শ্রীজটিলগোপাল
শ্রীসত্যগোপাল
মালদহ
শ্রীনারায়ণ গোপাল
শ্রীভূদেব
শ্রীবাসুদেব
শ্রী বজয়গোপাল
শ্রীবিষ্ণুগোপাল ও খোকা
শ্রীনন্দগোপাল
শ্রীবিনয়গোপাল
শ্রীকৃষ্ণগোপাল

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ

৺গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর

গঙ্গাচরণ খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুমার অধীন কেড়াগাছি গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশব ও বাল্যে তাঁহার পিতা শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যারত্নের নিকট ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন ও পরে ভাটপাড়া, নবদ্বীপ এবং কাশীতে বিখ্যাত আচার্য্যগণের নিকট বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি পাঁচ বৎসর নদীয়ার মহারাজের সভাপণ্ডিত এবং তাঁহার চতুষ্পাঠীতে বেদান্ত-বিভাগের অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া দ্বারবঙ্গের মহারাজ তাঁহাকে 'পণ্ডিতরাজ" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং এখানে উপনিষদ্‌ কার্য্যালয়, গীতা সভা, লিটারারি সোসাইটী, শঙ্কর সভা, বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংলিপ্ত ছিলেন এবং বঙ্গীয় শঙ্কর মঠের সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে সর্ব্বদা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। উপনিষদ কার্য্যালয়ে ও বেদমন্দিরে তিনি ১৪ বৎসর কাল নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময় তিনি উপনিষদের ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। মোটের উপর কলিকাতায় কি সংস্কৃত-শিক্ষিত আর কি ইংরাজী-শিক্ষিত, উভয় শ্রেণীর বিদ্বজ্জনের তিনি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

পণ্ডিতরাজ ব্রাহ্মণোচিত তেজস্বী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা সত্যাশ্রয়ী ছিলেন বলিয়া কাহাকেও ভয় করিতেন না, কোন প্রলোভনই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। তিনি যে সময় নদীয়া-রাজের সভা-পণ্ডিত ছিলেন, সেই সময় বঙ্গদেশে "ব্রাহ্মণ বড় না বৈদ্য বড়" এই

আন্দোলনে তিনি যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিয়া তেজস্বিতার যথোচিত পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি "দেবত্র আইন" সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তিপূর্ণ যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকটে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। বেদান্তশাস্ত্রে অনন্যসাধারণ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ বেদান্ত-বিদ্যাসাগর মহাশয় যশোহর জেলার অন্তর্গত বিদ্যানন্দকাটীগ্রামে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তিনি ঐ গ্রামে স্বীয় মধ্যম পুত্রের জন্য একটি পাত্রী দেখিতে গিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া তিনি এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার শব যেন কলিকাতায় নিমতলার ঘাটে সংকার করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার কোন আত্মীয়-স্বজন নিকটে ছিলেন না। তার-যোগে পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাঁহার মধ্যম পুত্র পিতার অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য পিতার শব মোটরযোগে বিদ্যানন্দকাটী হইতে ১৫০ মাইল দূরবর্ত্তী কলিকাতায় আনয়নপূর্ব্বক সংকারের ব্যবস্থা করেন। মৃত্যুকালে পণ্ডিতরাজের বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল।

রায় পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর

সন ১২৬৫ সালের ৭ই শ্রাবণ পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় শিবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি স্বীয় বিদ্যানুরাগ ও উদ্যমের বলে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়দিগের সহিত প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে আইন পরীক্ষা দিয়া কিছুদিন হাইকোর্টে ওকালতী করিয়াছিলেন এবং শেষে মুনসেফী পদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে স্বীয় কর্ম্মকুশলতা-বলে ডিষ্ট্রীক্ট জজের পদ প্রাপ্ত হয়েন। তিনি যশোহর জিলার জজীয়তী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করার পর সর্ব্বদাই তিনি অধ্যয়নকার্য্যে রত থাকিতেন। ইংরাজী ভাষায় এবং সাহিত্যে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং পরে স্বীয় অধ্যবসায়-বলে সংস্কৃত ভাষায় এবং সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান উপার্জ্জন করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং সর্ব্বদাই পুস্তক ও পণ্ডিত-সন্মুখে তিনি কালযাপন করিতেন। ইদানীং তিনি ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়-পরিচালিত "এডুকেশন গেজেট" সম্পাদন করিতেন এবং কুমারী তরু দত্তের জীবনী, কৃতজ্ঞতা, কুমারী দ' আর ভরসের দৈনিক আলেখ্য ইত্যাদি কতকগুলি অতি উচ্চদরের প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। জ্ঞান-উপার্জ্জনই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল এবং বিবিধ গ্রন্থরাজি হইতে সর্ব্বদাই জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার মহৎ ও উচ্চহৃদয় তাঁহাকে অন্ধ স্কুল, অনাথ আশ্রম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিতে

প্রবৃত্ত করিয়াছিল। গোপনে অনেক দরিদ্র ছাত্রকে তিনি সাহায্যদান করিতেন।

গত ১৩৩৪ সালে ১০ই বৃহস্পতিবার, বেলা ১ ঘটিকার সময় রায় পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর পরলোক গমন করেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে দেশে একজন ঋষিচরিত্র আদর্শ পুরুষের অভাব হইল।

শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর নায়ক

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নন্দীরাজপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর নায়ক মহাশয় বাৎস্য গোত্রের শুদ্ধ শ্রোত্রিয়। এই নন্দীর নায়ক-বংশের পরিচয় জন্য ঘটকদের পুঁথি-অনুসন্ধানে যতদূর জানা যায় তাহাতে বাৎস্য গোত্রের ছান্দড়ের পুত্র কবি শিমলাল-বংশীয় মধুসূদন হাজরার বংশধরেরা অধিকাংশই প্রথমে কুলাকাশ অঞ্চলে (হুগলি) বসবাস করিতেন, এইরূপ অনুমান হয়। এই বংশের ৬শ পর্য্যায়ের কমল ঐ দেশ হইতে স্থানান্তরে যান এবং তাঁহার প্রপৌত্র বিনায়ক সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্য করিয়া "নায়ক" উপাধি লাভ করেন ও পশ্চিম রাঢ়ে বসবাস করেন। সেই অবধি তাঁহার বংশধরেরা "নায়ক" উপাধি দ্বারা নিজদের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। বিনায়কের পুত্র ঘনরাম বা ঘনশ্যাম এই রাজপুর গ্রামে থাকিয়া সাঁওতাল পরগণা ও তৎপরবর্ত্তী অঞ্চলে লবণ লইয়া যাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে রবি শস্য, কার্পাস ও বস্ত্রাদি আনিয়া ব্যবসা করিতেন। সেই লবণের ব্যবসার জন্য এই রাজপুরগ্রামকে তখন লোকে "নুন ডি" বলিত। সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে "ডি" শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র পল্লী বুঝায়। এই প্রকারে "নুন ডি" হইতে নণ্ডী, পরে নন্দী নাম হয় এবং পূর্ব্বে রাজপুর নাম ছিল বলিয়া এখনও লোকে ইহার নাম "নন্দী রাজপুর" গ্রাম বলিয়া থাকে।

বহু পুরাকালে এখানে এক রাজার বাস ছিল; সেইজন্য ইহার নাম রাজপুর ছিল। এখনও এই গ্রামের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল খনন করিলে স্থানে স্থানে খোদিত প্রস্তরাদি পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে যে, এই স্থানে রাজার গড় ছিল। এক্ষণে তাহার নানারূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

বর্ত্তমানে যে স্থানে লোকালয় আছে তাহা পূর্ব্বে জঙ্গল ছিল এবং ব্যাঘ্র, চণ্ডী প্রভৃতি গ্রাম্যদেবতার স্থানসকল ঐ জঙ্গলেই ছিল অনুমান হয়।

এই নায়ক-বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্যবসায়াদি দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে এই গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসকলে বহু নিষ্কর সম্পত্তি করেন। পরে লাট বাজপুর বর্দ্ধমান রাজসরকার হইতে পত্তনি লয়েন।

ইঁহাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ দামোদরচন্দ্র জীউ প্রভৃতি ঠাকুরের নিত্য সেবা এবং অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রথ, ঝুলন, রাস, দোল প্রভৃতি হিন্দুর সমস্ত পর্ব্ব ও নবম্যাদি কল্পারম্ভ-যুক্ত দুর্গোৎসব বর্ষে বর্ষে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে ও প্রতি পর্ব্বেই বহু ব্রাহ্মণ ভোজন ও শ্রীশ্রী৺ দামোদরচন্দ্র জীউএর নিত্য সেবায় নিত্য নৈমিত্তিক নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ছাড়া অতিথি, অভ্যাগত প্রভৃতি বহুলোক দৈনিক প্রসাদ পাইয়া থাকেন। এই সমস্ত কার্য্য পরিচালন জন্য যদিও বহু পূর্ব্ব হইতে কালেক্টরী-ভুক্ত তৌজী ও লাখেরাজ আদি বহু দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল কিন্তু তাহাতে ব্যয় সঙ্কুলান হইত না বলিয়া ৺হরিপ্রসাদ নায়কের পুত্র ৺দোলগোবিন্দ নায়ক মহাশয় তাঁহার ভ্রাতাদিগের সহিত আরও বহু সম্পত্তি দিয়া রকম।৶০ ছয় আনার দেবোত্তর এষ্টেট বলিয়া এক পৃথক এষ্টেট করিয়া দিয়া গিয়াছেন এবং তাহা হইতেই এখন সেবা-পূজা চলিয়া আসিতেছে।

নন্দীর নায়ক-বংশের ছান্দড় হইতে বর্ত্তমান বংশধরগণের নাম ও পরিচয় আদি অভ্রান্ত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর নায়ক মহাশয় নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি বহু স্থানের ঘটকদের পুঁথি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করেন। এইজন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়াছেন এবং এইসকল সংগ্রহের জন্য শান্তিপুর নিবাসী "সম্বন্ধ-নির্ণয়"-প্রণেতা ৺লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁহাকে বহু সাহায্য করিয়াছিলেন।

ইঁহাদের কন্যা-সম্প্রদান সমস্তই পুরুষানুক্রমে কুলীনে হইয়া আসিতেছে এবং পূর্ব্বে বহু দূরদেশ হইতে পাত্র আনিয়া কন্যাদান করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি দিয়া তাঁহাদিগকে বসবাস করাইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে সেইসকল স্থানকে "বেটীপাড়া" বলে। ইঁহারা প্রায় সমস্ত মেলের কুলীনে কন্যা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর নায়ক মহাশয়ের তিন পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রমোদকুমার নায়ক কলিকাতায় আই-এস-সি পড়িতেছেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত নবগোপাল চট্টরাজ এম-এ, বি-এল ধানবাদে ওকালতি করেন এবং মধ্যম জামাতা শ্রীযুক্ত সরোজকুমার মুখোপাধ্যায় ই-আই রেলওয়ের জনৈক ডাক্তার। উভয় জামাতাই "স্বভাব কুলীন"। শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর নায়ক মহাশয়ের চান্দড় হইতে বর্ত্তমান বংশ পর্য্যন্ত একটী পৃথক কুড়চীনামা পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল :—

নন্দীর নায়ক-বংশের কুড়চিনামা

ছান্দড় (১) বাৎসা গোত্র

|

কবি শিমলাল (২)

|

ভয়াবহ (৩)

কিরণ (৪)

গৌতম (৫)

|

বর্ণবালক (৬)

গঙ্গাধর (৭)

ভগীরথ (৮)

|

রাম (৯)

|

রুদ্র (১০)

|

বিষ্ণু (১১)

|

শ্রীমান (১২)

|

মধুসূদন হাজরা (১৩)

যদুনন্দন (১৪)

|

নিঃশঙ্ক (১৫)

|

কমল (১৬)

|

গৌতম (১৭)

সুরেশ্বর (১৮)

|

ঘনরাম বা ঘনশ্যাম (২০)

গরুড়ধ্বজ (২১)

দিনমণি (২২) চিন্তামণি (২২)

রাম (২৩) পরীক্ষিৎ (২৩

শুকলাল (২৪) রমাকান্ত (২৪)

| |

যজ্ঞেশ্বর হরিপ্রসাদ (২৫)

| |

কালীপ্রসন্ন দোলগোবিন্দ (২৬)

| |

সুধাকৃষ্ণ (২৭) |

|

বিমলশঙ্কর গৌরীশঙ্কর দুর্গাশঙ্কর ২৮

|

(২৮) প্রমোদকুমার প্রভাতকুমার প্রশান্তকুমার

সুধাকৃষ্ণ (২৭)

|

অমৃত সত্য সাক্ষী পাঁচুগোপাল (২৮)

ডাঃ বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, এল্‌-এম্‌-এস্‌

ডাঃ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, এল-এম-এস

শ্রীরামপুর

শ্রীরামপুরের স্বনামধন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য এল-এম-এস মহাশয় যশোহর জেলার সেখহাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সামান্য জমিদারি ও যজমান শিষ্যের আয়ে সংসার চলিয়া যাইত। কখনও কাহারও নিকট ঋণী বা কোন রকমের অধীন ছিলেন না। নিজের মনের জোরে সর্ব্বদাই পূজা-আহ্নিকে দিন কাটাইতেন। তৃতীয় প্রহরের পূর্ব্বে তাঁহার পূজা সন্ধ্যা কখন সমাপন হইত না। গ্রামের ইতর ভদ্র সমস্ত লোকে তাঁহার পদধূলি পাইলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত এবং তাঁহার মুখ হইতে সৎকথা শুনিবার জন্য নানা দেশ হইতে সর্ব্বদা বাটীতে লোকের সমাগম হইত। অতিথি-সেবার জন্য তাঁহার পৃথক বন্দোবস্ত ছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে অতিথি আসিলেও তিনি সাদরে তাঁহাদিগের সৎকার করিতেন।

হরিনারায়ণের চারি পুত্র ও তিন কন্যা। তাঁহাদের নাম কাশীনাথ সীতানাথ, বসন্তকুমার, হেমন্তকুমার এবং কাশীশ্বরী শরৎকুমারী ও কুসুমকুমারী।

কাশীনাথ জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি অন্যের বিনা সাহায্যে পদব্রজে হুগলিতে আসিয়া এক সদাশয় ব্রাহ্মণ-বাটীতে থাকিয়া নর্ম্যাল ত্রৈবার্ষিক পাশ দিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্যে শ্রীরামপুর-বাঙ্গালা স্কুলে হেড পণ্ডিতের পদ লাভ করেন।

শ্রীরামপুরের স্কুলে শিক্ষকতা করিতে করিতে তাঁহার বিদ্যাবত্তা, জ্ঞান ও যশোরাশি প্রচারিত হইতে লাগিল। পাঠনা-বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্বের বিষয় হুগলি জেলায় পরিব্যাপ্ত হইল। তাঁহার স্কুল প্রতিবর্ষে পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করিতে লাগিল। ভাড়া-বাটীতে স্কুল ছিল। তিনি নিজে ইতর-ভদ্র জমিদারগণের নিকট যাইয়া ভিক্ষা করিয়া ২০ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন এবং সেই টাকায় স্কুলের নিজস্ব গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অসামান্য সর্ব্বজনপ্রীতি আকর্ষণগুণে বসন্তকুমার শ্রীরামপুরে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

বসন্তকুমার শৈশবে অর্থহীনতার জন্য ১২ বৎসর পর্য্যন্ত পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। তার পর অতিকষ্টে কায়ক্লেশে শ্রীরামপুর ইউনিয়ন হইতে ১৮৯০ সালে এনট্রান্স পাশ করেন। কাশীনাথের সাহায্যে নড়াইল হইতে ১৮৯২ সালে এফ-এ পাশ করেন। কাশীনাথ তৎপরে বসন্তকুমারকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি করান।

এইখান হইতে বসন্তকুমারের যশোরাশি বিস্তার হইতে আরম্ভ করিল। তিনি কৃতিত্বের সহিত ১৮৯৭ সালে এল-এম-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল কলেজর প্রিনসিপাল বমফোর্ড সাহেবের ইচ্ছায় শ্রীরামপুরে চিকিৎসা আরম্ভ করেন।

বসন্তকুমার বমফোর্ড সাহেবের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত প্রশংসাপত্র লইয়া শ্রীরামপুরে প্রাকটীস করিতে আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার চিকিৎসার যশোরাশি শ্রীরামপুর মহকুমায় বিস্তৃত হইতে থাকে।

অকাতরে দরিদ্রকে ঔষধদান, গরিবকে অর্থদান, রোগীকে সাগু, বার্লি, মিছরি দান বসন্তকুমারের নিত্যকার্য্য।

শতাধিক রোগী বাটীতে প্রত্যহ উপস্থিত হইতে লাগিল। চিকিৎসা-নৈপুণ্যে ও হাত যশে ইঁহার খাওয়া-নাওয়ার সময় রহিল না।

ইউরোপীয় মহলেও ইঁহার প্রাকটীস হইতে লাগিল।

দশের কার্য্য করিতে যাইলে দেশসেবার কার্য্যে যোগ না দিয়া থাকা যায় না। বসন্তকুমারকে শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনর হইতে হইল। ইনি সর্ব্বোপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছিলেন।

বসন্তকুমারকে অবৈতনিক সমস্ত সাধারণ-কার্য্যে যোগ দিতে হইয়াছে। তিনি স্কুল, লাইব্রেরি, হাসপাতাল প্রভৃতি সমস্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে অবৈতনিক কার্য্য করিতেছেন।

ইনি নিজে কমিশনর হইয়াছেন এবং অন্য আর একজনকে পর্য্যন্ত কমিশনার করিয়া দিয়াছেন। নিজে একবার দুই ওয়ার্ডে কমিশনার হইয়াছেন। মিউনিসিপালিটীর কার্য্যে যোগদান করিয়া কর্ম্মকুশলতার জন্য সকল কমিশনারের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন।

সামান্য ব্যক্তি হইয়া এতদূর যশ, মান ও সাধারণের ভালবাসা কম লোকের ভাগ্যে হয়।

বসন্তবাবুর আধুনিক চিকিৎসা-নৈপুণ্যের কথা একটু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আজকাল অনেক ডাক্তার চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ চিকিৎসক হইয়াছেন; অনেকে দয়াদাক্ষিণ্য দেখাইয়া চিকিৎসা করিতেছেন। বসন্তবাবুর প্রতি ভগবানের অনুগ্রহই বলুন বা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিই বলুন বসন্তবাবু আজকাল শ্রীরামপুরে ধাত্রীবিদ্যায় অদ্বিতীয়। তিনি দেশীয় অশিক্ষিত ধাইগণকে মিউনিসিপাল আফিসে ডাকাইয়া আনিয়া প্রতি বৎসর নিয়মমত শিক্ষা দিয়া ধাত্রীবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়াছেন। অনেকগুলি ধাই ইঁহার নিকট হইতে শিখিয়া উদরান্ন করিয়া খাইতেছে। কেহ

কেহ ইডেনে গিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া নিজের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে ও করিতেছে। ইনি প্রতি বৎসর নিজ ব্যয়ে সর্ব্বোচ্চ ছাত্রীকে মেডল দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীরামপুরে থাকেন বলিয়া দেশের কথা বসন্তবাবু ভুলিয়া যান নাই। দেশে স্কুল, পোষ্ট আফিস, রাস্তা ঘাট, জলাশয় করিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বদাই দেশের লোক আসিতেছে। তাহাদের আহারের ও থাকিবার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

বর্ত্তমানে বসন্তকুমারের ৩৫ বৎসর প্রাকটীস হইল। এই প্রাকটীসের কালে তিনি দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে কৃতী করিয়া দিয়াছেন। দুর্গাপ্রসন্ন এখন লক্ষপতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার কনিষ্ঠ তারাপ্রসন্ন এম-বিকে বাটীতে থাকিয়া চিকিৎসা করিতে অনুমতি দিয়াছেন। অল্প দিনের মধ্যে তারাপ্রসন্নের যশোরাশি প্রচারিত হইয়াছে। বসন্তকুমার তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে চাকরিতে না দিয়া দুর্গাপ্রসন্নের সহিত স্বাধীন ব্যবসায় করিতে দিয়াছেন।

সেখহাটী ডিংসাই বংশের জন্মতালিকা

- রামচন্দ্র—তর্কসিদ্ধান্ত
  - রামশঙ্কর তর্কভূষণ।
    - ষষ্ঠীদাস ন্যায়রত্ন
      - সৃষ্টিধর ভট্ট
        - বেণীমাধব
    - রামভদ্র তর্কবাগীশ
      - হারানন্দ তর্কবাগীশ
      - নীলমণি ভট্ট
        - অম্বিকাচরণ
          - কেশব
        - গুরুচরণ
      - রামকমল শিরোমণি
    - রামনারায়ণ বিদ্যাবাগীশ
  - রামনাথ ন্যায়লঙ্কার
    - রামকুমার তর্কভূষণ
    - গোপীকান্ত চূড়ামণি
    - শ্রীকান্ত ন্যায়লঙ্কার
      - নীলকমল ভট্ট
        - কালাচাঁদ ভট্ট

- গঙ্গাধর ন্যায়লঙ্কার
  - নন্দদুলাল তর্করত্ন
    - কমলাকান্ত
      - জগৎ চন্দ্র
        - কৈলাসচন্দ্র
        - কেদারনাথ
          - শশীভূষণ
        - রসিকচন্দ্র
    - রমাকান্ত
      - হারাণ ভট্ট
        - বিষ্ণুচরণ
  - রাধাকান্ত ন্যায়বাচস্পতি
    - শম্ভুনাথ
      - হরিনারায়ণ
        - কালীনাথ
          - দুর্গাপ্রসন্ন
          - তারাপ্রসন্ন
        - সীতানাথ
          - মণিমোহন
        - বসন্ত
          - কৃষ্ণচন্দ্র
            - ললিত মোহন
        - হেমন্ত
          - নন্দ
    - জগমোহন
      - মাধবচন্দ্র
        - জ্ঞানচন্দ্র
          - সুধীরচন্দ্র
            - মুকুন্দ
            - গোবিন্দ
            - অরবিন্দ
  - রামপ্রসাদ ন্যায়রত্ন
    - মহিমাচরণ
      - জগবন্ধু
      - তারাচরণ

শ্রীযুক্ত লালগোপাল পাল

শ্রীযুক্ত লালগোপাল পালের পূর্ব্বপুরুষের নাম স্বর্গীয় গোপীনাথ পাল। ইনি রাণাঘাটে বাস করেন। ইনি জাতিতে কুম্ভকার। ইনি জাতীয় ব্যবসা করিতেন। ইঁহার পুত্রের নাম স্বরূপচন্দ্র পাল ও পৌত্রের নাম সাগরচন্দ্র পাল; ইঁহারা উভয়েই জাতীয় ব্যবসা করিতেন। লালগোপালবাবুর বয়স এখন প্রায় ৮০ বৎসর। ইনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে প্রখর বুদ্ধি ও অধ্যবসায় দ্বারা জীবনে উন্নতির চরম সোপানে উপনীত হইয়াছেন। ইঁহার জীবনী পাঠ করিলে সত্যই একটা আদর্শ চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয়। ইঁহার জীবনী সকলেরই অনুকরণীয়। অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় থাকিলে মানুষ যে একসময়ে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে, ইঁহার জীবনই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ইনি পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়া মাসিক এক আনা বেতন দিয়া তালপাতায় লিখিতে আরম্ভ করেন, দ্বিতীয় বৎসরে দুই আনা মাহিনা দিয়া কলাপাতায় লিখিতে থাকেন এবং তৃতীয় বৎসরে মাসিক চারি আনা বেতন দিয়া কাগজে লিখিতে থাকেন। এই পর্য্যন্তই তাঁহার বিদ্যা। ১৩।১৪ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে তিনি রাণাঘাটে সহারাম বিশ্বাসের দোকানে ১৷৷০ টাকা মাসিক মাহিনায় চাকুরী করেন; পরে গোপালচন্দ্র প্রামাণিকের দোকানে মাসিক ৩৲ টাকায় চাকুরী আরম্ভ করিয়া ৮ বৎসর কাল তথায় চাকুরী করেন। ৮ বৎসরে তাঁহার মাহিনা ১২৲টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এই ৮ বৎসর চাকুরী করিয়া তিনি একশত টাকা জমাইয়াছিলেন। তার পর লালগোপালবাবু স্বতন্ত্র দোকান করিবার প্রস্তাব করায় গোপালবাবু তাহাতে রাজি হন

না। অগত্যা লালগোপালবাবু চাকুরী ছাড়িয়া ঐ সামান্য পুঁজি লইয়া একটি কাপড়ের দোকান খুলিলেন। দোকানে লাভ হইতে দেখিয়া তিনি দোকান বড় করিবার ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু গোপাল-বাবু নিষেধ করিলেন। লালগোপালবাবু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া দোকান ও কারবার বড় করিলেন। প্রথমে তাঁহার খড়ের ঘর ছিল। অতঃপর ২।৩টি পাকা কুঠুরী করিয়া ক্রমে তাহা বাড়াইলেন। কাপড়ের সঙ্গে মুদীখানার বিভাগ খুলিয়া তাহাতে চাল, ডাল, ঘি, নুন, কয়লা, চূণ, শালকাঠ প্রভৃতি বিক্রয় করিতে থাকেন। অতঃপর নাগ-পুরে গিয়া লালগোপালবাবু শালকাঠের ব্যবসা আরম্ভ করেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই চৈত্র বাজার পুড়িয়া যায়। বাজার ভস্মীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দোকানঘরও পুড়িয়া যায়। তিনি গিরীশ দাসের দোকান হইতে পুনরায় কাপড় লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি জমিদারীর মালিক হন এবং মহাজনী কারবার আরম্ভ করেন। এখন বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ৪০।৫০ বৎসর যাবৎ দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, অন্নপূর্ণা পূজা, দোল প্রভৃতি করিয়া আসিতেছেন। দুই বৎসর হইল, "সাগরেশ্বর" শিব নামে একটি শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রাণাঘাটে তিনি প্রথমে একটি এম্-ই স্কুল স্থাপন করেন, এখন উহাকে এইচ-ই স্কুলে পরিণত করিয়াছেন।

তাঁহার দুই পুত্র—খগেন্দ্রনাথ ও কৈবল্যনাথ। উভয় ভ্রাতাই পিতার কারবার দেখিতেছেন। কৈবল্যবাবু লালগোপাল এইচ-ই স্কুলের সম্পাদক; ইনি গ্রাজুয়েট। খগেনবাবুর পুত্রের নাম অজিত-কুমার ও কৈবল্যবাবুর পুত্রের নাম সলিলকুমার। লালগোপালবাবুর তিন কন্যা; জ্যেষ্ঠ জামাতার নাম শ্রীযুক্ত হরিচরণ পাল, মধ্যমের নাম শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার পাল, এম্-এ, বি-এল এবং কনিষ্ঠ জামাতার নাম শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পাল।

জয়রামপুরের মৌলিক-বংশ

জয়রামপুর নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটী সুবিখ্যাত প্রাচীন পল্লীগ্রাম; সাধারণতঃ ইহা "বড়গাঁ" নামে পরিচিত।

জয়রামপুরের মৌলিকেরা আদি শুদ্ধ গাঁই; এই কুলগৌরব তাঁহারা অদ্যাপি অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। এই বংশে স্বভাব-কুলীন ব্যতিরেকে কন্যা-সম্প্রদান কদাপি হয় নাই।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত চাঁদ প্রতাপ পরগণার অধীন রোয়াল নামক গ্রাম মৌলিকদিগের আদি বাসস্থান। অনুমান খৃষ্টীয় ১৭০০ অব্দে রমাবল্লভ রায় জয়রামপুর গ্রামে আগমন করেন এবং নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া "মৌলিক" উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি এইস্থানে মৌলিকগণ বাস করিতে থাকেন এবং রাজদত্ত মৌলিক উপাধিতে অভিহিত হন।

মৌলিক বংশের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম :—

সঞ্জয় হাজারী রায়—ইনি মোগল সম্রাটদিগের একজন সেনাপতি ছিলেন।

রাজা ভবানী রায়—সম্রাট জাহাঙ্গীর ইঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন।

রাজা রামনারায়ণ।

রমাবল্লভ রায়
(জয়রামপুরে আগমন করিয়া রাজ-
দত্ত মৌলিক উপাধি গ্রহণ করেন)
|
রামনারায়ণ   রামেশ্বর
|
রামকৃষ্ণ
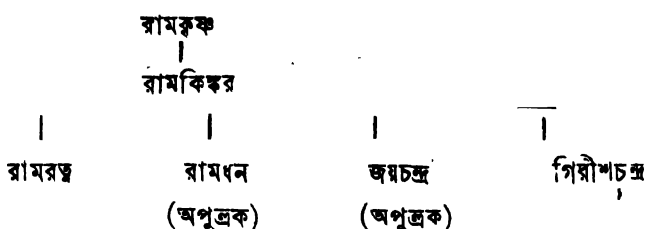
নীলকরের অত্যাচারের সময় প্রজাপক্ষ সমর্থন করায় রামরত্ন ও গিরীশচন্দ্রকে অনেক লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের ঐ সময়ের কার্য্যকলাপের বিশদ বিবরণ Indigo Commission Report এবং Papers relating to Indigo Cultivation in Bengal Part I ও IIতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রামরত্ন মৌলিকের চারি পুত্র:—৺কান্তিচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র, ৺দেবেন্দ্রচন্দ্র ও ৺মহেন্দ্রচন্দ্র।

৺কান্তিচন্দ্র

ইনি প্রথমে শিক্ষা বিভাগও পরে পুলিশ বিভাগে উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি বাগ্মী, সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন এবং তৎকালে Indian Mirror ও Bengalee কাগজ তৎরচিত বহুবিষয়ক সুচিন্তিত প্রবন্ধাদিতে পূর্ণ থাকিত। তাঁহার চারি পুত্র:— রবীন্দ্রচন্দ্র, সমরেন্দ্র, রামেন্দ্র ও বলীন্দ্রনাথ।

জ্যেষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রচন্দ্র—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত; তিনি বহু পাশ্চাত্যভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন। কলিকাতার এক সুপ্রসিদ্ধ কলেজে ভাষাতত্ত্বের এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষার অধ্যাপক। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে তাঁহার মত সুপণ্ডিত বাঙ্গালাদেশে খুব কমই দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় পুত্র সমরেন্দ্র—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত ইন্‌ষ্টিটিউটে

প্রাণিতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। অধুনা London Musuem-এ গবেষণাকার্য্যে ব্রতী আছেন। তাঁহার প্রণীত Fauna in British India সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিতত্ত্বের পাঠ্যপুস্তক বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ইনি স্বর্গীয় বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের **ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যাকে** বিবাহ করিয়াছেন।

তৃতীয় পুত্র—রামেন্দ্র বিলাত-প্রত্যাগত এবং উচ্চশিক্ষিত; অধুনা কলিকাতা কর্পোরেশনের Printing Superintendent। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ৺দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুরের পুত্র ৺অরুণেশ-নাথের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী সাগরিকা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন।

কনিষ্ঠ পুত্র—বলীন্দ্রনাথ মৌলিক, B.Sc., B.L।

যোগেন্দ্রচন্দ্র

যোগেন্দ্রচন্দ্র অবসরপ্রাপ্ত সবজজ; তাঁহার কার্য্যকালে ১৮৭৫ এবং ১৮৮৫ সালে তিনি **খাজনা আইন** প্রণয়ন করেন। তৎকালে তাঁহার পুস্তক যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৯০৫ সালে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অধুনা ৮৬ বৎসর বয়স হইলেও নিজ গ্রামের উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট। গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয় তাঁহারই জনহিতকর কর্ম্মপ্রচেষ্টার সাক্ষ্যদান করিতেছে। তাঁহার দুই পুত্র:—সুধীন্দ্রচন্দ্র ও শৈলেন্দ্রচন্দ্র।

সুধীন্দ্রচন্দ্র—কৃষ্ণনগরে ওকালতী করিতেছেন। তিনি বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যান্। তথাকার সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার কল্যাণ-হস্তের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

শৈলেন্দ্রচন্দ্র—নিজ গ্রাম জয়রামপুরে থাকিয়া দেশের কার্য্য করিতেছেন। বর্ত্তমানে তিনি চুয়াডাঙ্গা লোকাল বোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান্।

৺দেবেন্দ্রচন্দ্র

ইনি দেশভক্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। গ্রামে বিদ্যালয়-স্থাপন তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমর ফল। তাঁহার চারি পুত্রঃ —

(১) জিতেন্দ্রচন্দ্র—কলিকাতা কর্পোরেশনে Ward Supervisor.

(২) মুনীন্দ্রচন্দ্র—সরকারী কার্য্য করিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

(৩) হেমেন্দ্রচন্দ্র—চা-বাগানের ম্যানেজারী করিতেছেন।

(৪) সরোজেন্দ্র—ডাক্তার।

বর্ত্তমানে ইঁহারা সকলেই কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

৺মহেন্দ্রচন্দ্র

ইনি পণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। বহু পরিশ্রমে স্বীকার করিয়া তিনি কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথি হইতে জয়রামপুর মৌলিক-বংশের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া "কুলদীপিকা" নামে এক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার এক পুত্র—নাম আলোকেন্দ্র।

জয়রামপুরের মৌলিকদিগের অনেক দৌহিত্রসন্তান জয়রামপুরেই বাস করেন; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুখোপাধ্যায়-বংশীয়গণ। মুখোপাধ্যায়-বংশের ৺বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; তাঁহার ভ্রাতা ৺মহেন্দ্রচন্দ্র স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ৺দেবেন্দ্রচন্দ্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি কিছুদিন "বেঙ্গলী" কাগজের সহঃ-সম্পাদক ছিলেন।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা পুলিশ কোর্টে ওকালতী করিতেছেন।

শ্রীরাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বহুদিন দেওঘর স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন।

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়—উচ্চশিক্ষিত সংসাহিত্যিক। তাঁহার প্রণীত গৃহচিত্র, বিদায়. ভবেশ ইত্যাদি বাঙ্গালা পুস্তক যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছে। তিনি বিহার গভর্ণমেণ্টর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতেছেন। ইনি যোগেন্দ্রচন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা।

এতদ্ব্যতীত জয়রামপুরে আরও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ পুলিশ কর্ম্মচারী সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ ও "দারোগার দপ্তর"-সম্পাদক ৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার পুত্রেরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ছাত্র, বর্ত্তমানে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের Accounts Departmentএর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। কনিষ্ঠ অপূর্ব্ব (A. C. Mukerjea) কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার। জয়রামপুরবাসিগণের মধ্যে রায় সাহেব অক্ষয়কুমার চৌধুরীর নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য; তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে সামান্য কার্য্য হইতে E. I. R.এর একজন Assistant Engineer হইয়াছিলেন।

অধুনা জয়রামপুরের দুইটী ব্রাহ্মণ-বংশ—ঘোষাল ও সরকার-বংশ প্রায় লোপ পাইয়াছে। তবে ঘোষাল-বংশের ৺জয়চন্দ্র ঘোষালের পুত্র ৺জানকীনাথ ঘোষাল কলিকাতা-নিবাসী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুহিতা স্বনামধন্যা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার এক পুত্র জ্যোৎস্নানাথ I. C. S. এবং দুই কন্যা শ্রীমতী সরলাবালা দেবী চৌধুরাণী ও স্বর্গীয়া হিরণ্ময়ী দেবী দেশবাসীর নিকট সুপরিচিতা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা মজুমদার, বি-এল্,

কৃষ্ণনগর—নদীয়া

ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণী শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। ভরদ্বাজগোত্র, যজুর্ব্বেদ, ভাদোড়গাঁই, জীয়ার বংশ, সুবুদ্ধি ধারা। চতুরঙ্গ খাঁ ভাদোড়ের সন্তান। ইঁহাদের আদিনিবাস বহুকাল পূর্ব্বে পদ্মানদীর উত্তরপার্শ্বস্থিত সাতবাড়িয়া গ্রামে ছিল। মুসলমান রাজত্বকালের পূর্ব্বে হিন্দু-রাজত্ব-সময়ে গৌড় রাজধানীতে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী চতুরঙ্গ খাঁ ভাদোড় ছিলেন। রাজা বল্লাল সেন কর্ত্তৃক কৌলীন্যপ্রথা-সৃষ্টিকালে এই বংশীয়গণকে কুলীনগণের সম্মানবর্দ্ধনজন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিয়া কুলীনের সমকক্ষ মর্য্যাদা দিয়াছিলেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মজুমদারের জন্ম ১৮৭৭ সালে ১৭ই জানুয়ারী, বাঙ্গালা ·৮৪ সালে ২১শে অগ্রহায়ণ তারিখে জেলা নদীয়ার অন্তর্গত দৌলতপুর থানার অধীন ঝাউদিয়া বিষ্ণুপুর গ্রামে হইয়াছিল। পিতার নাম ৺গৌরীচরণ দেবশর্ম্মা। তিনি ১২৯১ সালে ২৩শে পৌষ তারিখে রাজসাহী টাউনে পরলোক গমন করেন। গৌরীচরণ মজুমদারের পিতার নাম ৺জগৎচন্দ্র; জগৎচন্দ্রের পিতার নাম লক্ষ্মণচন্দ্র, তাঁহার পিতার নাম মনোহর; মনোহরের পিতা যাদবেন্দ্র; যাদবেন্দ্রর পিতার নাম নারায়ণচন্দ্র মজুমদার ছিল।

নগেন্দ্রনাথ মজুমদারের স্ত্রীর নাম শ্রীমতী কাশীশ্বরী দেবী; তাঁহাদিগের এক পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রটীর নাম শ্রীমান্ ধর্ম্মদাস মজুমদার। ধর্ম্মদাসের একটী পুত্রসন্তান হইয়াছে; তাহার নাম শ্রীমান্ দেবদাস মজুমদার, তাহাকে মাণিকলাল বলিয়া ডাকা হইয়া থাকে।

ধর্ম্মদাসের স্ত্রীর নাম শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবী। ধর্ম্মদাস বি-এল্ পাশ করিয়া উকিল হইয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম শ্রীমতী সরলা-বালা দেবী ; কুমারখালি থানার অন্তর্গত খোরসিংপুর-নিবাসী মৃত শশধর সান্যালের পুত্র শ্রীমান কালীব্রহ্ম সান্যাল ভিষগ্‌রত্ন কবিরাজের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। তাঁহাদিগের একটী পুত্র ও তিনটী কন্যা। পুত্রের নাম শ্রীজগদীশচন্দ্র সান্যাল ; প্রথমা কন্যার নাম শ্রীমতী উষারাণী দেবী ; দ্বিতীয়টীর নাম কল্যাণী।

নগেন্দ্রবাবুর দ্বিতীয়া কন্যার নাম. শ্রীমতী সরোজপ্রভা দেবী ; জামাতার নাম শ্রীযুক্ত রমাপ্রসন্ন সান্যাল, এম্-এ, বি-এল, এডভোকেট ; ইনি কৃষ্ণনগর সহরে ওকালতী করেন। ইঁহাদিগের দুইটী পুত্র ও চারিটী কন্যা ; পুত্রদ্বয়ের নাম শ্রীমান কুলপ্রসন্ন ও শ্রীমান্ মণ্টু, কন্যা চারিটীর নাম—জ্যেষ্ঠানুক্রমে শ্রীমতী শান্তিশীলা, শ্রীমতী প্রীতিরাণী, তৃপ্তিরাণী ও দীপ্তিরাণী দেবী।

নগেন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠা কন্যার নাম শ্রীমতী অপর্ণাদেবী। জামাতার নাম শ্রীমান্ সুধীরচন্দ্র সান্যাল। ইনি ফরিদপুর দেওয়ানী আদালতে চাকুরী করেন। তাঁহাদের বর্ত্তমান সময় অবধি দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র হইয়াছে। পুত্রের নাম শ্রীমান্ শণ্টু, কন্যাদের নাম শ্রীমতী মিনু ও পিনু।

———

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত বিদ্যাবিনোদ,

এম. আর. এ. এস

উকিল, খুলনা

আদিশূরের যজ্ঞে দত্ত-বংশের আদিপুরুষ ৺ পুরুষোত্তম দত্ত নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাঁহার বংশীয় কয়েক জন হাওড়া জেলার নিকটবর্ত্তী বালিগ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করেন। পরে নানাকারণে তাঁহাদের কয়েক জন বংশধর মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত চউড়া গ্রামে বাস করিতে গমন করেন। তথায় তাঁহারা নবাব-সরকারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। পরে তথা হইতে ৺মুক্তরাম দত্ত খুলনা জেলার অন্তর্গত একস্থানে মুক্তেশ্বরী গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন এবং আর কয়েক জন নড়াইলে বাস করিতে যান। মুক্তেশ্বরী গ্রাম হইতে ৺নিধিরাম দত্ত সংলগ্ন গ্রাম দামোদরে গিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ রামসুন্দর ও কনিষ্ঠ স্বরূপচন্দ্র উভয়েই কৃতাবদ্য হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ যশোহর জেলায় মোক্তারী করিতেন; কনিষ্ঠ স্বরূপচন্দ্র সিদ্ধবায় যে মুন্সেফী ছিল তাহাতে ওকালতী করিতেন। রামসুন্দরের একমাত্র কন্যাকে ভোলানাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। সে কন্যার কোন সন্তান-সন্ততি নাই। স্বরূপচন্দ্রের এক পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন। পুত্রের নাম হরিমোহন। হরিমোহনের জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী ভাটপাড়ায় বসুদের ঘরে বিবাহ দেওয়া হয়; তাঁহার দুই পৌত্র আছে। মধ্যমা দিগম্বরী দেবীকে খুলনা জেলার দেয়ারা গ্রামবাসী হরচন্দ্র মিত্র মহাশয় বিবাহ করেন; উক্ত হরচন্দ্র খুলনায় ওকালতী করিতেন। কনিষ্ঠা কন্যাকে খুলনা জেলার অন্তঃপাতী রাজপাট

গ্রামবাসী দীননাথ বসু মহাশয় বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র তারকনাথ বসু পরলোক গমন করিয়াছেন। তারকনাথের একমাত্র পুত্র আছে। রামসুন্দর ও স্বরূপচন্দ্র হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হয়েন। তখন হরিমোহন নাবালক; পিতা বর্ত্তমানেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। সংসারে তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবার কোন অভিভাবক না থাকায় তাঁহার মধ্যমা ভগিনী তাহাকে স্বগৃহে আনিয়া (১৮৫৬—৫৭ খৃঃ) প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন। এই কারণে তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসন পরিত্যক্ত হইল। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি আজগড়া-গ্রামবাসী গোরাচাঁদ বসু মহাশয়ের কন্যা দুর্গা দেবীর পাণিপীড়ন করেন। গোরাচাঁদের এক পুত্র গোপালচন্দ্র বসু অবিবাহিত অবস্থায় কাল-কবলিত হইয়াছিলেন।

এই গোরাচাঁদের কন্যা দুর্গা দেবীর গর্ভে হরিমোহনের ঔরসে দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা বালবিধবা; অপর কন্যা বাল্যকালেই পরলোকে গমন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রও বয়স্ক হইয়া দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শোকে আকুল হইয়া পিতা হরিমোহন অকালে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার পত্নী নাবালক পুত্র-কন্যা লইয়া বিধবা হয়েন। হরিমোহন ধর্ম্মপরায়ণ ও হরিভক্ত ছিলেন। সাংসারিক কার্য্য অনাসক্ত হইয়া করিতেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। সংকীর্ত্তনে সর্ব্বদাই নিজের রচিত সঙ্গীত গান করিতেন, বিষয়-সম্পত্তির দিকে লক্ষ্য ছিল না। তিনি পরোপকারী ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন।

তাঁহার নাবালক পুত্রের নাম সুরেশচন্দ্র। তিনি মাতৃস্নেহে লালিত-পালিত হইয়াছেন। তাঁহার মাতা অত্যন্ত কোমলহৃদয়া স্ত্রীলোক ছিলেন। বাটীতে অতিথি আসিলে নিজে না খাইয়াও অতিথিকে খাওয়াইতেন। সুরেশচন্দ্র বাল্যকালে তাহার পিতৃস্বসার বড়ই অনুগত

ছিলেন, সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন; সন্ধ্যা-বন্দনাদি শিক্ষা করিতেন; রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনিতেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহাকে পাঠশালায় পাঠান হয়। তথাকার পাঠ সমাপ্ত করিয়া গৃহ-শিক্ষকের নিকট পনের দিনে প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের First Book of Reading সমাপ্ত করেন। বাল্যকাল হইতেই সুরেশচন্দ্র লেখাপড়া করিতে ও শারীরিক ব্যায়াম করিতে ভালবাসিতেন। তিনি সন্তরণ, বৃক্ষারোহণ, কুস্তী, লাঠিখেলা, অশ্বারোহণ ইত্যাদিতে খুব পটু এবং বাল্যকাল হইতেই নির্ভীক, স্বাবলম্বী, নিরামিষাশী সত্যবাদী এবং হিন্দুধর্ম্মে আসক্ত।

১৯০২ সালে ১৫ বৎসর বয়সে ফুলতলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নূতন-স্থাপিত দৌলতপুর হিন্দু একা-ডেমীতে ভর্ত্তী হইয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাপকগণের অধ্যাপনায় মন আকৃষ্ট না হওয়ায় ও সমস্ত পুস্তকের নোট কিনিয়া পড়িতে হয় বলিয়া, পয়সা দিয়া হাল বাহিয়া খেয়া পার হইতে ইচ্ছুক না হওয়ায় কলেজ ছাড়িয়া, নিজে নোটের সাহায্যে পড়িয়া, ১৯০৪ সালে শিক্ষকরূপে First Examination in Arts পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯০৬ সালে শিক্ষকরূপে বি-এ পরীক্ষা দিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই পরীক্ষার পূর্ব্বে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। সুরেশচন্দ্র মাতার অত্যন্ত ভক্ত। মাতৃবিয়োগে অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া পড়াশুনা করিতে না পারায় এইরূপ হয়। মাতৃবিয়োগে তিনি জীবনে উন্নতির আশা করেন নাই; কিন্তু পরে বন্ধুগণের প্ররোচনায় বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার এক আত্মীয় একটী মামলায় জড়ীভূত হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করায় তিনি বিলাত যাওয়া বন্ধ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করেন। পরে ওকালতী পরীক্ষা দিয়া পাশ করিয়া খুলনায় ওকালতী আরম্ভ করেন।

উকীল হইয়া তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে হয় নাই। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার যথেষ্ট পসার হইয়াছে। তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। ব্যবসায়ের কার্য্য করিয়া অবসর-সময়ে তিনি বালকের মত সংস্কৃতশাস্ত্র ও ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন করেন। তিনি চতুর্ব্বেদ, উপনিষদ, সংহিতা, সূত্র ষড়দর্শন সমস্তই নিষ্ঠার সহিত পড়িয়াছেন; এখনও প্রত্যহ অধ্যয়ন করেন। গীতা তাঁহার কণ্ঠস্থ। প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিয়া সন্ধ্যা, পূজা-সমাপনান্তে গীতা পাঠ করিয়া মক্কেলের কার্য্য করেন। প্রাচীন হিন্দুদিগের ব্যবহারতত্ত্ব সঙ্কলন করিয়া Ancient Hindu Law and Civilization নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার জন্য সারস্বত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক তাঁহাকে "বিদ্যাবিনোদ" উপাধি দিয়াছেন এবং পরে তিনি Royal Asiatic Societyরও সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।

১৯০৬ সালে বরিশাল বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতিতে খুলনা হইতে তিনি প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েন এবং তদবধি কংগ্রেসের কার্য্য করিতেন। তিনি স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতাবলম্বী এবং তাঁহার শিষ্যস্থানীয় ছিলেন। পরে তাঁহারই মতে বোম্বাইয়ের Liberal Conferenceএ গিয়াছিলেন এবং কলিকাতায়ও উক্ত সভার অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

খুলনা জনসাধারণ সভার বহুকাল হইতে তিনি সহকারী সম্পাদক আছেন। তিনি খুলনা হিন্দুসভার একজন স্থাপয়িতা এবং প্রথম সম্পাদক।

খুলনার দুর্ভিক্ষে তিনি বরাবরই অক্লান্তভাবে কর্ম্ম করিয়াছেন। ১৯০৪।৫ সালের দুর্ভিক্ষে রাত্রে মাথায় করিয়া মেয়েদের বাড়ীতে চাল দিয়া আসিতেন। ১৯২১ সালের দুর্ভিক্ষে তিনি ৪।৫ বার প্রপীড়িত স্থান পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং বিরুদ্ধবাদীর মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ

করিয়াছিলেন। সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে ১৯২৮ সালে সাতক্ষীরা দুর্ভিক্ষের রিলিফ কমিটীর সম্পাদক মনোনীত করিয়াছেন।

তিনি খুলনা কায়স্থ সম্মিলনীর একজন প্রতিষ্ঠাতা ও সভ্য; কায়স্থ-গণের উন্নতি জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্তহস্ত। তিনি বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সভ্য। নিখিল ভারতীয় কায়স্থ সভার তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন এবং যোগ দিয়া থাকেন।

যৌথ কারবারে দেশের প্রভূত উন্নতি হয়। এইজন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা ও উদ্যোগ করিয়া খুলনায় কায়স্থ ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অব খুলনা স্থাপনে সহায়তা করিয়াছেন।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এইভাবেই তিনি এই সমস্ত সাধারণ কার্য্য করিয়া থাকেন।

তিনি বহুদিন বিখ্যাত "অমৃতবাজার পত্রিকা'র খুলনাস্থ লেখক। পূর্ব্বে "বঙ্গবাসী" কাগজের লেখক ছিলেন। তাঁহার লেখনীতে সাধারণের অনেক উপকার হইয়াছে।

তাঁহার যথেষ্ট আইন-জ্ঞান আছে। আইনের কূটতর্ক সমাধানে তিনি সুদক্ষ। সেই জন্য অল্প সময়েই ব্যবসায়ে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।

তিনি হরিদ্বারস্থ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইতেছেন। নামের জন্য কোন কার্য্য করেন না। তিনি গোপনে যথেষ্ট দান করিয়া থাকেন, তাহা কেহই জানিতে পারে না। তিনি সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ, বিদ্যোৎসাহী, দানশীল, আশ্রিতপালক, সুলেখক, আর্ত্তরক্ষক, ক্ষত্রিয় এবং সংবাদপত্র-সেবী।

সুরেশচন্দ্র কখনও কোন জনহিতকর কার্য্যে অবহেলা করেন না। তাঁহার সাধুতায় ও কার্য্যতৎপরতার জন্য তাঁহাকে খুলনার প্রাচীন ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লোন কোম্পানীর ডিরেক্টর ও সহকারী সম্পাদক মনোনীত করা

রায় বাহাদুর ডাঃ স্বর্গীয় আশুতোষ মিত্র

হইয়াছে। তিনিও এই কার্য্যে অত্যন্ত কর্ম্মকুশলতা দেখাইয়াছেন। খুলনা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের তিনি একজন ডিরেক্টর এখনও আছেন, সহকারী সম্পাদকের পদ স্ব-ইচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছেন এবং খুলনা লক্ষ্মী ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টর আছেন।

তাঁহার দেশভ্রমণে অত্যন্ত স্পৃহা ছিল। তিনি ১৯১২ সালে ভারতের গ্রীষ্ম-রাজধানী সিমলা সহরে গিয়া অবস্থিতি করেন; পরে তিনি মধ্য প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ এবং বোম্বাই প্রভৃতি সহর পরিভ্রমণ করেন।

রায় বাহাদুর ডাঃ স্বর্গীয় আশুতোষ মিত্র

বাল্য ও ছাত্রজীবন

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতার পরপারস্থিত হাওড়া জেলার অন্তর্গত কোন্নগরে মাতুলালয়ে ডাক্তার আশুতোষ মিত্রের জন্ম হয়। তাঁহার মাতুল স্বনামখ্যাত সিভিল সার্জ্জন পরলোকগত ডাঃ কে-ডি ঘোষ। বাল্যকাল হইতেই আশুতোষ অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে থাকেন। তিনি মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসন্ হইতে প্রবেশিকা এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। তখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর মাত্র।

চিকিৎসার দিকে টান তাঁহার শৈশব হইতেই দেখা যায়। তাঁহার বয়স যখন ৪ বা ৫ বৎসর, তখন তিনি ইষ্টক চূর্ণ করিয়া জলে গুলিয়া শিশিতে পুরিতেন এবং সমবয়স্ক শিশুদিগকে ঔষধস্বরূপ দিতেন; তাহাদের হাত টিপিয়া চিকিৎসকের ন্যায় নাড়ী পরীক্ষা করিতেন ও কাঠীকে থার্ম্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্রের ন্যায় বগলে দিয়া গাত্রের তাপ

দেখিতেন। তাঁহার বাল্যের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও সুচিকিৎসক-মণ্ডিত। স্বনামধন্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কে-ডি ঘোষ ছিলেন তাঁহার মাতুল; ডাক্তার গোপালচন্দ্র দেব ছিলেন তাঁহার বড় ভগিনীপতি। উনি কাশ্মীরের মহারাজা রণবীর সিংহের চিকিৎসক ছিলেন এবং পরে ঐ রাজ্যের Conservator of Forests বা বন-বিভাগের কর্ত্তা হন। ডাক্তার মিত্রের আর এক ভগিনীপতির নাম ডাক্তার ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ বসু; ইঁহাকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কাশীপুরস্থিত North Subarban Hospitalএর প্রতিষ্ঠাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং ডাঃ মিত্রের বাল্য ও যৌবন পরমাত্মীয় সুচিকিৎসকগণের প্রভাবের মধ্যেই অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সুচিকিৎসক-মণ্ডিত পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে, তাঁহাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ করিবে এবং ভবিষ্যতে তাঁহাকেও এক সুচিকিৎসকে পরিণত করিবে, ইহা বিচিত্র নহে।

অল্পদিনের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতিভাদর্শনে এরূপ বিমুগ্ধ হন যে, ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহারা তাঁহাকে শব-ব্যবচ্ছেদের শিক্ষক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সংক্রান্ত ব্যবহার-শাস্ত্রের শিক্ষক-পদে নিযুক্ত করেন। তিনি ঐ পদে এরূপ যোগ্যতার সহিত কার্য্য করেন যে, অধ্যাপকগণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ড-যাত্রা

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তথায় লণ্ডনের কতিপয় রুগ্নাবাসে চিকিৎসা করিয়া তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করেন। ভৈষজ্য ও শল্যবিদ্যায় তিনি রয়েল কলেজ হইতে উচ্চ উপাধি লইয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া

তিনি ষ্টার থিয়েটারে "ইংলণ্ড-ভ্রমণ" নামক এক সারগর্ভ এবং শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার একখণ্ডও এখন আর পাওয়া যায় না।

এই প্রবন্ধের একস্থলে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, শিল্পবাণিজ্যে ইংরেজ জাতি প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। লাঙ্কাশায়ারের কলকারখানা প্রভৃতি তাহাদের সমৃদ্ধির প্রমাণ। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালীরা শিল্প-বাণিজ্যে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। যতদিন বাঙ্গালী শিল্পে ও বাণিজ্যে উন্নতি করিতে না পারিবে ততদিন তাহাদের জাতীয় উন্নতি হইবে না।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই কাকিনা-রাজের সন্তানের চিকিৎসার্থ তিনি আহূত হইয়া তথায় গমন করেন ও রোগীকে নিরাময় করিয়া ফিরিয়া আসেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি চিকিৎসা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি কিছুদিন কলিকাতার স্বাস্থ্য-উন্নতি-সমিতির (Calcutta Public Health Society) স্বাস্থ্যবিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরূপে কার্য্য করেন। এই সময় তিনি উক্ত সমিতির পত্রিকায় স্বাস্থ্যবিষয়ক সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতেন।

কাশ্মীরে কর্ম্মজীবন

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কাশ্মীর রাজ্যের চীফ মেডিক্যাল অফিসার বা চিকিৎসা-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করিয়া তথায় যান। তিনি যখন কাশ্মীরে যান, তখন কাশ্মীরে পাশ্চাত্য চিকিৎসায় সুনিপুণ চিকিৎসক অতি অল্পই ছিলেন। তথাকার অধিবাসীরা ডাক্তারী ঔষধ-পত্র সেবন করিতে আদৌ ইচ্ছুক ছিল না; কিন্তু ডাক্তার মিত্রের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে শীঘ্রই কাশ্মীরবাসীদের চিত্ত পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাঁহারই চেষ্টায় কাশ্মীরের হাসপাতালে এখন সহস্র সহস্র দরিদ্র রোগী চিকিৎসিত হইতেছে। কাশ্মীর রাজ্যের বার্ষিক

বিবরণীতে প্রকাশ, এক্ষণে এই হাসপাতালে বৎসরে দুই লক্ষ রোগী চিকিৎসিত হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরে বিসূচিকা অতি ভীষণভাবে দেখা দিয়াছিল। ধনী হইতে দরিদ্র পর্য্যন্ত কাহারও গৃহই এই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। সেই সময় ডাক্তার মিত্র সকলের ঘরে ঘরে যাইয়া ঔষধ-পথ্য দিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এইজন্য কাশ্মীরের ইতিহাসে এই মহাপ্রাণ চিকিৎসকের কীর্ত্তি-গাথা জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। বঙ্গদেশের সিভিল হাসপাতাল-সমূহের ইন্স্পেক্টর-জেনারেল সার্জ্জন কর্ণেল হার্ব্বি এতৎ-সংক্রান্ত বিবরণীতে লিখিয়াছিলেন :—"The brunt of the work fell on Dr. A. Mitra, who exerted himself in the most energetic throughout, not sparing day and night."

তিনি শীতাতপ গ্রাহ্য না করিয়া ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকল রোগীকেই সমভাবে চিকিৎসা করিতেন। দরিদ্রদের নিকট হইতে তিনি এক কপর্দ্দক গ্রহণ না করিলেও কখনও তাঁহার সযত্ন চিকিৎসা হইতে তাহারা বঞ্চিত হয় নাই।

ডাঃ মিত্রের সহধর্ম্মিণীও পরম দয়াবতী। তিনি বাটী হইতে পথ্য প্রস্তুত করিয়া হাসপাতালের রোগীগণকে পাঠাইয়া দিতেন। কাশ্মীর-রাজ তাঁহাকে শুধু চিকিৎসা-বিভাগের ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কারাগার-সমূহের তত্ত্বাবধানের ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। হাস-পাতালে প্রতিদিন উপস্থিত থাকিয়া রোগীদের ক্ষতাদি তিনি নিজ হস্তে ব্যাণ্ডেজ বা বন্ধন করিয়া দিতেন। তিনি মৃত ব্যক্তিদের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করিতেন। ইহা ব্যতীত আবহ-বিভাগের রিপোর্ট (Meteorological report) দিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি তত্রত্য মানমন্দিরের তত্ত্বাবধান করিতেন। কাশ্মীরের বিদ্যালয়-সমূহের তিনি তত্ত্বাবধায়ক ও অনেক বৎসর যাবৎ

শ্রীনগর শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেকটর বা সর্ব্বময় কর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়ে গিয়া তিনি ছাত্রদিগকে গণিতশাস্ত্র শিখাইতেন। কাশ্মীর মিউনিপালিটী রায় বাহাদুর আশুতোষের অতুল কীর্ত্তি ; তিনিই কাশ্মীরে মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি করেন।

তাঁহার উপর এত গুরুতর কার্য্যসমূহের ভার থাকা সত্ত্বেও তিনি চিকিৎসা-বিষয়ক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ রচনা করিয়া তাহা দেশীয় ও বিদেশীয় পত্রে প্রকাশ করিতেন। American International Journal of Medical Science পত্রিকায় তিনি কুষ্ঠরোগের কারণ-তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া যে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসক-মণ্ডলীকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছিল। শারীরবিজ্ঞান-বিষয়ে তিনি মাতৃভাষায়ও একখানি সুন্দর পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ মিত্র Obstetrical Society of London, Imperial Institute প্রভৃতির সদস্য হন। ঐ বৎসরই ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। তিনি ২৯ বৎসর কাল কাশ্মীর রাজ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি কাশ্মীর রাজ্যের নানাবিষয়ক উন্নতি সাধন করেন। তিনি নিজ উদার চরিত্র ও সহানুভূতি-প্রভাবে কাশ্মীর রাজ্যের আপামর সাধারণের শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। আজিও কাশ্মীর মিউনিসিপালিটী ও শ্রীনগর স্কুল তাঁহার অমর কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে।

১৩০৮ সালে ডাক্তার মিত্র কাশ্মীরী শাল ও অন্যান্য শিল্প দ্রব্যের কেন অবনতি হইল এবং লোকের দারিদ্র্যই বা কেন—সে সম্বন্ধে 'Arts and Industries of Kashmir" নামক এক সুন্দর গবেষণাপূর্ণ পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তিনি কাশ্মীর-মিউজিয়মের অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এই কার্য্য করিতে করিতে তিনি এ বিষয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন।

ডাঃ মিত্রকে এতগুলি প্রধান প্রধান বিভাগের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করিতে দেখিয়া মহারাজা ও রেসিডেণ্ট ভাবিলেন যে, তাঁহাকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিলে রাজ্যের প্রভূত কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হইবে। এইজন্য ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা তাঁহাকে স্বরাষ্ট্র-সচিবের পদ গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু ডাঃ মিত্র উহা গ্রহণে প্রথমতঃ স্বীকৃত হন নাই, কারণ তাঁহার ধারণা হয়, তাহা হইলে তিনি আর ডাক্তার থাকিবেন না। অবশেষে তিনি যখন শুনিলেন যে, চিকিৎসা-বিভাগ তাঁহারই কর্তৃত্বাধীন থাকিবে, তখন তিনি এই পদ গ্রহণে সম্মত হন। কারণ, তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, মন্ত্রীর নিকট হইতে সকল সময়ে সহায়তা ও সহানুভূতির অভাবে চিকিৎসা-বিভাগ, কারাবিভাগ, মানমন্দির, শিক্ষাবিভাগ প্রভৃতিতে যে সকল উন্নতি সাধন করিতে তিনি অক্ষম হইয়াছিলেন স্বরাষ্ট্র-সচিবের পদ গ্রহণ করিলে তাঁহার দ্বারা সে সকল উন্নতি সাধিত হইবে। তথাপি শিশুর মাতৃস্তন্য ত্যাগ করিতে যেমন কষ্ট হয় তাঁহারও তেমনি চীফ মেডিক্যাল অফিসারের পদ ছাড়িয়া মন্ত্রিত্ব-গ্রহণে সেইরূপ কষ্ট হইয়াছিল এবং তিনি সেই সময় তাঁহার এক ভাগিনেয়কে লিখিয়াছিলেন,—"It was a great wrench to me".

তিনি স্বরাষ্ট্রসচিবের পদে অধিরূঢ় হইলে তাঁহার হস্তে সকল প্রয়োজনীয় ও জাতিগঠন-মূলক বিভাগের পরিচালন-ভার ন্যস্ত হয়।

নিম্নলিখিত বিভাগগুলি তাঁহার অধীন ছিল—চিকিৎসা, মিউনিসিপ্যালিটী বা পুর-সেবা, স্বায়ত্ত-শাসন, শিক্ষা, পূর্ত্ত, পুলিশ বা কোতোয়ালী এবং কারা-বিভাগ।

যাহাতে কাশ্মীর-বাসী যুবক উচ্চশিক্ষা পাইয়া জীবনসংগ্রামে দাঁড়াইতে পারে—ইহা তাঁহার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। স্বরাষ্ট্র-সচিবের পদ পাইয়া তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে এই লক্ষ্য-সাধনে প্রবৃত্ত

মিত্র কোনও ঘটনা-উপলক্ষে মহারাজ প্রতাপ সিং রেসিডেণ্ট এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গের উপস্থিতিতে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন—"When an educated Kashmiri will take my (Home Minister's) portfolio from my hands, that would be the proudest day of my life."

কাশ্মীর-যুবক যাহাতে তাহার স্বদেশের শিক্ষা শেষ করিয়া ইউরোপ বা জাপানে যাইয়া বিশিষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে পারে তজ্জন্য তিনি সরকারী বৃত্তির (State Scholarship) বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বহু চেষ্টার ফলে তিনি মহারাজার নিকট হইতে এই অনুমতি পান যে, ইউরোপ হইতে একজন খনি-সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ ও ভূতত্ত্ববিৎকে (Mining and Geological Expert) আনয়ন করিতে হইবে। তিনি ভূমি পরীক্ষা করিয়া কোথায় কোন ধাতুর খনি আছে তাহা স্থির করিবেন এবং কি ভাবে কার্য্য করিলে ঐ সকল খনি হইতে রাজ্যের লাভ হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করিবেন। হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন তিনি এতৎসংক্রান্ত হুকুমনামায় স্বাক্ষর করিতেছিলেন। তিনি যদি আর কিছুকাল জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি কাশ্মীর-রাজ্যের যে কত উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন তাহা যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসিয়াছিলেন তাঁহারাই জানিতেন।

আজ কাশ্মীরে যে উচ্চশিক্ষার বিস্তার হইয়াছে এবং উহা লাভ করা সহজসাধ্য হইয়াছে ইহা ডাঃ মিত্রেরই যত্ন ও অসীম অধ্যবসায়ের ফল। টেক্‌নিক্যাল বা শিল্প শিক্ষার জন্য শ্রীনগরে যে "অমর সিংহ টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট" স্থাপিত হয় ইহার মূলেও ডাঃ মিত্রেরই চেষ্টা ও অদম্য উৎসাহ বিদ্যমান। ইনিই রাজা অমরসিংহের

স্মৃতিরক্ষাকল্পে তৎপুত্র রাজা হরি সিংহকে (এক্ষণে কাশ্মীরাধিপতি) বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে ইন্‌ষ্টিটিউটের বাড়ীর জন্য দেড় লক্ষ টাকা চাঁদা আদায় করেন। এই বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা, মূর্ত্তিনির্ম্মাণ-বিদ্যা, সূত্রধরের কার্য্য, ঝুড়ি-চুপড়ী বোনার কার্য্য ইত্যাদি বহু অর্থকরী শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বহু শত যুবক জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে।

ডাঃ মিত্র ভারতাকাশের এক সমুজ্জ্বল নক্ষত্র এবং বঙ্গমাতার একজন বিশিষ্ট সন্তান ছিলেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর এই মহাপ্রাণ, প্রতিভাসম্পন্ন কর্ম্মবীর বহুমূত্ররোগে অকালে লোকান্তরিত হন। শিক্ষিত বঙ্গসন্তান-গণের মধ্যে অনেকেই আজকাল অকালে বহুমূত্ররোগে কাল-কবলে পতিত হইতেছেন, ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাল-স্বরূপ এই ব্যাধির নিদান নির্ণয় ও ঔষধ আবিষ্কার যাহাতে হয় সেই উদ্দেশ্যে ও স্বর্গগত স্বামীর পুণ্য-স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে ডাঃ মিত্রের সহধর্ম্মিণী "স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে"র কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে "Dr. A. Mitra Diabetic Research Scholar-ship" নামে একটি বৃত্তি-প্রদানের উপযোগী অর্থ দান করিয়াছেন। কোনও প্রতিভাশালী ডাক্তার বহুমূত্র রোগের কারণ নির্ণয় ও ঔষধ আবিষ্কারের জন্য যদি গবেষণা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই বৃত্তি দেওয়া হইবে—ইহাই দাত্রীর অভিপ্রায়। রায় বাহাদুর স্বর্গীয় ডাঃ চুণীলাল বসু, সি-আই-ই মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ডাক্তার জ্যোতিঃপ্রকাশ বসু এই বৃত্তি লইয়া বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য বিলাতে গমন করেন। বহুমূত্র-রোগ সম্বন্ধে তিনি বিশেষবিৎ হইয়া প্রত্যাগমন করেন এবং প্রত্যাগমনের পর হইতে অদ্যাবধি প্রায় ১২ বৎসরকাল তিনি 'স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে'

মিসেস এ. মিত্র

উক্ত বৃত্তি লইয়া বহুমূত্র-রোগের কারণ ও ঔষধ-নির্ণয়-মূলক গবেষণায় ব্রতী রহিয়াছেন। বহুমূত্র রোগ সম্বন্ধে তিনি একখানি গবেষণা-মূলক গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। ডাঃ জ্যোতিঃপ্রকাশ বসুর বিলাত গমন ও তথায় দুই বৎসর অবস্থানের যাবতীয় ব্যয় এই বৃত্তি হইতে নির্ব্বাহিত হয়। এই বৃত্তিভোগের মিয়াদ ছয় বৎসর। প্রতি ছয় বৎসরান্তর এই বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে।

ডাঃ মিত্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও কাশ্মীর-প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা একযোগে তাঁহাদের সন্তানগণের শিক্ষার জন্য "ডাঃ মিত্র পাঠশালা" নামক একটী উচ্চ বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া বহু বাঙ্গালী ছাত্র এই পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেছেন ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতেছেন।

স্বর্গীয় কালীপদ ঘোষ

(রাঁচি)

ইনি ১৮৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চকদীঘির সন্নিকট জাড়গ্রাম নামক স্থানে দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার এক সহোদর—কৃষ্ণচন্দ্র এবং তিন সহোদরা। ইনি সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান।

ইঁহার পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সরলহৃদয়, ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। স্বল্প আয় হইলেও তিনি নিজ পরিবার ভিন্ন অনেকগুলি আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ করিতেন এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানে তিনি এই ভার অকাতরে বহন করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র হুগলী জেলার অন্তঃপাতী শ্রীরামপুরে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী কালিদাস পালের বাটীতে সামান্য বেতনে চাকরী গ্রহণ করেন এবং সেই সূত্রে তিনি সপরিবারে ঐ স্থানে আসিয়া বাস করেন।

কালীপদ শৈশবে শ্রীরামপুরে লেখাপড়া করেন। প্রথমে মধ্য বাঙ্গালা স্কুলে ভর্ত্তি হন। তখন দীননাথ মুখোপাধ্যায় ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনিও ঐ স্থানে সপরিবারে বাস করিতেন।

দীননাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র প্রথমে এক পল্লীতে ও পরে একেবারে পাশা-পাশি অনেক দিন বাস করায় দুই পরিবারের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল।

উক্ত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইবার প্রধান কারণ কালীপদের মাতা। তিনি সকলকেই ভালবাসিতেন, তাঁহাকেও সকলে ভালবাসিত। তাঁহার স্বভাব ও আচরণ অতি সুন্দর। তিনি এই সম্বন্ধকে এত মধুর করিয়া
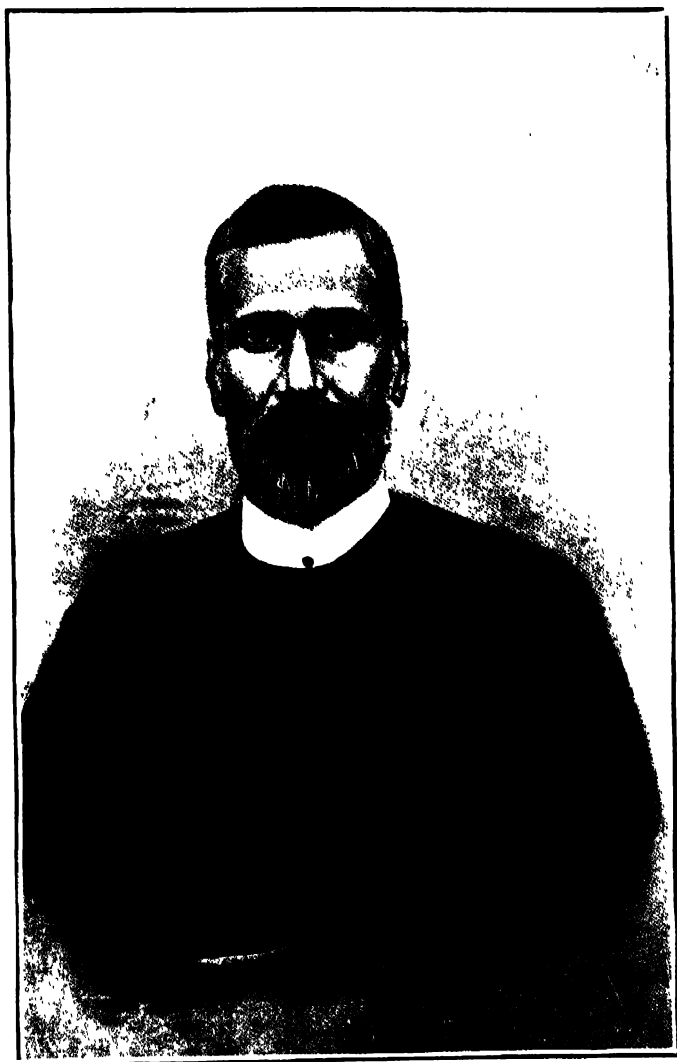
স্বর্গীয় কালীপদ ঘোষ

তুলিয়াছিলেন যে, এই দুই পরিবার দরিদ্রও হইলেও সেখানে সুখ ছিল, আনন্দ ছিল। তিনি দুই পরিবারের কেন্দ্রস্বরূপ ছিলেন।

দীননাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণ। কালীপদ ও নারায়ণ সমবয়স্ক হওয়ায় উভয়ে সৌহার্দ্দ্য-সূত্রে আবদ্ধ হন এবং সারা জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া এই সৌহার্দ্দ্য বরাবর অক্ষুণ্ণ থাকে।

শ্রীরামপুর মধ্য বাঙ্গালা স্কুল হইতে কালীপদ মধ্য-বাঙ্গালা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া উত্তরপাড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পড়াশুনা করিতে থাকেন। তখন ঐ স্কুলের হেড. মাষ্টার ছিলেন খ্যাতনামা বনমালী মিত্র। ঐ স্কুলে পড়িবার কালে কালীপদের মাতা পরলোকগমন করেন এবং তাহার কিছুদিন পরে ইঁহার পিতা নানা কারণে শ্রীরামপুর ত্যাগ করিয়া দেশে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হন।

তখন কালীপদের পিতৃব্য-পুত্র পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মানভূম জেলায় পাণ্ড্রা উচ্চ ইংরাজী স্কুলের হেড মাষ্টার। তিনি কালীপদের ভার গ্রহণ করিয়া ইঁহাকে পাণ্ড্রায় লইয়া যান। সেখান হইতে ইনি ১৮৭৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি-লাভ করিয়া উত্তীর্ণ এবং হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হন।

হুগলী কলেজে ইনি চারি বৎসর অধ্যয়ন করেন। প্রথম দুই বৎসর ইনি উল্লিখিত শ্রীরামপুর মধ্য-বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীননাথের গোন্দলপাড়াস্থিত বাটী হইতে প্রত্যহ নৌকাযোগে কলেজে যাতায়াত করিতেন এবং শেষ দুই বৎসর চুঁচুড়ায় কয়েক জন শিক্ষার্থীর সহিত একত্র বাসা করিয়া থাকিতেন।

এই হুগলী কলেজেই কালীপদের প্রতিভা-স্ফুরণ, চরিত্র-সংগঠন ও ভবিষ্যৎ জীবনের ভাব-ধারার ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে ইনি এমন কয়েক জন সহপাঠী পাইয়াছিলেন যাঁহাদের সংশ্রবে তিনি ঐ সকল বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন। সহপাঠিগণের মধ্যে

বোলপুরের চন্দ্রভূষণ সেন, কৃষ্ণনগরের স্বনামখ্যাত ডি-এল রায়,খামারপাড়ার রায় বাহাদুর ভগবতীচরণ কুণ্ডু, রাজারামপুরের শরৎচন্দ্র মিত্র, নৈহাটীর রায় বাহাদুর বরদাকান্ত মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৮৮০ সালে কালীপদ এফ্-এ পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন এবং ১৮৮৩ সালে বি-এ পাস করিয়া হুগলী কলেজ ত্যাগ করেন।

তখন ইচ্ছা আরও পড়া; কিন্তু অবস্থা সেরূপ নহে। সুতরাং স্কুল-শিক্ষক বা গৃহশিক্ষক হইয়া আবশ্যক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এম-এ ও বি-এল পড়িবার উদ্দেশ্যে ইনি কলিকাতায় আসেন এবং যথাসময়ে ঐ দুই পরীক্ষা পাস করেন।

ইনি ফ্রি চার্চ্চ ইনষ্টিটিউসনে এম্-এ পড়িয়াছিলেন এবং ইংলিশ কোর্স লইয়া ছিলেন। সে সময়ে ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রবার্টসন সাহেব উঁহার নিজ বাটীতে উক্ত কোর্স পড়াইতেন এবং দশজন ছাত্র ঐ ক্লাসে পড়িতেন।

কলেজের শিক্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইঁহার পিতা পরলোকগমন করেন। সে সময়ে ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র রাঁচিতে সামান্য চাকরী করিতেছিলেন। ওকালতী করিবার মানসে ইনি রাঁচি যাত্রা করেন। পৃষ্ঠপোষক কেহই ছিলেন না। একমাত্র নিজের যত্ন ও অধ্যবসায়গুণে ইনি অল্পকালের মধ্যেই রাঁচির প্রধান উকীল বলিয়া গণ্য হন।

রাঁচিই ইঁহার জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র। প্রায় দীর্ঘ ৪৩ বৎসর কাল ইনি তথায় ছিলেন। একদিকে যেমন ইঁহার ওকালতীর পসার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনি ইনি জনহিতকর সকল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লাগিলেন। ইনি একজন প্রকৃত কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। বাঙ্গালা বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, বাঙ্গালী ক্লাব, কো-অপারেটিভ সোসাইটি, দুর্গাবাটী প্রভৃতি ইঁহারই সাহায্যে ও প্রযত্নে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

ইনি বহুদিন ধরিয়া রাঁচি মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যান ও বার লাইব্রেরীর সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯০৩ সালে ছোটনাগপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড-সমূহ হইতে এবং পুনরায় ১৯০৭ সালে ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যালিটী-সমূহ হইতে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ছোটনাগপুর সম্বন্ধে ইহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় ছোটনাগপুর রেণ্ট একট্ এমেণ্ডমেণ্ট বিল পাস্ হইবার সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় ইঁহার সাহায্য ধন্যবাদের সহিত গৃহীত এবং ইঁহারই আবেদন-নিবেদন ও আন্দোলনের ফলে পুরুলিয়া হইতে রাঁচি পর্য্যন্ত রেলওয়ে খোলা হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে রাঁচি পর্য্যন্ত রেলওয়ে ছিল না। ১৯১৪ সালে বাঁকিপুরে বিহার ও ছোটনাগপুরের প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের যে কনফারেন্স হয় তাহাতে ইনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

পাঁচড়া-নিবাসী মাধবচন্দ্র চৌধুরীর মধ্যমা কন্যা চারুমতীর সহিত কালীপদ বাবুর বিবাহ হয়। মাধবের পুত্র শশিভূষণ হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন জজ ছিলেন এবং পেনসন লইয়া ইউনিভারসিটী ল কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছিলেন। কালীপদবাবুর ৪ পুত্র ও ৪ কন্যা এখন জীবিত। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রফুল্লকুমার, ২য় শিশিরকুমার এম-এ, বি-এল এটর্নি, ৩য় কাপ্তেন সনৎকুমার এম-বি এবং ৪র্থ নন্দকুমার এম্-এস্-সি, বি-এল রাঁচির উকিল ও অধুনা বিহার ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্য। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয় দর্জ্জিপাড়ার স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বসুর কন্যার সহিত; মধ্যম পুত্রের বিবাহ হয় স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসুর কনিষ্ঠা কন্যার সহিত; তৃতীয় পুত্রের বিবাহ হয় এটর্ণি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্রদের কন্যার সহিত এবং কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয় স্বর্গীয় স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের পৌত্রীর সহিত।

১৯০৭ সালে কালীপদবাবুর সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু হয়। সেই অবধি

ইঁহার শরীর ভগ্ন হইতে থাকে। দীর্ঘ ২২ বৎসর কাল বিপত্নীক অবস্থায় ইঁহাকে দিনের পর দিন জরা ও ব্যাধির আক্রমণ সহ্য করিতে হয়। তাহা হইলেও ইনি কর্ত্তব্যকর্ম্ম-অনুষ্ঠানে কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। ইঁহার অন্তঃকরণ অতি কোমল ও দয়াদ্র্র ছিল এবং জনহিতকর কর্ম্মে ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল।

ইনি ১৯২৯ সালের ২৪এ নভেম্বর দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর চারি দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইনি রাঁচির দুর্গাবাটী-নির্ম্মাণের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন। এই কার্য্যে রায় সাহেব তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ইঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে রাঁচিতে সাধারণের কোনও দেবমন্দির ছিল না। এই দুর্গাবাটীই প্রথম সাধারণ দেবমন্দির। এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতে ইঁহার হৃদয়ে জাগ্রত ছিল। দুঃখের বিষয়, ইনি মন্দিরে দেবপ্রতিষ্ঠা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। রাঁচির জনসাধারণ দুর্গাবাটীতে একখণ্ড প্রস্তর-ফলকে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন—

ওঁ হরিঃ।

শ্রীশ্রীহরিসভা ও দুর্গাপূজা কমিটীর সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় এবং তাঁহারই অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ পরিশ্রমে এই মন্দির নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত সদনুষ্ঠান চিরস্মরণীয় রাখিবার মানসে এই প্রস্তর-ফলক স্থাপিত হইল।

শুভ কার্ত্তিক ১৩৩৫ সাল।

রায় সাহেব মৃত্যুঞ্জয় লাল

রায় সাহেব মৃত্যুঞ্জয় লালের পূর্ব্বপুরুষেরা বেনারসের নিকট মির্জ্জাপুর হইতে রাজনগরের রাজার অধীনে চাকুরী করিতে আইসেন। বংশতালিকা-পাঠে অনুমান হয় যে, তাঁহারা প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। মুনসী রামচাঁদের রাজনগর-রাজদরবারে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব ছিল। ইনি পরে উক্ত এষ্টেটের অর্থসচিব হইয়াছিলেন। *

এই সময়ে কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি ক্রয় করা হয়। রাজনগর রাজ্য লোপ পাইলে এবং সিউড়ীতে সরকারী কোর্ট ও অফিস-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইলে মুন্‌সী ব্রজলাল সরকারী চাকুরী স্বীকার করেন এবং বীরভূম কলেক্টরীতে তৌজি-নবিশের পদে চাকুরী করেন। তাঁহার পরে মৃত্যুঞ্জয় লালের পিতামহ লালা রূপলাল বীরভূম কলেক্টরীর কোষাধ্যক্ষ হন এবং ৩৭ বৎসর পরে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে কয়েকটী জমিদারী ক্রয় করা হয়, ঐগুলির মোট আয় পাঁচ হাজার টাকা। তাঁহার অবসর-গ্রহণের পর মৃত্যুঞ্জয় লালের পিতা লালা শিবলাল বীরভূম কলেক্টরীর কোষাধ্যক্ষ হন এবং ৩৩ বৎসরকাল কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। মৃত্যুঞ্জয় লাল ও তাঁহার ভ্রাতা লালা দিগম্বর লাল ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ভ্রাতা কিছুদিন পরেই মুন্সেফ হন এবং সব-জজ হইয়া শেষে পাটনা হাইকোর্টের প্রথম ডেপুটী রেজিষ্ট্রার-পদে উন্নীত হন। দুর্ভাগ্য-প্রযুক্ত তিনি ১৯১৬ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র পুত্র লালা গণেশপ্রসাদকে রাখিয়া যান, গণেশপ্রসাদও মুন্সেফ হন, কিন্তু ১৯২৪ সালে তিনিও অকালে প্রাণত্যাগ করেন।

---

* Vide Hunter's Statistical Account.

মৃত্যুঞ্জয় লালের পুত্র লালা রামচন্দ্র বি-এল পাশ করিয়া বীরভূম জেলা-জজের আদালতে ওকালতী করিতেছেন। মৃত্যুঞ্জয় লালের পিতার পিস্তুতো ভগিনীর পুত্র রায় বাহাদুর লালা দামোদরপ্রসাদ পুরুলিয়ার জেলা ও দায়রা-জজের কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। মৃতুঞ্জয় লালের অন্যতম পিস্তুতো ভাই লালা আশুতোষ ত্রিহুত বিভাগের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর এবং কমিশনারের পার্শনাল এসিষ্ট্যাণ্ট। মৃত্যুঞ্জয় লালের অন্যতম পিস্তুতো ভাই লালা ত্রিলোকনাথ এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার হইয়াছিলেন এবং অন্য পিস্তুতো ভাই লালা তারকনাথ মুন্সেফ হইয়াছিলেন। ইঁহারা শ্রীবাৎস্তব কায়স্থ-বংশোদ্ভব। বঙ্গদেশে ইঁহাদের স্বশ্রেণীর কায়স্থ-সংখ্যা অতি সামান্য বলিয়া ইঁহাদের পুত্র-কন্যাদিগকে বিহার ও যুক্ত প্রদেশে বিবাহ দিতে হয়।

মৃত্যুঞ্জয় লালের জামাতা বাবু ভগবানপ্রসাদ পাটনা হাইকোর্টের এডভোকেট এবং ইঁহার ভ্রাতার জামাতা স্বর্গীয় রাধিকানারায়ণ সিংহ বিহার গভর্ণমেণ্টের অধীনে মুন্সেফ ছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় লাল নিম্নলিখিত অবৈতনিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং ছিলেন :—

(১) সিউড়ি মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ১৯২৪ সালের নভেম্বর হইতে আজ পর্য্যন্ত

(২) বীরভূম জেলা-বোর্ডের সদস্য

(৩) সিউড়ি M. E. স্কুলের সভাপতি

(৪) সিউড়ি বালিকা-বিদ্যালয়ের সম্পাদক

(৫) বীরভূম টাউনহল ও পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক, হাইকোর্টের উকিল, কিন্তু বীরভূমে ওকালতী করিতেছেন

(৬) বীরভূম বার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনীর সম্পাদক

(৭) সিউড়ি জেলের সরকারী পরিদর্শক

(৮) স্থানীয় হিন্দুসভার সভাপতি ও সিউড়ীর প্রায় যাবতীয় জনহিতকর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সদস্য।

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর জনহিতকর কার্য্য ও সদ্‌গুণাবলীর জন্য বড়লাট লর্ড আরউইন ইঁহাকে "রায় সাহেব" ও বাঙ্গালার ছোটলাট ইঁহাকে মানপত্র (Certificate of Honour) দেন।

বংশ-তালিকা

বর্দ্ধমানের পালবংশ

বর্দ্ধমানের পালবংশ বর্দ্ধমান অঞ্চলের প্রসিদ্ধ উগ্রক্ষত্রিয়জাতির বাইশটী বহু প্রাচীন বংশের অন্যতম ও কেন্দ্রস্থানীয়। এই পাল-বংশের ইতিহাসের সহিত প্রাচীন রাঢ়ামণ্ডলের তথা সমগ্র প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিশেষরূপে বিজড়িত। হিন্দুরাজত্বকালের প্রায় সমস্ত ইতিহাসই এখনও বিস্মৃতির অন্ধকারে আবরিত; কেবলমাত্র পুরুষ-পরম্পরাগত প্রবাদবাক্য বা শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদি এবং কুল-পঞ্জিকাদি হইতে এবং প্রাচীন কবিগণের বর্ণনা হইতে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাহা হইতেই কোনও রূপে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের কাঠামো দাঁড় করান হইতেছে। এই উগ্রক্ষত্রিয়জাতি প্রাচীন রাঢ়া-মণ্ডলে ও গৌড়সাম্রাজ্যে যে প্রসিদ্ধ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে এক্ষণে বহুবিধ তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পরশুরাম কর্ত্তৃক সমগ্র ভারতের ক্ষত্রিয়জাতির বিলোপ সাধন হওয়ার গল্পসমূহ প্রচারিত করিয়া এই বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়জাতির অস্তিত্বশূন্যতা বিশেষভাবে ঘোষণা করেন। তাঁহাদের বাগাড়ম্বরে স্তব্ধীকৃত হওয়ায় এতদিন বঙ্গের বা প্রাচীন রাঢ়ামণ্ডলের ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। এক্ষণে ঐতিহাসিকগণের কৃপায় উগ্রক্ষত্রিয়জাতির এবং বিশেষভাবে উক্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত এই বর্দ্ধমানের পালবংশের যে সকল ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যাইতেছে তাহা উক্ত বংশের ইতিবৃত্ত-সঙ্কলনের সময় উল্লিখিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রাচীন শাস্ত্রাদি ও ইতিহাসাদি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গঙ্গানদীর দক্ষিণে এবং ভাগীরথীর পশ্চিমে ও কলিঙ্গের উত্তরে এবং

প্রাচীন ঝাড়খণ্ড বা বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণার পূর্ব্বে প্রাচীন সূম্ভ বা রাঢ়ামণ্ডল অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রাচীন রাঢ়ামণ্ডলকে কতকপরিমাণে বর্ত্তমান ইংরাজ রাজত্বের বর্দ্ধমান বিভাগ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই অঞ্চল বহু প্রাচীনকাল হইতেই এক বিশিষ্ট শ্রেণীর ক্ষত্রিয়জাতির আবাসভূমি ছিল। মহাভারতের সভাপর্ব্বে ২৯ অধ্যায়ে ভীমসেনাদির দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে এবং মহাকবি কালিদাস-কৃত রঘুবংশের ৪র্থ সর্গে রঘুরাজার দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে এই সূম্ভদেশীয় রাজগণের বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এবং পূজনীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণের লিখিত গৌড়বঙ্গের ইতিহাস পাঠ করিলেও দেখা যায়, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও এই রাঢ়ামণ্ডল বহুতর বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় বংশের আবাসভূমি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কর্ণসুবর্ণের গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের বা গৌড়ের পালবংশীয় সম্রাটগণের বা সেনবংশীয় সম্রাটগণের সকলেরই এই রাঢ়ামণ্ডলে আদিনিবাস ছিল। বঙ্গদেশীয় কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী-রচিত 'ধর্ম্মমঙ্গলে' অজয়নদের তীরবর্ত্তী ঢেকুরীগড়ের মহারাজা কর্ণ সেন এবং তৎপুত্র রাজা লাউসেনের কথা পাওয়া যায়। এই লাউসেন মঙ্গল-কোটের, বর্দ্ধমানের এবং সিমুলার রাজার কন্যাগণকে বিবাহ করেন। পূর্ব্বোক্ত গুপ্ত, পাল বা সেনবংশীয় নরপতিগণও চেদি, হৈহয়, চান্দেল, রাঠোর প্রভৃতি ভারত-প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশসমূহে পরিণয়-কার্য্য সমাধা করায় এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বহু বহু অশ্বমেধ-যজ্ঞাদি সম্পন্ন করায় তাঁহারা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

গৌড়ের পাল-সম্রাটগণ প্রায় পঞ্চশত বৎসর ধরিয়া রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধে সাম্রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা মূলতঃ ক্ষত্রিয় হইলেও তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন সম্রাট বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ

করেন এবং রাজ্যমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষভাবে প্রচার করেন ; সে কারণ এদেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকল বর্ণের অধিবাসিগণই বহুপরিমাণে বৌদ্ধমতে প্রভাবান্বিত হইয়া বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও সংস্কারাদি বর্জ্জন করেন। পরে যখন শঙ্করাচার্য্য ও কুমারিল ভট্ট-প্রচারিত বৈদিক ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নবকলেবর ধারণ করিয়া এদেশে প্রচারিত হয় তখন এদেশে নবভাবে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়া অবশিষ্ট ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি সমুদয় বর্ণকেই শূদ্রাচারী বর্ণনা করিয়া শূদ্র আখ্যা দেওয়া হয় এবং পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় হওয়া ইত্যাদি নানাবিধ কাল্পনিক প্রবন্ধ প্রচার করিয়া এদেশে ক্ষত্রিয়জাতির কোনও অস্তিত্ব না থাকা সাব্যস্ত করা হয়। মহাভারতের হরিবংশপর্ব্বের ৩৩শ এবং ৩৪শ অধ্যায় কিম্বা মৎস্য-পুরাণের ৪৩শ এবং ৪৪শ অধ্যায় অথবা কূর্ম্মপুরাণের পূর্ব্বভাগ ২২শ অধ্যায় পাঠ করিলে পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করার গল্প যে একেবারেই মিথ্যা তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু সূর্য্যবংশীয় দাশরথি রাম এবং চন্দ্রবংশীয় শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরশুরামের বিশিষ্টরূপে পরাজয় এবং লাঞ্ছনাই পৃথিবী কখনও নিঃক্ষত্রিয় না হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ।

বর্ত্তমানকালের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যে সকল শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদি আবিষ্কার করিয়াছেন সে সকল আলোচনা করিলে দেখা যায়, পাল-উপাধিধারী বহু ক্ষত্রিয় সম্রাট এই ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যে কয়েকটি পাল-উপাধিধারী ক্ষত্রিয় রাজবংশ দেখা যায় তাঁহারা সকলেই সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। Annual Report of the Archælogical Survey of India 1903-4. P. 280. Verse 2. 3. হইতে জানা যায় যে, গুর্জ্জরের মহী-পাল, দেবপাল, বিজয়পাল, রাজ্যপাল, ত্রিলোচনপাল, মহেন্দ্রপাল প্রভৃতি পালবংশীয় প্রতিহারগণ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। গৌড়ের পাল-

বংশীয় সম্রাটগণকেও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইতে দেখা যায়। মহারাজ কুমারপালের অমাত্য ও সেনাপতি কামরূপরাজ বৈদ্যদেবের প্রদত্ত কমৌলি তাম্রশাসনে লিখিত আছে, "এতস্য দক্ষিণদৃশো বংশে মিহিরস্য জাতবান পূৰ্ব্বং বিগ্রহপালো নৃপতিঃ সৰ্ব্বাকারদ্ধি সংসিদ্ধঃ" (গৌড়লেখমালা ১২৮ পৃষ্ঠা) হইতে "এতস্য দক্ষিণদৃশো" বাক্যের দ্বারা গৌড়ের দক্ষিণস্থ রাঢ়ামণ্ডলের কথাই বুঝায় এবং "মিহিরস্য বংশে জাতবান" বাক্যে সূর্য্যবংশজাত বুঝায়। সন্ধ্যাকর নন্দী-কৃত রামপাল-চরিতের প্রথম পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকের "তৎকুলদীপোনৃপতিরভূত ধৰ্ম্মো ধামবানইবেক্ষ্বাকুঃ" এই শ্লোকটিকে পূৰ্ব্ববৰ্ত্তী ৩য় শ্লোকে বর্ণিত সমুদ্রের সহিত একত্র করিয়া কেহ কেহ গৌড়ের পালসম্রাটগণকে সমুদ্রবংশ-জাত বলিয়া বর্ণনা করেন; কিন্তু উক্ত শ্লোকটিকে "ইক্ষ্বাকু-ইব তৎকুল-দীপ ধৰ্ম্মপাল নৃপতি ধামবান অভূৎ" এইরূপ অন্বয় করিয়া লইলে বৈদ্য-দেবের কমৌলি তাম্রশাসনের সহিত সন্ধ্যাকর নন্দীর বর্ণনায় কিছুমাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

বঙ্গদেশীয় পল্লীগ্রামের স্বভাব-কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী পূৰ্ব্বোক্ত টীকা-কারগণ-বর্ণিত প্রবাদ-বাক্যকে রূপদান করিবার জন্য তাঁহার কৃত 'ধৰ্ম্ম-মঙ্গলে' ধৰ্ম্মপালের পত্নী বল্লভার গর্ভে সমুদ্রের ঔরসে ধৰ্ম্মপালের পুত্র দেবপালের জন্মসম্বন্ধীয় এক অপরূপ গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। দেবপালের কোনও সন্তান-সন্ততি গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই; কাজেই গৌড়ের পালবংশীয় সম্রাটগণকে সমুদ্রবংশজাত বলিয়া বর্ণনা করার মূলে ঘনরাম-বর্ণিত ঘটনার কোনও সত্যতা থাকিতে পারে না। অন্য যে কোনও কারণেই হউক, গৌড়ের পালবংশীয় সম্রাটগণ অতীতকাল হইতেই "সমুদ্রকুল-জাত" বলিয়া বর্ণিত হইয়া আসিতেছেন। এই সম্বন্ধে উগ্রক্ষত্রিয়জাতির কুলপ্রশস্তিতে বৰ্দ্ধমানের পালবংশের বর্ণনা-সম্বন্ধে লিখিত আছে,—"বৰ্দ্ধমানে রত্নাকর দক্ষিণে

রাজন, এড়ুয়ারে অঙ্গীকারে সেনের নন্দন।" বৰ্দ্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয়জাতীয় পালবংশীয়গণও অতি প্রাচীনকাল হইতেই রত্নাকরবংশীয় (অর্থাৎ সমুদ্রকুলজাত) বলিয়া বর্ণিত হইয়া আসিতেছেন এবং মঙ্গলকোটের নিকটবর্ত্তী এড়ুয়ারে সেনবংশীয় রাজা লাউসেনের সন্তানগণের বসবাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। লাউসেন মঙ্গলকোটের রাজা গজমতির কন্যাকে বিবাহ করেন। মঙ্গলকোট অঞ্চলের উগ্রক্ষত্রিয় কোঙারগণ আপনাদিগকে মঙ্গলকোটের গজমতি কোঙারের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। গৌড়ের পাল সম্রাটগণ সমুদ্রবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ, উগ্রক্ষত্রিয়জাতির বৰ্দ্ধমানের পালবংশও স্মরণাতীত কাল হইতে রত্নাকর বা সমুদ্রবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং এই পালবংশীয়গণ আপনাদিগকে রাজা মদনপালের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। গৌড়ের শেষ পালবংশীয় সম্রাটের নাম রাজা মদনপাল।

সূর্য্যবংশীয় সম্রাটগণ যে গৌতম-গোত্রীয় ছিলেন তাহা ঋগ্বেদ-সংহিতার ৩ অষ্টক ৪ অধ্যায় ৪ মণ্ডল ৪ সূক্তের ১১ ঋক এবং ৩য় অষ্টক ৬ অধ্যায় ৪ মণ্ডল ৩২ সূক্তের ৯ ঋক হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়। শাক্যবংশীয় সিদ্ধার্থের গৌতম-গোত্র থাকায় তিনি গৌতমবুদ্ধ বলিয়া কথিত হইতেন। শাক্যবংশ ইক্ষাকুবংশের একটি শাখা। উগ্রক্ষত্রিয়-জাতির বৰ্দ্ধমান পরগণার পালবংশও গৌতম-গোত্রীয়।

Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol. 3 পাঠ করিলে দেখা যায়, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের উপক্রমণিকায় গোপাল দেবের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে তৎকালে গৌড়বঙ্গ, রাঢ় ও মগধের অবস্থা যে অতি শোচনীয় হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। উক্ত বর্ণনা-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় ৭৩০ অব্দে কনোজাধিপতি যশোবৰ্ম্মদেব গৌড় অধিকার করিয়া বসিয়াছেন; আসাম ও কামরূপাধি-

পতি ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগ প্রায় সমস্ত অধিকার করিয়াছেন ; কাশ্মীর-রাজকুমার জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করিয়াছেন ; দক্ষিণে কলিঙ্গরাজ দণ্ডভুক্তি পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়াছেন ; গুর্জ্জরের বৎসরাজ সমস্ত পশ্চিম ও মধ্যভারত অধিকার করিয়া গৌড় ও মগধের শ্বেতরাজচ্ছত্র দুইটী অধিকার করিয়াছেন। এইসকল বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে, সে সময় কেবলমাত্র এই রাঢ়ামণ্ডলেই স্বাধীনতা বিরাজ করিতেছিল। প্রবলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই রাঢ়ামণ্ডলের সামন্তরাজগণ গোপালদেবকে তাঁহাদের অধিনায়কত্বে বসাইয়া এমন একটি প্রবল শক্তিশালী রাজ্য-গঠন করেন যাহা গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালের রাজত্ব-সময়ে সমগ্রভারতব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি-রচনাকাল ১৫০২ শকাব্দ অর্থাৎ বর্ত্তমানকাল হইতে প্রায় ৩৫৩ বৎসর পূর্ব্বেও গৌড়ের দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে অর্থাৎ প্রাচীন রাঢ়ামণ্ডলে উগ্রক্ষত্রিয়-জাতির বাইশটি রাজ্যের অস্তিত্বের প্রবাদ এদেশে প্রচলিত ছিল। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী-রচিত গৌড়ের ইতিহাসগ্রন্থের ১ম ভাগের ১০৩ পৃষ্ঠায় পশ্চিম রাঢ়ে পাল-সম্রাটগণের অধীন উগ্রক্ষত্রিয়জাতির কয়েকটি রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়। উগ্রক্ষত্রিয়জাতির বাইশটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন বংশের ও তাহাদের রাজ্যসম্বন্ধে প্রবাদ-বাক্য পূর্ব্বোক্ত দুইটী গ্রন্থ ব্যতীত আরও বহুগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। ঘনরাম চক্রবর্ত্তীও প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও "বাইশ আগরী আদ্য বিজয় জাইগিরী যার গাঁ" বলিয়া উগ্রক্ষত্রিয়জাতির প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বাইশটী বংশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উপরের বর্ণনাসমূহ হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নহে যে, উগ্রক্ষত্রিয়জাতীয় বাইশটী খণ্ডরাজ্যের রাজগণ

প্রবলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের রাঢ়ামণ্ডলের কেন্দ্রস্থানীয় বর্দ্ধমান অঞ্চলের অধিপতি গোপালদেবকে একই জাতীয় বাইশটী সামন্তরাজ্যের অধিনায়কত্বে আরোপিত করিয়া এক প্রবল শক্তিশালী সঙ্ঘের সৃষ্টি করেন। এই কারণেই আমরা "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" এই ত্রিশরণের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই শক্তিশালী সঙ্ঘ যতদিন অব্যাহত ছিল ততদিন পাল-সম্রাটগণ সমগ্র ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং রামপালের পুত্র রাজ্যপালের মৃত্যুতে এই সঙ্ঘের ধ্বংসেই পরবর্ত্তী সম্রাট মদনপালদেবের আমলে সেই সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়।

গৌড়ের পালসম্রাটগণের ধর্ম্মপাল হইতে আরম্ভ করিয়া মদনপাল পর্য্যন্ত সমুদয় নরপতি প্রত্যেক শিলালিপি বা প্রত্যেক তাম্র-শাসনাদিতে "বর্দ্ধমান" শব্দের বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। ইহাতে উক্ত পালসম্রাট-গণের সহিত বর্দ্ধমানের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। এইজন্যই কবি শশাঙ্কশেখর প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রচিত "গৌড়বিলাস" গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, "বিক্রমী কায়স্থ আর আগুরীর জাতি, গৌড়ের ক্ষত্রিয় তারা দিগদিগন্ত ভাতি।" গৌড়ের পালসম্রাটগণ রাঢ়ামণ্ডলের অন্তর্গত বর্দ্ধমান অঞ্চলের "উগ্রক্ষত্রিয়" নামক বিশিষ্ট শ্রেণীর ক্ষত্রিয় ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে এই উগ্রক্ষত্রিয়জাতির সংস্কারাদি যদিও বহুপরিমাণে বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল তথাপি উগ্রক্ষত্রিয়গণ যে বিশুদ্ধ এবং বিশিষ্ট শ্রেণীর ক্ষত্রিয় তাহা বেদ-উপনিষদাদি গ্রন্থ-পাঠে অবগত হইতে পারা যায়। শুক্ল যজুর্ব্বেদের ১২শ অধ্যায়ে ৮৬ মন্ত্রের "উগ্রো মধ্যমশীঃ" বাক্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রাচীন ভাষ্যকার শ্রীমৎ উবটাচার্য্য লিখিয়াছেন, "উগ্রক্ষত্রিয়ঃ বদ্ধ গোধাঙ্গুলিত্রাণঃ স এব বিশিষ্যতে।" আর একজন

প্রাচীন ভাষ্যকার শ্রীমন্মহীধর লিখিয়াছেন, "মধ্যমশীঃ মর্ম্মঘাতকঃ উগ্রো উৎকৃষ্টোবদ্ধ গোধাঙ্গুলিত্রাণ উদগূর্ণশস্ত্রঃ ক্ষত্রিয়ঃ।" মনুসংহিতার ব্যাখ্যাকালে বিখ্যাত ভাষ্যকার মেধাতিথি লিখিয়াছেন, "উগ্রো জাতি-বিশেষঃ রাজেত্যেতস্য বেদে প্রয়োগো দৃশ্যতে।" অর্থাৎ উগ্র জাতি-বিশেষ, বেদে ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মনু-সংহিতার কোনও এক প্রক্ষিপ্ত অংশে উগ্রশব্দের টীকা-প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লুকভট্ট মনুসংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ের ২১২ শ্লোকের টীকায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লিখিয়াছেন, "উগ্রো দারুণকর্ম্মা গোবিন্দরাজো মঞ্জুর্য্যামুগ্রং রাজানং উক্তবান্, মনুবৃত্তৌ চ শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয়োৎপন্নং অভ্যধাৎ, ভেদোক্তে যাজ্ঞবল্কীয়ে নোগ্রো রাজেতি বাবদৎ আশ্চর্য্যমিদং এতস্য স্বকীয় হৃদিভূষণম্।" সকল জৈনাগম-পারদর্শী প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য শ্রীমৎ বিজয়রাজেন্দ্র সূরীশ্বর মহারাজ তৎ-বিরচিত "অভিধান-রাজেন্দ্রে" লিখিয়াছেন,"উগ্র উগ্রদণ্ডকারিত্বাদুগ্রঃ আদিদেবতাবস্থাপিতে আরক্ত বংশজে ক্ষত্রিয়ভেদে ; উগ্রপুত্রাঃ উগ্রানাং পুত্রাঃ উগ্রানাং কুমারেষু ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষেষু।" গুজরাটের কচ্ছদেশীয় পণ্ডিত রবজীভাই দেবরাজ নন্দিকল্পবৃত্তি আচারঙ্গসূত্রের বর্ণিত "উগ্র কুলানি বা ভোজ-কুলানি বা ইক্ষ্বাকু কুলানি বা হরিবংশ কুলানি বা" ইত্যাদি পাঠের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন, "উগ্রথী হরিবংশলগিনা ছকুলো রাজপুত বর্গনা আছে" অর্থাৎ উগ্রক্ষত্রিয়গণ হরিবংশ, ভোজবংশ, ইক্ষ্বাকুবংশ প্রভৃতি ছয় রাজপুতবর্গের অন্তর্গত। বল্লাল সেনের মন্ত্রী হলায়ুধকৃত অভিধানেও "উগ্রঃ যুদ্ধক্রীয়াবৃত্তঃ" অর্থাৎ উগ্র যুদ্ধকার্য্যদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহকারী অর্থাৎ ক্ষত্রিয়জাতি বলিয়া বর্ণিত আছে। রাজপুতানার প্রাদেশিক ভাষায় ঋষি জয়মল্ল কর্ত্তৃক লিখিত "পরদেশী রাজাকী চৌপাই গ্রন্থের ৬৮ শ্লোকে লিখিত আছে, ''ভোজ উগ্রক্ষেত্রিকুল উপনাজী ইক্ষ্বাকুবংশী আয়, সজি আভরণ চঢ়্যা নিজ বাহনে জি, টৌলৈ মিল

মিল জায়।" উপরে বর্ণিত-মত বহু বহু প্রমাণ দ্বারা উগ্রক্ষত্রিয়-জাতি যে ভারতের প্রাচীন ক্ষত্রিয়জাতির এক বিশিষ্ট শাখা তাহা নির্দ্ধারিত করা যায়।

বর্দ্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয়জাতীয় পালবংশীয়গণ আপনাদিগকে মহারাজ মদনপালের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই বংশে এখনও প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, "লয়ে আশী লক্ষ ঢাল ধাইল মদনপাল সঙ্গে চলে লক্ষ আসোয়ার"। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ মদনপালের যে বহুলক্ষ সৈন্যসামন্ত ছিল তাহা এখনও এইরূপ প্রবাদ-বাক্যে চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকথিত উগ্রক্ষত্রিয়জাতির প্রসিদ্ধ বাইশটী বংশই এক এক রাজার বংশধর বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, মহারাজ মদনপাল তাঁহার পিতার সেনাপতির ষড়যন্ত্রে রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইলে পর তদীয় বংশধরগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব-নিবাস বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের জ্ঞাতিকুটুম্বগণের সহিত বর্দ্ধমান অঞ্চলেই বসবাস করিতে থাকেন। সেনবংশীয়গণের অধীনে তাঁহারা সামন্তরাজরূপে আপনাদের অধিকারস্থ ভূভাগে রাজত্ব করিতে থাকেন।

যে সময়ে আকবর বাদশাহের সেনাপতি পাঠানগণের বিরুদ্ধে রাঢ় প্রদেশে অভিযান প্রেরণ করেন তখন পালবংশীয় রাজা হরিপাল মানসিংহের সহিত যোগদান করেন এবং মোগলমারীর দ্বিতীয় যুদ্ধে পাঠানগণকে পরাভূত করিয়া বহুতর মহল-মজকুরাদি জায়গীরস্বরূপ লাভ করেন। পাঠানগণের পুনরাক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য উগ্রক্ষত্রিয়-জাতির কয়েকটী বংশকে দামোদরের দক্ষিণস্থ প্রদেশে সেই সময় বসবাস করান হয়। রাজা হরিপালও আপন ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীনাথ পালের নামে মোগলমারীর অনতিদূরে গোপীনাথপুর নামক গ্রাম পত্তন করাইয়া তাহাতে কয়েক ঘর স্বজাতীয়সহ উক্ত গোপীনাথ পালকে তথায় বসবাস

করান। ঐ সময়েই বর্দ্ধমান অঞ্চলকে সুরক্ষিত করিবার জন্য রাজা হরিপাল তাঁহার আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরীনারায়ণকে কামারকিতা গ্রামে বসবাস করান। গৌরীনারায়ণ উক্ত কামারকিতা গ্রামের সন্নিকটস্থ ফরিদপুরে আপন নামে জগৎগৌরীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়া তাঁহার সেবাকার্য্যে বহুতর মহল-মজকুরাদি অর্পণ করেন। রাজা হরিপাল ঐ সময়ে মোগল-পাঠানের সীমান্ত-প্রদেশ রক্ষার জন্য মঙ্গলসীমা গ্রামে এবং বর্দ্ধমানের পশ্চিমে পানাগড়ে বহুতর পালবংশীয়গণকে বসবাস করান। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে যুবরাজ খুরম বিদ্রোহী হইয়া বর্দ্ধমান আক্রমণ করিলে রাজা হরিপাল তাঁহার পক্ষে যোগদান না করায় যুবরাজ খুরম কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইয়া বর্দ্ধমান হইতে চারিক্রোশ দূরবর্ত্তী হিট্টাগ্রামে নূতন বসবাস স্থাপন করেন। ঐ সময়ে তাঁহার অধীন কতকগুলি ক্ষত্রিয়ও তাঁহার সহিত হিট্টাগ্রামে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। হিট্টাগ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে যে স্থলে তিনি প্রথম বসবাস স্থাপন করেন সেই স্থানের নাম শিমূলা, সে কারণ তিনি এতদঞ্চলে শিমূলার রাজা হরিপাল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বর্দ্ধমান অঞ্চলের কবি তৎকালীন প্রবাদ অবলম্বন করিয়া শিমূলার রাজা হরিপালের পলায়ন-বৃত্তান্ত তৎপ্রণীত ধর্ম্মমঙ্গলগ্রন্থে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই শিমূলা আসিবার পথের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি ময়না হইতে আসিবার সময় দামোদর ও বর্দ্ধমান পার হইয়া এবং গৌড় হইতে আসিবার সময় মঙ্গলকোট হইতে গুস্করার রাস্তা ধরিয়া আসিয়া পুণ্যদা বিমলা স্রোতস্বতী খড়ীনদী পার হইয়া আসিবার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

রাজা হরিপালের পুত্র রাজা মাণিকপাল এবং তৎপুত্র রামচন্দ্র পাল। এই রাজা রামচন্দ্র পাল তাঁহার রাজ্যমধ্যে বহুস্থানে দেবালয় ও সুবৃহৎ পুষ্করিণীসকল খনন করাইয়া তাঁহার প্রজাদের সুখসমৃদ্ধি-বৃদ্ধির ব্যবস্থা

করিয়াছিলেন। যাহাতে হিট্টাগ্রামে কখনও জলকষ্ট না হয় সে জন্য তিনি হিট্টাগ্রামে বহু বাঁধ বা জলাশয় খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। উক্ত বাঁধসমূহের মধ্যে তদীয় পত্নীর স্মরণার্থ খনিত কমলাবাঁধ এবং রঙ্গচারিয়ার বা রাংচিরের বাঁধ, ঝাঁপড়ের বাঁধ, হোরালের বাঁধ এবং জিন্দরালের বাঁধ এই ছয়টি বাঁধই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এইগুলি ছাড়া তিনি গ্রামস্থ প্রজাবর্গের স্নানপানার্থ বড়সায়র, মাঝের সায়র এবং সুখসায়র নামক তিনটী সুবৃহৎ জলাশয় খনন করান। তিনি পালবংশের কুলদেবী অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী পাষাণপ্রতিমা শ্রীশ্রীত্রৈলোক্যতারিণী দেবীর স্থাপন জন্য বহু অর্থব্যয়ে কয়রাপুর গ্রামে এক বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। অদ্যাপি প্রতি বৎসর চৈত্র-মাসের বাসন্তী নবমীতে এবং আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীতে এবং আশ্বিন মাসের শুক্লা ষষ্ঠী হইতে দশমী পর্য্যন্ত উক্ত দেবীস্থানে মহামেলা হইয়া থাকে এবং বহু দূরদূরান্তর হইতে মায়ের বহু ভক্ত প্রতিমা দর্শন ও মেলায় যোগদান করিতে থাকেন। পূর্ব্বোক্ত তিনটী নবমী তিথিতে মায়ের সম্মুখে যে ছাগবলি হইয়া থাকে তাহাতে উগ্রক্ষত্রিয়জাতির একটি স্মরণাতীত কালের সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়। উগ্রক্ষত্রিয়জাতির মধ্যে বর্দ্ধমান অঞ্চলে একটি প্রবাদ আছে যে, "কেশে, পালে বর্দ্ধমান দেবীর স্থানে তার প্রমাণ"; তাহার অর্থ এই যে, উক্ত ত্রৈলোক্যতারিণীদেবীর সম্মুখে একই সময়ে যুগপৎ চারিটী ছাগবলি হইয়া থাকে। মায়ের প্রথম দক্ষিণে হিট্টার পালবংশ কর্ত্তৃক প্রেরিত ছাগ স্থাপন করা হয় ও প্রথম বামে হিট্টার পালবংশের অপর একটি শাখা বেলারীর পালবংশীয়গণের অন্য একটী ছাগ স্থাপনা করা হয় এবং বর্দ্ধমান পরগণার কেশবংশীয়গণ-প্রদত্ত অপর দুইটী ছাগ ঐ দুইটী ছাগের দুইটী পার্শ্ব আবরণ করিয়া থাকে। আটজন লোকে উক্ত ছাগ চারিটীকে একত্র তুলিয়া ধরে এবং চারিজন ঘাতকে ঠিক এক সময়েই উক্ত চারিটী ছাগকে হনন করে।

স্মরণাতীত কাল হইতে বর্দ্ধমান অঞ্চলের পালবংশীয় ও কেশবংশীয়গণের এইভাবে একত্র বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। বহুস্থানেই উগ্রক্ষত্রিয়-জাতির এইরূপ দুই দুইটী বংশের একত্র বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহার কারণ বর্ত্তমান কালের উগ্রক্ষত্রিয়গণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

রাজা রামচন্দ্র পালের পুত্র রাজা উদ্ধব পালও তাঁহার পিতার ন্যায় প্রজাবৎসল ছিলেন। তিনিও তাঁহার রাজ্যমধ্যে বহুবিধ সংকীর্ত্তি রাখিয়া যান। উদ্ধব পালের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পঞ্চানন পাল এই বংশে প্রথম উকিল হয়েন। রাজা উদ্ধব পালের আমলে এদেশে বর্গীর হাঙ্গামা প্রথম আরম্ভ হয় এবং বর্গীদের হস্তে তাঁহার ধনদৌলত আদির বিশেষ হানি হয়। তিনি যথাসময়ে নবাব-সরকারে তাঁহার দেয় রাজস্বাদি দিতে না পারায় তাঁহার বহু জায়গীর নবাব-সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রবাদ আছে যে, এককালে তাঁহার জমিদারী পানাগড়ের সন্নিকটস্থ দামোদর হইতে কাটোয়ার সন্নিকটস্থ ভাগীরথী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এখনও এসম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, রাজা উদ্ধব পালের পত্নী একদা তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাধাকান্ত পালের নিকট পরদিনে কাটোয়ায় গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তাহাতে রাধাকান্ত তাঁহার মাতৃদেবীকে পরদিনে না গিয়া তৃতীয় দিবসে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতে বলেন এবং কারণস্বরূপ জানান যে, তিনি খোঁজ লইয়া জানিতে চান যে, তাঁহার মাতাকে গঙ্গাস্নান করিতে হইলে অপর কাহারও অধিকারে পদার্পণ করিতে হইবে কি না। পরদিনে রাধাকান্ত প্রকৃতরূপে এসম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হইয়া তাঁহার মাতৃ-দেবীকে হিট্টা হইতে বিংশতি ক্রোশদূরবর্ত্তী কাটোয়ায় গঙ্গাস্নান করিতে পাঠাইয়া দেন। এই রাধাকান্ত পাল সম্বন্ধে এখনও এ দেশে প্রবাদ আছে,—"রাধাকান্ত, নিতান্ত, কৃতান্ত চাহিতে বাড়া, মারিতে যখন ইচ্ছা

করেন বাজায়ে নাগরা কাড়া"। রাধাকান্ত পালের নিজস্ব বহু সৈন্য-সামন্ত ও হাতী-ঘোড়া ছিল এবং বর্দ্ধমান ব্যতীত মেদিনীপুর ও উড়িষ্যায় বহু বিস্তৃত জায়গীর ইত্যাদি ছিল। তাঁহার আমলে হস্তীর পৃষ্ঠে খাজনার টাকা উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর হইতে হিট্টায় আসার কথা এখনও এদেশে প্রবাদ-বাক্যে পরিণত রহিয়াছে। তাঁহার আমলের রংখানা এবং দেওয়ানখানার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি হিট্টার পালবংশীয়গণের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। রাধাকান্ত পাল মহাশয় অতিশয় তেজস্বী ও যুদ্ধনিপুণ ছিলেন। এদেশে এখনও কিম্বদন্তী আছে যে, ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর উপদেশে বর্দ্ধমানের দেওয়ান কীর্ত্তিচাঁদ বিষ্ণুপুর রাজ্যটি গ্রাস করিবার চেষ্টা করেন, সে সময়ে মহারাষ্ট্র-সর্দ্দার রঘুজী ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত কীর্ত্তিচাঁদের বর্দ্ধমানে অনুপস্থিতির সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করেন। তখন এই রাধাকান্ত পালই ভাস্কর পণ্ডিতকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কীর্ত্তিচাঁদকে উদ্ধার করিয়া আনেন। কীর্ত্তিচাঁদ বিষ্ণুপুর হইতে বর্দ্ধমান আসিবার পথে দামোদর পার হইয়া উক্ত দামোদর নদের তীরবর্ত্তী এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ রাধাকান্ত পালকে জায়গীর দান করেন। রাধাকান্ত পাল মহাশয় ঐস্থানের জঙ্গলাদি কাটাইয়া আপন নামে লাট রাধাকান্তপুর নামক গ্রামসমূহ পত্তন করেন এবং যাহাতে দামোদরনদ উক্ত গ্রামসমূহের নদীতীরবর্ত্তী-ভূমি ধ্বংস করিতে না পারে তন্নিবারণের জন্য প্রায় ৪ মাইলব্যাপী এক ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর গাঁথিয়া দেন। অদ্যাপি উক্ত প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত জায়গীর এখন পর্য্যন্ত আয়মা রাধাকান্তপুর নামে খ্যাত এবং হিট্টার পালবংশীয়গণ এখনও উহা সম্পূর্ণরূপে ভোগদখল করিতেছেন। রাধাকান্ত পাল মহাশয় তাঁহার জমিদারীর মধ্যে বহু স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। চান্নার বিশালাক্ষীদেবীর মন্দির তাঁহারই

নির্ম্মিত। হিট্টাগ্রামে নূতনবাঁধ নামক আর একটি বাঁধ তিনি খনন করাইয়া দেন এবং তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠাপিত লাট রাধাকান্তপুর নামক গ্রামসমূহে তিনটী সুবৃহৎ বাঁধ খনন করাইয়া দেন এবং ঐ স্থানে দামোদরনদের তীরে বিশ্বনাথ নামক শিব প্রতিষ্ঠাপিত করান।

মোগল সম্রাটগণের দৌর্ব্বল্যবশতঃ বাঙ্গালার শেষ আমলের নবাবগণের যথেচ্ছাচারিতা এবং বৰ্দ্ধমান রাজবংশের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা ও ইংরাজ শাসনের প্রথম আমলের ভূমি-সম্বন্ধীয় আইন-সমুদয় উগ্রক্ষত্রিয়-জাতির অধঃপতনের মূলীভূত কারণ। কীৰ্ত্তিচাঁদের পিতা আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ প্রভৃতির চক্রান্তে নবাব সরফরাজ নিহত হইলে পর নূতন নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ প্রত্যুপকারস্বরূপ আলমচাঁদের পুত্র কীৰ্ত্তিচাঁদকে আপন দেওয়ান করিয়া লয়েন। সেই সময়ে কীৰ্ত্তিচাঁদ তাঁহার পিতার আমলের কতকগুলি কাগজপত্রের দ্বারা জগৎশেঠ ও তৎকালীন বৰ্দ্ধমানের রাজা হিট্টার পালবংশীয়গণের নিকট হইতে ও রামচাঁদ রায় প্রভৃতি বহু উগ্রক্ষত্রিয় জায়গীরদারগণের নিকট হইতে বহু টাকা বকেয়া বাকী দেখাইয়া দিয়া চাকলা, বৰ্দ্ধমান ও অন্যান্য বহু জমিদারী হস্তগত করিয়া লয়েন। রাধাকান্ত পালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পঞ্চানন পালের নামে আনীত ৫১০০০৲ হাজার টাকার দাবীতে সন ১২০৪ সালে জেলা বৰ্দ্ধমানেব দেওয়ানী আদালতের ১৭৯৭ সালের ১৪৩ নং মকৰ্দ্দমার ফয়সালা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, হিট্টার পালবংশীয়গণের বাঁকুড়া ও উড়িষ্যার জমিদারীসমূহ হস্তগত করিবার জন্য কি গভীর ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। ঐ মকদ্দমায় পঞ্চানন পাল মহাশয় জয়লাভ করেন। সন ১২০৪ সালের ৫১০০০৲ একান্ন হাজার টাকা বর্ত্তমান কালের তুলনায় কত টাকা তাহাও বিবেচ্য। অপর একটি মকৰ্দ্দমা ফয়সালা আদালতে দেওয়ানী জেলা বীরভূম বৈঠক শ্রীমৌলবী গোলাম আসগর খাঁ বাহাদুর ইং ১৮৫৪ সাল ২২শে আগষ্ট মোতাবেক

১২৬১ সাল ৭ই ভাদ্র বাদী পরগণে বর্দ্ধমান ওগরহর জমিদার মহারাজাধিরাজ মহাতাপ চন্দ্র বাহাদুর বিবাদী হিট্টানিবাসী ৺পঞ্চানন পালের পুত্র বৈদ্যনাথ পাল। এই মকর্দ্দমাতেও উগ্রক্ষত্রিয়জাতিকে গ্রাস করিবার বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায়।

রাধাকান্ত পাল মহাশয় সন ১২১১ সালে পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র নাবালক মহাভারত পালের সহিত পঞ্চানন পাল ও ভবানীচরণ পালের বহুকাল ধরিয়া নানারূপ মামলা-মকর্দ্দমা চলিতে থাকে। হিট্টার পালবংশীয়গণের যে সকল সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল তাহার অধিকাংশই এই গৃহবিচ্ছেদের সময়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট মহল-মজকুরাদি পঞ্চানন পাল মহাশয়ের হস্তে আসিয়া পড়ে। পঞ্চানন পালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বৈদ্যনাথ পাল সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। তিনি অপুত্রক থাকায় শেষ বয়সে কল্পতরু মহাদান ব্রত গ্রহণ করিয়া তাঁহার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি আপন ইষ্টদেবতা শ্রীপাট খড়দহ-নিবাসী নন্দমোহন গোস্বামীমহাশয়কে দান করেন এবং অন্যান্য অস্থাবরাদি দ্বারা জীবনের অবশিষ্টকাল কাটাইয়া দেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের ন্যায় হিট্টাগ্রামে নিজ নামে বৈদ্যনাথের বাঁধ বা বদ্যিনের বাঁধ নামক বিশাল বাঁধ খনন করাইয়া তাঁহার প্রজাবৃন্দের অশেষ উপকার সাধিত করিয়া গিয়াছেন।

মহাভারত পাল মহাশয় মহাজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও পার্শী এই চারি ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে যে, নানাস্থান হইতে মৌলবী ও পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতে আসিতেন। তিনি সর্ব্বদাই ভগবচ্চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতেন; সে কারণ সাংসারিক অশান্তি বা অনাটন তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট দিতে পারে নাই। তাঁহার শেষ বয়সে তদীয় সুযোগ্য পুত্র গোপীনাথ পাল মহাশয় কলিকাতার বড়বাজারে একটি

চাউলের কারবার স্থাপন করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সাংসারিক অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবারণ করেন।

উক্ত মহাভারত পাল মহাশয়ের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গোপীনাথ পাল মহাশয় তৎকালে যে শ্রাদ্ধ করেন সে সম্বন্ধে এখনও প্রবাদ আছে যে, "ডেলের ঝোলে নৌকা চলে, ভাত পাথর তায় যায় ভেসে, ভাল ছরাদ করেছেন গোপী পাল বসে।"

গোপীনাথ পালের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র স্বনামধন্য গঙ্গা-নারায়ণ পাল মহাশয়ও তাঁহার যে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে এখনও এদেশে প্রবাদ আছে যে, "বারসত্য আশী সাল, মারা গেলেন গোপীনাথ পাল, শ্রাদ্ধ হলো তেসরা ফাল্গুনে ; শ্রাদ্ধের হইল ধূম ভারী, কৈলাস কল্লেন লুচি চুরি, এই কথা সৰ্ব্ব লোকে জানে।" বৰ্দ্ধমান অঞ্চলে শ্রাদ্ধকার্য্যে লুচি সন্দেশ খাওয়ান সেই প্রথম ঘটনা ; এই লুচি-চুরিকারক কৈলাস যে কে তাহা এক্ষণে জানিবার কোনও উপায় নাই ; কিন্তু প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে।

গোপীনাথ পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র পরলোকগত গঙ্গানারায়ণ পাল মহাশয় প্রাতঃস্মরণীয় স্বনামধন্য লোক ছিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ-বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় কিন্তু সে সময় হইতেই তিনি বুদ্ধিবৃত্তি, তেজস্বিতা, নম্রতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা ও অন্যান্য নানাবিধ সদগুণের যেরূপ পরিচয় দেন তাহা বাস্তবিকই অনন্যসাধারণ। তাঁহার ঐশ্বর্য্যে হিংসাপরবশ হইয়া তাঁহার জনৈক জ্ঞাতি অন্যান্য জ্ঞাতি ও গ্রামবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সৰ্ব্বনাশ-সাধনের জন্য প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার অনিষ্ট-সাধনের চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহাদের অত্যাচারে তাঁহাকে হিট্টাগ্রাম হইতে অনেক সময় গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুগণকে এবং স্ত্রীপুত্র-পরিবারবর্গকে স্থানান্তরে রক্ষা করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়-গুণে

তিনি অবশেষে তাঁহার সেই জ্ঞাতিকে ও তাঁহার গ্রামবাসিগণকে দমন করিতে সমর্থ হয়েন। তিনি তাঁহার শত্রুবর্গকে যথেষ্ট-পরিমাণে দমন করিয়াও তাঁহাদিগকে আপন ঔদার্য্যগুণে বিশেষরূপে ক্ষমা করিয়াছিলেন, কখনও তাঁহাদের প্রতি প্রতিহিংসা-পরবশ হয়েন নাই। তিনি প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার সময় সহস্রাধিক টাকার বস্ত্রাদি ও বহুপরিমাণ ভোজ্যাদি তাঁহার গ্রামবাসিগণকে ও দরিদ্রনারায়ণকে দান করিতেন। গ্রামে অজন্মাদি হইলে তিনি গ্রাম-বাসীগণকে বিনা সুদে টাকা ও বিনা বারীতে ধান্যাদি দিয়া বহুপরিমাণে সাহায্য করিতেন। তিনি কখনও তাঁহার দানের কথা কাহাকেও বলিতেন না বা কখনও আত্মশ্লাঘা করিতেন না। দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি বহু অর্থব্যয়ে একটি মাইনর স্কুল স্থাপন করেন; কিন্তু উক্ত স্কুলটি কয়েক বৎসর চলার পর স্থানীয় কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া ছাত্রগণের স্কুলে যোগদান বন্ধ করিয়া দিয়া উক্ত স্কুলটির অবসান করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় তিনিও তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধে বিরাট দানসাগরকার্য্য সমাধা করেন। এই দানসাগর-শ্রাদ্ধের এই বিশেষত্ব ছিল যে, ঘৃত ময়দা তরিতরকারী ও অন্যান্য যাবতীয় ভাণ্ডার-গৃহে তিনি কোনও ভাণ্ডারী নিযুক্ত করেন নাই। তাঁহার অফুরন্ত ভাণ্ডার-গৃহসমূহ হইতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আপনাদের ইচ্ছামত প্রচুরপরিমাণে দ্রব্যাদি সিধা পাইয়াছিল। এরূপ দান বোধ হয় অশ্রুতপূর্ব্ব। তিনি তাঁহার মাতার যেরূপ বিরাট শ্রাদ্ধ করিয়া-ছিলেন তাঁহার মাতৃভক্তিও ছিল তদ্রূপ বিরাট। তাঁহার মাতার সহিত পরামর্শ ব্যতীত বা তাঁহার আদেশ না লইয়া তিনি কোনও কার্য্য করিতেন না। তিনি ধর্ম্মকে তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন জ্ঞান করিতেন। জীবনে কখনও তিনি অধর্ম্মপথে পদার্পণ করেন নাই। বহু লক্ষ টাকার অধিকারী হইয়াও তিনি জীবনে

কখনও বিলাস-ব্যসনে আসক্ত হয়েন নাই। জীবনে তিনি কখনও মদ্যস্পর্শ করেন নাই বা চরিত্রভ্রষ্ট হয়েন নাই। তিনি সর্ব্বদাই সৎসঙ্গ ও সদালোচনায় লিপ্ত থাকিতেন। জীবনে তিনি বহুতর যাগ-যজ্ঞ ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হিট্টাগ্রামে বহু অর্থব্যয়ে তিন বৎসর-ব্যাপী নবরাত্র হরিনামসংকীর্ত্তন করাইয়াছিলেন। কলিকাতার ছোট আদালতের প্রধানতম উকিল ৩৮নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ পরলোকগত বাবু গোবিন্দপ্রসাদ বসু মহাশয় তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। উভয়ে সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা ও তদভ্যাসে রত থাকিতেন। মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্বে তিনি তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা ও কর্ম্মচারিবৃন্দের সহিত শেষ সম্ভাষণ করিয়া ও সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া করজোড়ে তাঁহার উপাস্য ব্রহ্মণ্যদেবকে স্মরণ করিয়া স্পষ্টস্বরে বলিলেন, "হে ব্রহ্মণ্যদেব! আমি আজীবন আপনাকেই স্মরণ করিয়াছি এবং আপনারই আরাধনা করিয়াছি, অদ্য আমি, আমার এই দেহ এবং প্রাণ, মন সমস্তই নিঃশেষে আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আমার এই বাক্য সত্য হোক, সত্য হোক, সত্য হোক।" এই উক্তির পর তিনি মৌন অবলম্বন করেন এবং মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত অবশিষ্ট তিন দিন আর কোনও আহার্য্য গ্রহণ বা কাহারও সহিত কোনও বাক্যালাপ করেন নাই। সন ১৩২৭ সালের ১৪ই ফাল্গুন রাত্রি ১২টার সময় তাঁহার আত্মা ব্রহ্মণ্যদেবে লয়প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুকালে তিনি প্রভূত বিষয়-সম্পত্তি ও চারি পুত্র এবং বিধবা পত্নীকে রাখিয়া যান। তিনি যেরূপ বিরাটভাবে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ করেন তাঁহার পুত্রগণও সেইরূপ বিরাটভাবেই তাঁহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ঐ শ্রাদ্ধে ৮০/ আশী মণ ময়দার লুচি, ৮০/ আশী মণ মৎস্য, ১২৫/ একশত পঁচিশ মণ সন্দেশ ও তদুপযুক্ত দধি, ক্ষীর ও তরি-তরকারী ইত্যাদি তাঁহার স্বজাতিবৃন্দকে ও দরিদ্র-নারায়ণগণকে ভোজন করান হইয়াছিল।

মৃত্যুকালে তাঁহার চারি পুত্র এবং দুই কন্যা বর্ত্তমান থাকেন। জ্যেষ্ঠা কন্যাটী বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ Public Prosecutor রায় বনোয়ারী লাল হাটী বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ; তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ পাল বিহার গভর্ণমেণ্টের Executive Engineer রায় সাহেব সুরথনাথ চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। এই শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী হুগলী জেলার প্রসিদ্ধ জমিদার রায় বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু বাহাদুরের সহোদর ভ্রাতা ৺অক্ষয়নারায়ণ কুণ্ডু মহাশয়ের দৌহিত্রী। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত নৃসিংহমুরারি পাল বর্ত্তমানে খানো ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট; তাঁহার কার্য্যকারিতার ফলে উক্ত ইউনিয়নের সমস্ত গ্রাম হইতে চিরকালের জন্য জলকষ্ট নিবারিত হইয়াছে। মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ পাল তাঁহার ত্যক্ত কলিকাতা বড়বাজার লোহাপটীস্থিত "গঙ্গানারায়ণ পাল এণ্ড সন্স" নামক বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ লৌহ ও করগেট প্রভৃতির কারবার পরিচালনা করেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ পাল বর্ত্তমানে কলিকাতা ছোট আদালতে ওকালতি করেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ পাল ওকালতী পাশ করিয়া বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছেন। সন ১৩১৪ সালে শ্রদ্ধেয় ৺গঙ্গানারায়ণ পাল মহাশয় তাঁহাদের বংশের পূর্ব্ব ইতিহাস স্মরণ করিয়া বর্দ্ধমান জেলখানার পূর্ব্বদিকে কয়েকটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া সপরিবারে বর্দ্ধমানেই বসবাস স্থাপন করেন। তদবধি এই বংশ হিট্টার পালবংশস্থলে বর্দ্ধমানের পালবংশ বলিয়াই প্রাচীনকালের ন্যায় অভিহিত হইতেছেন। দীন-দরিদ্রগণকে অকাতরে দান এবং পরম শত্রুকেও সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করা এই বংশের চিরকালপ্রসিদ্ধ পুরুষ-পরম্পরাগত পরমধর্ম্ম। এই বংশে প্রাচীনকাল হইতেই ভগবান্ বুদ্ধদেবের নিত্যসেবা প্রচলিত আছে। শ্রীধর জনার্দ্দন রঘুনাথ শিব

এবং শ্রীশ্রীহরিনারায়ণ জীউ ইত্যাদি দেবতারও নিত্যসেবা হয় এবং দুর্গাপূজা, কালীপূজা, দোল, রাস, ঝুলন ইত্যাদি পার্ব্বণাদি সবিশেষ সমারোহ-সহকারে সম্পন্ন হয়। এই বংশের স্ত্রীলোকগণ কখনও হস্তে শঙ্খ বা লৌহ বলয় ধারণ করেন না। ইহা তাঁহাদের একটি বিশিষ্ট এবং পুরুষ-পরম্পরাগত কুলপ্রথা। ভীম এবং কান্ত ভাবের সংমিশ্রণ এই বংশের অস্থিমজ্জাগত। ভগবদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব ধন। ন্যায়ধর্ম্ম প্রধান লক্ষ্য। প্রেম, দয়া ও নিরহঙ্কারিতা এই বংশের বৈশিষ্ট্য। পরমেশ্বরে একান্ত নির্ভরতাই বর্দ্ধমানের পালবংশকে চিরগৌরবমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।

বিল্বগ্রামের হাজরা-বংশ

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত গলসী থানার এলাকাভুক্ত বিল্বগ্রামের হাজরা-বংশ বর্দ্ধমান অঞ্চলের প্রসিদ্ধ উগ্রক্ষত্রিয়জাতির বাইশটী সুপ্রাচীন ও সর্ব্বপ্রধান বংশের অন্যতম। এই বংশ যদিও প্রকাশ্যে হাজরা-বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহা মূলতঃ মজঃফর-সাহি পরগণার এড়ুয়ারের প্রসিদ্ধ উপনিষদ-গোত্রীয় সেন-বংশের অন্তর্ভুক্ত; বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি দেব ও পৈত্র কর্ম্মে এই বংশীয়গণ আপনাদের পদবীস্থলে সেনবর্ম্মা বলিয়া পরিচয় দেন। ইঁহাদের আদিনিবাস এড়ুয়ায় এবং ইঁহারা রাজা লক্ষ্মীকান্ত সেনরায়ের সন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই রাজা লক্ষ্মীকান্ত রায় অজয়নদের তীরবর্ত্তী ত্রিষষ্ঠীর গড় বা ঢেক্করী গড়ের অধিপতি রাজা কর্ণসেনের পৌত্র এবং রাজা লাউসেনের পুত্র এবং মঙ্গলকোটের অধিপতি রাজা গজপতি কোঙারের দৌহিত্র। বঙ্গদেশীয় প্রাচীন কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী-কৃত "ধর্ম্মমঙ্গল" গ্রন্থে এই লাউসেন সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা দেওয়া আছে। কুলাচার্য্য ষষ্ঠীদাস-কৃত উগ্রক্ষত্রিয়-জাতির কুলপ্রশস্তিতেও বর্ণিত আছে যে, "বর্দ্ধমানে রত্নাকর দক্ষিণে রাজন, এড়ুয়ারে অঙ্গীকারে সেনের নন্দন"। বর্দ্ধমান অঞ্চলে গৌড়ের দক্ষিণ হইতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী ভূভাগে বহু প্রাচীনকালে রত্নাকর বা সমুদ্রবংশীয় পাল-সম্রাটগণের অধীনে মহারাজ ধর্ম্মপালের পুত্র মহারাজ দেবপালের শ্যালিকা রঞ্জাবতী দেবীর গর্ভোৎপন্ন ধর্ম্মসেবক রাজা লাউ সেনের এক সামন্তরাজ্য স্থাপন করার কথা উক্ত ধর্ম্মপুরাণে পাওয়া যায়। এড়ুয়ারের সেই সেনবংশ এড়ুয়ার, সারুল, সাটীনন্দী প্রভৃতি গ্রামে রায়বংশরূপে; কালীপাহাড়ী, মুঞ্জলা, খাঁড়গ্রাম প্রভৃতি গ্রামে সেনবংশরূপে এবং কুলনগর, বিল্বগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে হাজরাবংশরূপে

বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধ আছেন। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত উপনিষদ্-গোত্রীয় রায়, সেন, হাজরা প্রভৃতি উগ্রক্ষত্রিয়জাতির বিভিন্ন বংশসমূহের সকলেই মূলতঃ এড়ুয়ারের সেন-বংশীয় রাজা লক্ষ্মীকান্ত সেনরায়ের সন্তান। পাঠান বা মোগল সম্রাটগণের অধীনে উক্ত সেন-বংশের যে যে শাখা-প্রশাখা যেরূপ সনন্দ বা খেতাব প্রাপ্ত হন তদবধি সেইরূপই অভিহিত হইয়া আসিতেছেন এবং ইহাই উগ্রক্ষত্রিয়জাতির এক একটি মূল বংশের অন্তর্গত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা-সমূহের মধ্যে বিভিন্ন পদবী সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ।

এদেশে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি মহারাজা মানসিংহ এদেশে পাঠানদিগের বিদ্রোহ দমন করিতে আসিয়া মোগলমারীর যুদ্ধে বিশেষভাবে পরাজিত হওয়ার পর তাঁহার ক্ষয়প্রাপ্ত সৈন্য-সংখ্যা পূরণের জন্য বর্দ্ধমান অঞ্চলের তেজস্বী উগ্রক্ষত্রিয়-জাতির সাহায্য প্রার্থনা করায় উগ্রক্ষত্রিয়-জাতির বাইশটি প্রসিদ্ধ বংশই তাঁহার সৈন্যদলে যোগদান করেন। রাজা মানসিংহের সহিত ভারতের তৎকালীন রাজধানী আগরা হইতে সমাগত সৈন্যদল এদেশে আগরী ফৌজ নামে অভিহিত হইত। উগ্রক্ষত্রিয়গণ উক্ত আগরী ফৌজের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে তৎকাল হইতে এদেশীয় মুসলমান পাঠানগণ ও তাঁহাদের দলভুক্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আগরী আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। উগ্রক্ষত্রিয়গণ পাঠানদিগকে উড়িষ্যার সুবর্ণরেখার পারে বিতাড়িত করিয়া দিয়া অধিকৃত ভূভাগে বহু জায়গীর লাভ করিয়া বসবাস স্থাপনা করেন। সে সময় কাটোয়া হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত যে বাদসাহি রাস্তা বিদ্যমান ছিল উগ্রক্ষত্রিয়গণ পাঠান-দিগের পুনরাক্রমণ রোধ করিবার জন্য উক্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে শত শত গ্রাম পত্তন করিয়া তাহাতে আপন আপন দলবলসহ ঘাঁটী স্থাপনা করেন। তৎকালে দামোদরনদের উত্তরতীরবর্ত্তী মোঙ্গল সীমা অঞ্চল

রক্ষা করিবার জন্য অন্যান্য উগ্রক্ষত্রিয় সৈন্যের সহিত উপনিষদ্-গোত্রীয় রাজা লক্ষ্মীকান্ত সেনের বংশধরগণকেও সাকুল, মোহনপুর, সাঁকো, বিল্বগ্রাম, সাটীনন্দী, মঙ্গলসীমা প্রভৃতি দামোদরনদের সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের জায়গীর আদি দান করিয়া বসবাস করান হয়। এই বংশের সামন্ত সেন এবং হেমন্ত সেন নামক দুই সহোদর ভ্রাতাকে সাটীনন্দী ও বিল্বগ্রাম নামক দুইটী পাশাপাশি গ্রাম দান করা হয় এবং মধ্যসীমানাস্বরূপ ঐ দুইটী গ্রামের এলাকার মধ্যস্থলে এক বিস্তৃত গড় খনন করান হয়। সাটীনন্দী ও বিল্বগ্রামের মধ্যস্থলের উক্ত গড়ের বহু অংশ মজিয়া ভরাট হইয়া যাইলেও এখনও তাহার চিহ্ন স্পষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। উক্ত গড়খাই হইতেই গৌড়নদী বহির্গত হইয়া নাদনঘাটের সন্নিকটে খড়ি নদীর সহিত মিশিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। উক্ত গড় এবং গড়ের পশ্চিমে উত্তর বাঁধ নামক বিশাল বাঁধ যাহা পরে খনন করান হয় তাহা এবং তাহার সন্নিকটস্থ বানসমুদ্র নামক প্রকাণ্ড জলাশয় তদবধি এখন পর্য্যন্ত বিল্বগ্রামের হাজরা নামে প্রসিদ্ধ সেনবংশীয়গণের অধিকারেই আছে।

রাজা সামন্ত সেন জ্যেষ্ঠতা প্রযুক্ত রায় রাঞা উপাধি প্রাপ্ত হন এবং কনিষ্ঠ হেমন্ত সেন দশ হাজারী মনসবদার থাকায় হাজরা উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং তৎকালাবধি হেমন্ত সেনের বংশধরগণ প্রকাশ্যে হাজরা উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং সাটীনন্দীর সেনবংশ প্রকাশ্যে রায়বংশ বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। রাজা লাউসেন ধর্ম্মরাজের পূজা প্রচার করেন এবং তিনি ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনী মহালক্ষ্মী দেবীর কৃপায় এই ধর্ম্মপূজা-প্রচারে কৃতকার্য্য হয়েন বলিয়া তদবধি তাঁহার বংশধরগণ সর্ব্বত্রই ধর্ম্মরাজ ও মহালক্ষ্মী দেবীর পূজা প্রচার করেন। রাজা সামন্ত সেন সাটীনন্দী গ্রামে মহালক্ষ্মী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজা হেমন্ত সেন বিল্বগ্রামে ধর্ম্মরাজের স্থাপনা করেন। উভয় ভ্রাতায়

এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হয় যে, সাটীনন্দীতে মহালক্ষ্মী দেবীর পূজার দীপ হইতে একটী আলো জ্বালিয়া তাহা বিল্বগ্রামে আনয়ন করা হইলে সেই আলো হইতে বিল্বগ্রামবাসী সকলেই আপন আপন আলো জ্বালিয়া লইয়া নিজ নিজ গৃহে মহালক্ষ্মীপূজা সমাপন করিবেন এবং বিল্বগ্রামের ধর্ম্মরাজের গাজন হইলে বিল্বগ্রামবাসিগণ সাটীনন্দীতে গিয়া গামার কাটিয়া আসিবেন এবং সাটীনন্দীগ্রামে গাজন হইলে সাটিনন্দী-বাসীগণ বিল্বগ্রামে গিয়া গামার কাটিয়া আসিবেন। রাজা সামন্ত সেন ও হেমন্ত সেনের সংস্থাপিত এই নিয়ম তদবধি এখনও পর্য্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। সাটীনন্দীগ্রামে রাজা সামন্তসেনের প্রতিষ্ঠিত মহালক্ষ্মী দেবী অদ্যাপি মহাসমারোহে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন এবং বিল্বগ্রামেও শীতল রায় নামক ধর্ম্মরাজ অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন। রাজা হেমন্ত সেনের পুত্র রাজা জগৎসেন পরম শৈব ছিলেন। তিনি তাঁহার ধর্ম্মমতানুসারে এক শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার জনৈক স্বজাতীয় সেনাধ্যক্ষকে উক্ত বিগ্রহের পরিচারক বা বক্সি নিযুক্ত করেন। তদবধি উক্ত সেনাধ্যক্ষের বংশধরগণ বক্সি উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার বংশ গ্রামে বক্সিবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। রাজা জগৎসেনই বিল্বগ্রামের বস্তিস্থাপনা করেন। রাজা জগৎসেন মোগল-সৈন্যদলভুক্ত বহুসংখ্যক উগ্রক্ষত্রিয় এবং মোগল পাঠান সৈন্যগণকে সপরিবারে বিল্বগ্রামে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী খান, মুড়ে, বড়দীঘি, সসঙ্গা প্রভৃতি গ্রামসমূহে বসবাস করান। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নিবাস এড়ুয়ার হইতে উপনিষদ-গোত্রীয় সেনবংশীয়-গণের জন্য সারুল, মোহনপুর, সাঁকো, বিল্বগ্রাম, সাটীনন্দী, মোগল-সীমা প্রভৃতি গ্রামসমূহে যাতায়াতের সুবিধার জন্য এক প্রশস্ত রাজপথ-নির্ম্মাণ করান। উক্ত রাজপথ এড়ুয়ার হইতে দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া বর্ত্তমানে খানাজংসন রেলষ্টেশনের পার্শ্ব দিয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড

নামক বাদসাহি রাস্তা অতিক্রম করিয়া মোগলসীমা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। এড়ুয়ারের সেনবংশীয়গণের জন্য প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত ঐ পথ অদ্যাপি এতদঞ্চলে এড়ুয়ার রাস্তা নামে প্রসিদ্ধ আছে। ঐ এড়ুয়ার রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বে রাজা জগৎসেনের গোচারণের যে বিস্তীর্ণ মাঠ ছিল তাহা অদ্যাপি এড়ুয়ার মাঠ নাম খ্যাত। জগৎসেনের বহুশত গো অশ্ব মেষাদি গৃহপালিত জীবজন্তু ছিল; উক্ত পশুসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য তিনি দামোদরের দক্ষিণস্থ চাগ্রাম অঞ্চল হইতে রায়বংশীয়গণকে আনয়ন করাইয়া বিল্বগ্রামে বসবাস স্থাপনা করান। রাজবংশীয়গণ উক্ত এড়ুয়ার মাঠে রাজা জগৎসেন ও তাঁহার বংশধরগণের গোচারণাদি করিত এবং উক্ত পশুসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য তথায় বাস করিত। রাজা জগৎসেন তাঁহার পশুগণের জলপানজন্য এক বিস্তীর্ণ জলাশয় খনন করাইয়া দেন, উক্ত জলাশয় এবং জলাশয়ের তীরবর্ত্তী সুবৃহৎ পশুশালার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। রায়বংশীয়গণ উক্ত পশুশালার ও তৎসংলগ্ন পুষ্করিণীর ভারপ্রাপ্ত থাকায় উক্ত পুষ্করিণী কালক্রমে রায়দীঘি নামে খ্যাত হয়। বাস্তবপক্ষে রায়বংশীয়গণ কখনই উক্ত পুষ্করিণীর মালিক ছিলেন না; উক্ত পুষ্করিণী এবং এড়ুয়ার মাঠ চিরকালই বিল্বগ্রামের রাজা জগৎসেনের বংশধরগণের অধিকারেই আছে।

রাজা জগৎসেনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজা ধর্ম্মসেন তাঁহার পিতৃত্যক্ত সম্পত্তিতে অধিকারী হয়েন। কেবলমাত্র রাজা জগৎসেন ব্যতীত রাজা লাউসেন বা তাঁহার বংশধরগণ সকলেই ধর্ম্মরাজের উপাসক ছিলেন। তাঁহারা নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ শান্ত সনাতন চৈতন্যস্বরূপ নিরঞ্জনের উপাসনা করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে কালক্রমে ধর্ম্মশিলাপূজার বিধি প্রচলিত হওয়ায় রাজা হেমন্ত সেন যে শীতলরায় নামক ধর্ম্মশিলা স্থাপনা করেন রাজা ধর্ম্মসেন সেই ধর্ম্মশিলার পূজাবিধি ও গাজন-মহোৎসবাদির জন্য শীতল সায়র, ধর্ম্মসায়র ও রামসমুদ্র নামক তিনটী, প্রকাণ্ড সরোবর

খনন করান। উক্ত ধর্ম্মসায়রে অদ্যাপি শীতল রায় ধর্ম্মশিলার কামাখ্যা ও ঘটাদি উত্তোলিত হইয়া থাকে এবং শীতল সায়রে ও রামসমুদ্রে ধর্ম্ম-রাজের গাজন বসিয়া থাকে। সাটীনন্দী এবং বিল্বগ্রামের সেনবংশীয়গণ রাজা লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত কুলপ্রথামত অদ্যাপি ধর্ম্মরাজ বা মহালক্ষ্মী ব্যতীত অন্য কোনও দেবদেবীর পূজা করেন না।

রাজা ধর্ম্মসেনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শ্রীমন্ত সেন তাঁহার পৈত্রিক জায়গীর আদি লাভ করেন। তিনি তাঁহার প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ও তাহাদের চাষ-আবাদের জন্য গ্রামের চতুষ্পার্শে বহু খাল বিল দীঘি ও পুষ্করিণী আদি খনন করান; তন্মধ্যে মুক্ত সায়র, ঘড়িদীঘি, সারদীঘি, বড়পুষ্করিণী ও সানবাঁধা পুষ্করিণীই বিশেষ প্রসিদ্ধ। সায়র, দীঘি ও পুষ্করিণীসমূহের অধিকাংশই অদ্যাবধি বিল্বগ্রামের হাজরা-উপাধিধারী সেনবংশীয়দিগের অধিকারেই আছে।

শ্রীমন্ত সেন হাজরার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রামজয় হাজরা তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত জায়গীর আদি ভোগ করার পর পরলোকগমন করিলে তৎপুত্র পীরিতরাম হাজরা তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তিতে অধিকারী হয়েন। তাঁহার আমলে এদেশে বর্গীর হাঙ্গামা হইয়া বহু লোকের ধনসম্পত্তি নাশ হয়। রাজা পীরিতরাম তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া বর্গীগণের বিরুদ্ধে বহুবার যুদ্ধ করিলেও তাহাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া গৃহসংসারাদি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থ যাত্রা করেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে মহল-মজকুরাদি জায়গীরসমূহ নবাব-সরকারে রাজস্ব বাকী পড়ায় বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়; যৎসামান্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে। বিল্বগ্রাম অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে এ সম্বন্ধে এখনও কিম্বদন্তী আছে যে, "হেমন্ত-সেন গাঁ বসালে শ্রীমন্ত দিলে দীঘি, পীরিতিরাম সব খোয়ালে দেশ লুটেছে ঠগী"।

পীরিতরামের নাবালক পৌত্র জীবনরাম হাজরার পুত্র কাৰ্ত্তিকচন্দ্র তৎকালে মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হইতে থাকেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতুল-বংশের সাহায্যে বিল্বগ্রামের দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী বাদসাহি রাস্তার ধারে ধান্য ও চাউলের একটি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কালক্রমে উক্ত ব্যবসায় এক বিরাট কারবারে পরিণত হয়। তৎকালে রেলপথ না থাকায় উক্ত বাদসাহি রাস্তার সাহায্যে এবং দামোদরনদ বহিয়াই বড় বড় বাণিজ্য পরিচালিত হইত। নানাদেশ হইতে নানা-দেশীয় বড় বড় সওদাগর উক্ত কাৰ্ত্তিকচন্দ্র হাজরার আড়তে মাল সওদা করিতে আসিয়া কাৰ্ত্তিকচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের খনিত যে পুষ্করিণীর তীরে আড্ডা লইত, তাহা অদ্যাপি সওদাগর দীঘি নামে খ্যাত আছে। কাৰ্ত্তিক হাজরা মহাশয় কিন্তু অধিককাল এইসমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পান নাই। তাঁহার ব্যবসায়ের উন্নতির চরম সময়ে তিনি পরলোক-গমন করিলে তাঁহার কর্ম্মচারী ও কতকগুলি আত্মীয়-স্বজন ঈর্ষা ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করিয়া লয়।

কাৰ্ত্তিকচন্দ্র হাজরার পুত্র রামচন্দ্র হাজরা তাঁহার পিতার বিপুল কারবার রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায় উক্ত কারবার নষ্ট করিয়া ফেলেন এবং পিতৃত্যক্ত অবশিষ্ট সম্পত্তি দ্বারা যাবজ্জীবন অতি কষ্টে কালাতিপাত করেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পরলোকগত রাখালচন্দ্র হাজরা মহাশয় কলিকাতায় গিয়া লবণের দালালি-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহাতে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া হাজরা-বংশের অর্থ-কৃচ্ছ্রতা দূর করেন। বাল্যকাল হইতেই রাখালচন্দ্র হাজরা মহাশয়কে দরিদ্রতার সহিত যথেষ্ট সংগ্রাম করিতে হইলেও তিনি কখনও ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হয়েন নাই। ন্যায় ও ধর্ম্মকে জীবনের একমাত্র আদর্শ-স্বরূপ রক্ষা করিয়া তিনি উগ্রক্ষত্রিয় জাতির তেজস্বিতা, ন্যায়পরতা,

নির্ভীকতা ইত্যাদি সদ্‌গুণসমূহের অধিকারী হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই হাজরা-বংশের স্থায়ী উন্নতিসাধন করেন। তিনি ক্রমে ক্রমে পৈত্রিক সম্পত্তিসমূহের উদ্ধার-সাধনে যত্নবান হয়েন এবং যে সমস্ত বংশ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বিপুল কারবারের অর্থ আত্মসাৎ করিয়া আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল তাহাদিগকে দমন করিতে সচেষ্ট হন। তাঁহার এই অভ্যুদয়ে কতকগুলি নীচমনা লোক ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধতা করিতে ষড়যন্ত্র করে কিন্তু শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে রাখালচন্দ্র হাজরা মহাশয় তাহাদের যাবতীয় চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়া আপন সংসারে স্থায়ী উন্নতিসাধন এবং শত্রুপক্ষের দমন করিতে সমর্থ হন। তিনি তাঁহার শত্রুগণকে যথেষ্টভাবে দমন করিয়াও তাহা-দিগকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় ঔদার্য্যগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি এ সংসারে অতি বিরল। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকাসমূহের বনিয়াদের উপর কয়েকটি সুবিস্তৃত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের খনিত বহু পুষ্করিণীর সংস্কার সাধন করেন। সন ১৩৩২ সালের ৮ই কার্ত্তিক তারিখে ৭৫ বৎসর বয়সে তিনি চারিটী পুত্র, এক ভ্রাতা এবং দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্র রাখিয়া অমরধামে গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৺চারুচন্দ্র হাজরা এবং তাঁহার পত্নী ৺অক্ষয়কুমারী দেবী পরলোকগমন করেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর হইতেই তিনি সংসারের যাবতীয় কার্য্য-কর্ম্মাদির ভার তাঁহার ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র এবং পুত্রগণের হস্তে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া দিয়া সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত হয়েন এবং তীর্থ-পর্য্যটনাদি ধর্ম্মকর্ম্মে জীবনের অবশিষ্টকাল ক্ষয় করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ মহাসমারোহে তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গলকামনায় বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ ও স্বজাতি, কুটুম্ব এবং দরিদ্র-নারায়ণাদিকে ভূরি-ভোজনে পরিতৃপ্ত করেন।

রাখালদাস হাজরা মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া বিপুলভাবে সুসম্পন্ন হওয়ায় নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার পুত্রগণের বিশেষভাবে বিপক্ষতাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া দেওয়ানী ফৌজদারী বহু মকর্দ্দমার সৃষ্টি হয়। এই বিবাদের শান্তি হইলে পর হাজরাবংশীয়গণ পুনরায় আপন আপন ব্যবসায়-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া ফেলেন। রাখালচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের নির্ম্মিত অট্টালিকার পার্শ্বে তাঁহার পুত্রগণ বহু অর্থব্যয়ে অপর একটি দ্বিতল সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান এবং পল্লীস্থ প্রতিবেশীগণের পানীয় জলের সুবিধার জন্য একটি নলকূপ স্থাপনা করেন। গ্রামবাসীগণের পানীয় জল এবং চাষ-আবাদের সুবিধার জন্য তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের খনিত আরও কতকগুলি পুষ্করিণীর সংস্কার সাধন করেন। গ্রামের পথঘাটগুলি বহুকাল হইতে সংস্কার-অভাবে বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল। তাঁহার পুত্রগণ গ্রামবাসিগণের এই অভাব-দূরীকরণার্থ বহু অর্থব্যয়ে গ্রামের রাস্তাঘাট-গুলির বিশেষভাবে সংস্কার সাধন করিয়াছেন। ৺রাখালচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের পুত্রগণের মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র হাজরা প্রথমে কলিকাতার বড়বাজারে লবণ, চিনি, নারিকেল তৈল, কেরো-সিন তৈল ইত্যাদি বিবিধ প্রকার পণ্যের এক বিরাট চালানি কারবার স্থাপনা করিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ হাজরা এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ হাজরা উভয়ে ই-আই রেলওয়ের রাজ-বাঁধ ষ্টেশনের সন্নিকটে এক জামা-কাপড়ের কারবার স্থাপনা করিয়াছেন এবং তাঁহার চতুর্থ পুত্র শ্রীযুত গগনচন্দ্র হাজরা এবং তাঁহার ভ্রাতা পরলোকগত ৺মাখনচন্দ্র হাজরার পুত্র শ্রীযুত ইন্দ্রনারায়ণ উভয়ে বিল্বগ্রামে একটি বস্ত্র ও ঘৃত চিনি ময়দা ইত্যাদির এক গোলদারী এবং ধান্যের চালানী কারবার পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার সহোদর

রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

ভ্রাতা শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র হাজরা বিল্বগ্রামে থাকিয়া বিষয়-সম্পত্তি ও তেজারতি কারবার প্রভৃতি দেখাশুনা করিতেছেন। এই বংশ স্মরণাতীতকাল হইতেই দানধর্ম্ম ও পরোপকারিতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ।

রায় নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

রাণাঘাট নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ এ্যাডভোকেট্, নদীয়া জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চেয়ারম্যান্, রাণাঘাট সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভরদ্বাজ-গোত্রীয়, ফুলে মেল-সম্ভূত গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তান।

নগেন্দ্রবাবুর চারি পুত্র ও দুই কন্যা। প্রথম পুত্র শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বি এল উকিল, তিনি রাণাঘাটে ওকালতী করেন; উত্তর-পাড়ার স্বর্গীয় রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী ও উত্তরপাড়ার বাবু নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত সুকুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের অধীনে ইঞ্জিনীয়ার; নলডাঙ্গার রাজা শ্রীযুত প্রমথভূষণ দেবরায় বাহাদুরের পৌত্রী ও কুমার মৃগাঙ্কভূষণ দেবরায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ নীলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় Provincial Bankএ কর্ম্ম করেন। চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও B. A. পাস করিয়া এম্, এ, ও আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

নগেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী নলিনীবালা দেবীর সহিত নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট হেল্থ্ অফিসার ডাঃ হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় M. B. D. P. H. এর শুভ পরিণয় হইয়াছে। দ্বিতীয় কন্যা সুষমাবালা দেবীর সহিত বেলগেছিয়া Medical Collegeএর Hony. Radiologist কাপ্তেন রঘুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-বির বিবাহ হইয়াছে।

নিম্নে ইঁহাদের বংশতালিকা প্রদত্ত হইল :—

কৃপারাম মুখোপাধ্যায়
|
শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়
|
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
|
শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় — শ্রীপ্রভাতনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-বি

মণীন্দ্র, সুকুমার, নীলেন্দ্র, খগেন্দ্র, নলিনী, সুষমা

পূর্ণেন্দু, বিমলেন্দু, বিজলেন্দু, পারুল, আঙ্গুর
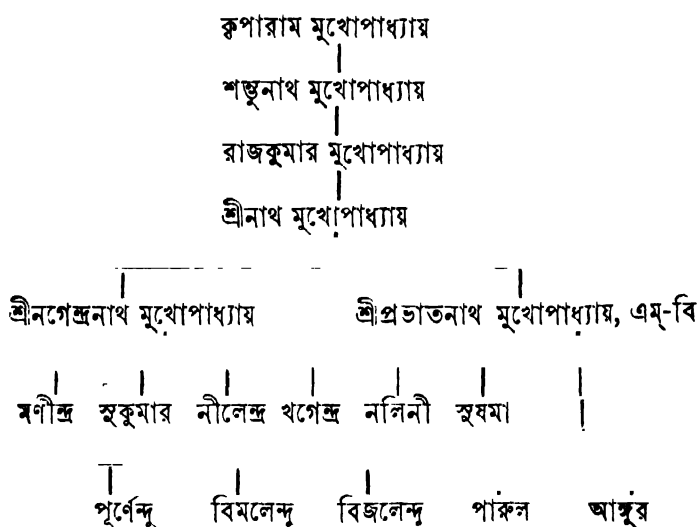
নগেন্দ্রবাবুকে "রায় বাহাদুর" উপাধির সনন্দ দিবার সময় গবর্ণর মহোদয় নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন :—

RAI NAGENDRA NATH MUKHERJEE BAHADUR

As a lawyer you have been employed by Government in important cases and in this capacity you have rendered loyal and valuable services. In 1926 you became the Chairman of the Nadia District Board and under your charge this body has become efficient and established on a sound basis. You are also a nominated Commissioner of the Ranaghat Muncipality in whose affairs you take lively interest. In appreciation of your services, the title of "Rai Bahadur" has been bestowed upon you.

ডাক্তার অহিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বর্দ্ধমান সহরে ডাক্তার অহিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম সকলেরই সুপরিচিত। ইনি যেমন বিদ্যোৎসাহী তেমনই পরোপকারী। স্কুল-কলেজের কয়েকজন দুঃস্থ ছাত্র স্থায়ীভাবে ইঁহার বাটীতে আহার করে এবং থাকে। অতিথি-সৎকারের জন্য এই পরিবার চিরদিন প্রসিদ্ধ।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী অহিভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্দ্ধমানে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের বিষয় লোক সমাজে প্রচারিত হয় এবং তাহার পশার-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহার সুযশঃ ও সুখ্যাতি বর্দ্ধমান সহরে সুপ্রতিষ্ঠিত। ডাঃ অহিভূষণ করুণহৃদয়; দরিদ্র ও বিপন্নের ব্যথায় তিনি চিরদিনই সহানুভূতিশীল। বর্দ্ধমান সহরে যতগুলি দরিদ্র-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান আছে প্রায় সকল-গুলিরই সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট।

ইঁহারা গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তান এবং উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ মুখো-পাধ্যায়-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ইঁহাদের বংশলতা নিম্নে দেওয়া হইল :—

ডাঃ অহিভূষণের জন্মভূমি—বর্দ্ধমান জেলার বড় বেলুন ডাকঘরের এলাকাভুক্ত কুবাজপুরগ্রাম। ইহা ডাঃ অহিভূষণের পিতামহ ৺শ্রীনাথের শ্বশুরবাটী। ৺শ্রীনাথ বর্দ্ধমান রাজ্যের অন্যতম সভাপণ্ডিত ছিলেন।

ডাঃ অহিভূষণের পিতা ৺কার্ত্তিকেয় মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমান-রাজের দেবোত্তর-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। ইঁহার বয়স যখন ১৪ বৎসর সেই সময়ে ইঁহার পিতৃদেব পণ্ডিত শ্রীনাথ পরলোক গমন করেন। তৎপূর্ব্বেই ইঁহার মাতা-ঠাকুরাণীরও স্বর্গলাভ হইয়াছিল। মাতৃবিয়োগের সময়

ইনি নিতান্ত বালক ছিলেন। সুতরাং পিতার মৃত্যুর পর ইহার মাথার উপর যেন পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রচুর পিতৃঋণ এবং এক নাবালিকা ভগিনীকে লইয়া তাঁহাকে একাকী সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়। তবে তিনি বৰ্দ্ধমান-রাজ-সরকারে কার্য্য পাইয়াছিলেন। বৰ্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর ৺মহাতব চন্দ ও ৺ রাজা বনবিহারী কপূর বাহাদুর তাঁহার কর্ম্মপটুতার ও নির্ভীকতা-পূর্ণ সৎসাহসের জন্য উত্তরোত্তর তাঁহার পদবৃদ্ধি করিয়া দেন। বৰ্দ্ধমান রাজ-সরকারের শুভদৃষ্টিতে পড়িয়া ৺কাৰ্ত্তিকেয় পুনরায় তাঁহার কুবাজপুরের বাটীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নানাবিধ ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে থাকেন। কুবাজপুরের বাটীর গৃহদেবতা ৺রঘুনাথ জীউ ৺কাৰ্ত্তিকেয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতেই আছেন। পেন্‌সন লইয়া ৺কাৰ্ত্তিকেয় স্বগ্রামেই ছিলেন এবং পুত্রগণ যে যাঁহার কর্ম্মস্থানেই থাকেন। ৺কাৰ্ত্তিকেয় মুখোপাধ্যায়ের ৯ পুত্রের মধ্যে ডাঃ অহিভূষণ ৫ম। ৺কাৰ্ত্তিকেয় মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র ৺মহাদেব মুখোপাধ্যায় বৰ্দ্ধমান-রাজসরকারে কার্য্য করিতেন; দ্বিতীয় পুত্র ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় বৰ্দ্ধমান-রাজের কয়লার খনিসমূহের ম্যানেজার ছিলেন; তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত গগনচন্দ্র আসানসোলে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে কর্ম্ম করেন; চতুর্থ পুত্র শ্রীযুত বিভূতিভূষণ সাব্‌-ওভারসিয়ার। পঞ্চম পুত্র অহিভূষণ বৰ্দ্ধমান সহরের ডাক্তার, এই সহরের নূতনগঞ্জে তিনি বসবাস করিতেছেন; ষষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত কানাইলাল মুখোপাধ্যায় সাব-ওভারসিয়ার; সপ্তম পুত্র শ্রীযুত দোলগোবিন্দ পুলিশের ইনস্পেক্টর; অষ্টম পুত্র শ্রীযুত দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় কলিয়ারি-সার্ভেয়ার এবং নবম পুত্র শ্রীযুত হেরম্বকুমার কণ্ট্রাক্টর।

শ্রীহট্ট—ঢাকা দক্ষিণ দত্তরালীর রায় বাহাদুর কালীকৃষ্ণ দত্তচৌধুরী

শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত ঢাকা-দক্ষিণ পরগণার দত্তরালী গ্রামে প্রথমতঃ হৃদয়ানন্দ দত্ত আসিয়া বাস করেন। দত্তদের বসতি বলিয়া এই গ্রামের নাম দত্তরালী হইয়াছে। দত্তদের কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র, তে প্রবর, যথা—অত্রি, শিখণ্ডী ও কৌৎস।

হৃদয়ানন্দের পৌত্র দৈবকীনন্দন এবং তৎপুত্র শ্রীনাথ অতি প্রতাপশালী লোক ছিলেন। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক সকল বিষয়েই তাঁহার মত প্রবল ছিল।

ঢাকা-দক্ষিণ পরগণায় প্রাচীনকাল হইতে চারি দস্তখৎ প্রচলিত আছে; যথা—শ্রীনাথ, কবি, দিলমোহাম্মদ, নবি। শ্রীনাথের বংশ বলিতেই শ্রীযুত কালীকৃষ্ণ চৌধুরীর বংশ বুঝায়। মোগল-সম্রাট হইতে এই বংশ চৌধুরী-উপাধি-প্রাপ্ত।

শ্রীনাথ চৌধুরী ৺মদনমোহন গৃহবিগ্রহ স্থাপনা করিয়া উৎকৃষ্ট সেবা-ব্যবস্থা করেন। এই বংশ অদ্যাবধি শ্রীশ্রী৺মদনমোহনের সেবা করিয়া আসিতেছেন। দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা মহাসমারোহে সম্পূর্ণ হয়। এইসকল বাবদ সম্পত্তির অনেক আয় বরাদ্দ আছে। এই পরিবার দেব-দ্বিজে অত্যন্ত ভক্তিমান।

এই বংশ শ্রীহট্ট জিলার অন্যতম বনিয়াদি জমিদার-বংশ। কালীকৃষ্ণবাবুর পূর্ব্বপুরুষ কেহ কোন সরকারী কাজ করেন নাই; নিজ নিজ প্রতিভাবলেই সম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন।

কালীকৃষ্ণ চৌধুরীর পিতা ৺কালিকাপ্রসাদ চৌধুরী অত্যন্ত প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। দেশে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেই তাঁহাকে ভক্তি এবং বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। গ্রামের দেওয়ানী-ফৌজদারী মোকদ্দমা তিনি নিজেই মীমাংসা করিয়া দিতেন।

কালিকাপ্রসাদ চৌধুরীর ৯ কন্যা এবং একমাত্র পুত্র কালীকৃষ্ণ চৌধুরী। বাঙ্গালা ১২৭৩ সনের ২৮শে কার্ত্তিক তারিখে কালীকৃষ্ণ-চৌধুরীর জন্ম হয়। কালীকৃষ্ণবাবুকে নাবালক রাখিয়া পিতা কালিকা-প্রসাদ চৌধুরী মারা যান। অভিভাবক-শূন্য অবস্থায় থাকিয়া কালীকৃষ্ণবাবু ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই।

অতিথি-সৎকার-কার্য্যাদিতে তাঁহার নিষ্ঠা ও আগ্রহ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এইসকল কার্য্য তিনি স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। কদাচ ভৃত্য বা কর্ম্মচারিগণের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না। তিনি লোককে খাওয়াইতে অত্যন্ত ভালবাসেন। নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলা-পরিপাট্যের জন্য দেশে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি। তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী এবং উপযুক্ত বক্তা। ঢাকা-দক্ষিণ পরগণায় চৌধুরীবাড়ী বলিতে কালীকৃষ্ণ চৌধুরীর বাড়ী বুঝায়।

তিনি প্রায় ২০।২৫ বৎসর লোকাল বোর্ডের মেম্বর ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় তাঁহারই গ্রামে দত্তরালী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়, নিজ পিতার নামে কালিকাপ্রসাদ দাতব্য চিকিৎসালয়, দত্তরালী চৌধুরী বাজার-পাঠশালা এবং দত্তরালী শ্রীচৈতন্য বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তিনি এই সকল কার্য্যে বহু টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তিনি বহুদিন স্কুল-কমিটির এবং ডাক্তারখানা-কমিটির সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছেন।

গত যুদ্ধে সৈনিক-সংগ্রহ-উপলক্ষে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই তারিখে কালীকৃষ্ণবাবু Recruiting Workএর জন্য Recruiting

Badge পুরস্কার পান। ইহা মাননীয় ভারত সরকারের পক্ষ হইতে Army Department এর Major-General প্রদান করেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মহামান্য সম্রাটের শুভ জন্মতিথিতে তিনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন।

কালীকৃষ্ণবাবুর দুই পুত্র এবং তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীপ্রসন্ন চৌধুরী গত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে হইতে লোকাল বোর্ডের মেম্বার আছেন। তিনি দত্তরালী মধ্য-ইংরেজী স্কুল-কমিটির এবং কালিকাপ্রসাদ দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্পাদকের কাজ অনেক দিন হইতে করিতেছেন। তিনি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে দত্তরালী মৌজার সরপঞ্চের কাজ সুনামের সহিত করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার কাজে সরকার বাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া একবার ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে স্বর্ণ অঙ্গুরীসহ প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট এবং দ্বিতীয়বার ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে ১ম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

কনিষ্ঠ পুত্র কালীসদয় চৌধুরী স্থানীয় 'ভিলেজ অথরিটী' স্থাপিত হওয়া অবধি উহার চেয়ারম্যানের কাজ যোগ্যতার সহিত করিয়া আসিতেছেন। ইনি সুদক্ষ অশ্বারোহী।

বংশ-লতা

শ্রীনাথ চৌধুরী

শ্রীচন্দ্র দুর্লভরাম

শ্রীরায়চৌধুরী কামদেব রায়চৌধুরী মাণিক রায়চৌধুরী

শ্রীমন্ত হরবল্লভ চৌধুরী শ্রীজীবন

রাজবল্লভ গৌরীবল্লভ ঘনশ্যাম চৌধুরী
(১মা স্ত্রী শিবপ্রিয়া)
(২য়া স্ত্রী তারাবতী)

দুর্গাপ্রসাদ সোনারাম কালিকাপ্রসাদ চৌধুরী
(১মা স্ত্রীরাজেশ্বরী)
(২য়া স্ত্রীহরসুন্দরী)
(৩য়া স্ত্রীশ্যামাসুন্দরী)

কালীকৃষ্ণ চৌধুরী (রায় বাহাদুর)
(স্ত্রী ৺বসন্তকুমারী)

কালীপ্রসন্ন চৌধুরী
(স্ত্রী জ্ঞানদাসুন্দরী)

কালীসদয় চৌধুরী
(স্ত্রী ক্ষেন্তকালী)

কালীপদ কালীমোহন কালিদাস কালীরঞ্জন কালীভূষণ
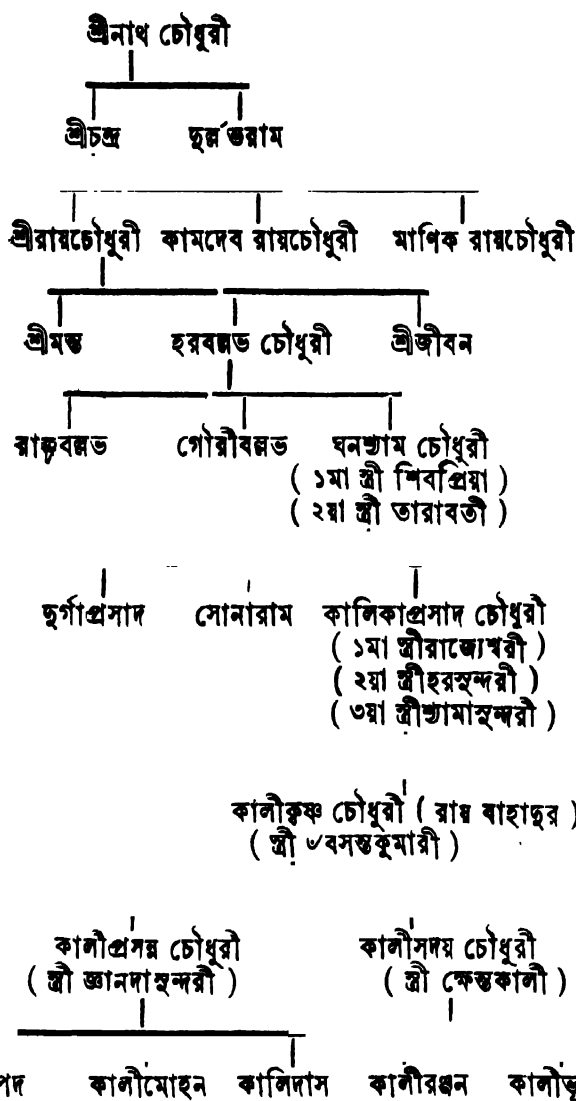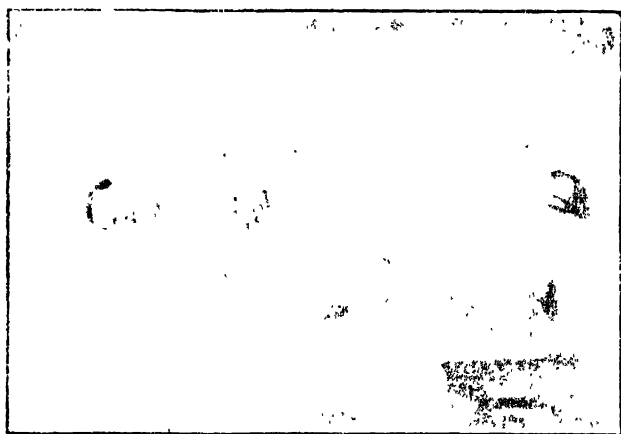
স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ
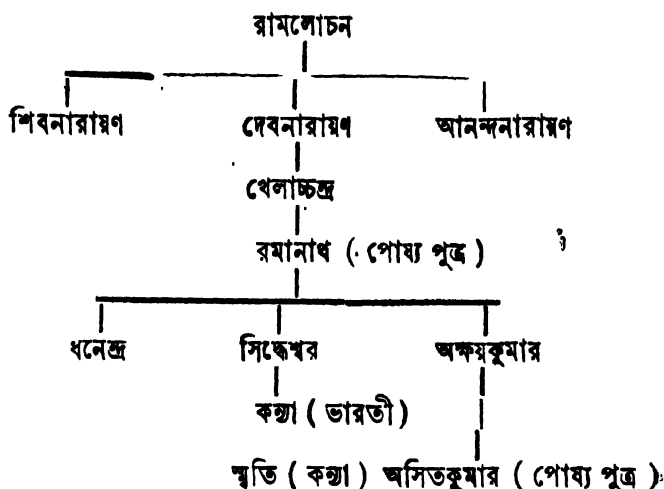
এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামলোচন ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দেওয়ান ছিলেন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শীলমোহর-রক্ষক ছিলেন। দশসনা বন্দোবস্তের সময় তিনি সরকারের বিশেষ সহায়তা করেন। তাঁহার তিন পুত্র—মধ্যম পুত্র দেবনারায়ণ দয়ালু, পরোপকারী, ধর্ম্মভীরু ছিলেন। জনসাধারণের উপকারের জন্য নদীয়া হইতে দেশে ফিরিবার কালে আমডাঙ্গা নামক এক গ্রামে জলকষ্ট দেখিয়া সেখানে দুইদিন অপেক্ষা করেন এবং একটী জমি খরিদ করিয়া সেখানে পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র খেলাচ্চন্দ্র পবিত্রচেতা, দীন-প্রতিপালক, বিদ্যোৎসাহী, সনাতন হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার নেতা, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও জষ্টিস অফ দি পিস্ ছিলেন।

রমানাথ কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠাতা; ইহাতেই তিনি সমগ্র ভারত-

বাসীর নিকট পরিচিত। কলিকাতায় শিক্ষা-বিস্তারের দিকে তিনি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। নগরীর প্রায় সমস্ত সাহিত্য-বিষয়ক সভার তিনি সভ্য ছিলেন। কলিকাতা খেলাচন্দ্র ইনষ্টিটিউসন নামক স্কুল তাঁহারই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের তিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন। রাষ্ট্রীয় বিষয় চর্চ্চা করিতেন। তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন। তিন দয়ালু ও সদাশয় ব্যক্তি। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে যখন কলিকাতায় প্লেগ মহামারীর আবির্ভাব হয় তখন তিনি নগরবাসীদের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি সরকার পক্ষ-হইতে 'কাইসার-ই-হিন্দ' পদক প্রাপ্ত হন। ধনেন্দ্রের অল্প বয়সেই ঘোড়া হইতে পড়িয়া মৃত্যু হয়।

সিদ্ধেশ্বর পিতার সুযোগ্য পুত্র; দয়ালু ও বিদ্যোৎসাহী; গুপ্তভ বে বহু ছাত্রকে সাহায্য করিতেন; বহুলোককে অন্নদান করিতেন। উচ্চবংশীয়দের যে সমুদায় গুণ থাকা আবশ্যক সে সমস্তই তাঁহার ছিল। চিত্তরঞ্জন-স্মৃতিভাণ্ডারে তিনি বহু অর্থ দান করেন। তাঁহার পিতৃ-সংস্থাপিত বিদ্যালয়কে তিনি ধ্বংসের পথ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যলিপ্সা ছিল—স্বয়ং কবিতা রচনা করিতেন—চিত্রাঙ্কন করিতেন। উচ্চদরের নাট্যশিল্পী ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্য ছিলেন। দেশের ও সমাজের কাজে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতে বিমুখ হইতেন না।

অক্ষয়কুমার—তাঁহার কার্য্যকলাপ লোকচক্ষুর সম্মুখীন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তবে তিনি যে দয়ালু এবং নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাঁহার আদেশ-মত তাঁহার বিধবা পত্নী অসিতকুমারকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া বংশ রক্ষা করিয়াছেন।